[illegible]

গোবিন্দ নন্দন চক্রবর্তী

401266

এম. ফিল ডিগ্রীর জন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

দাখিলকৃত গবেষণা-পত্র ।

১৯৮৯ ।

Dhaka University Library

401266

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

"ভবাপাগলার জীবন ও গান" — অভিসন্দর্ভটি রচনার জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ কর্তৃক ১৯৮৬-৮৭ শিক্ষাবর্ষে রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত হই। আমি যথাসময়ে এম,ফিল প্রথম পর্ব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই।

এই গবেষণাসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ, প্রো-উপাচার্য পদে প্রশাসনিক কর্মব্যস্ত থাকার পরও যে পর্যাপ্ত সময় আমার গবেষণা-পত্র তৈরীর কাজ দেখা ও সময়োচিত উপদেশ প্রদানের জন্য ব্যয় করেছেন - সেজন্য তাঁর কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাই।

এবং গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি বিভাগীয় শিক্ষক আবুল কাশেম ফজলুল হক, আহমদ কবির, ডঃ আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, ডঃ রাজীব হুমায়ুন, ও ডঃ সৈয়দ আকরাম হোসেনের প্রতি। তাঁরা আমাকে গবেষণার কাজে পরামর্শ ও উৎসাহ প্রদান করেন।

401269

এছাড়া অভিসন্দর্ভ পরিকল্পনা ও রচনার শুরু থেকে শেষ অবধি যাঁর অবদান কোন ভাবেই অস্বীকার করার উপায় নেই — তিনি বর্তমান ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 'পালি ও সংস্কৃত' বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শ্রীনিরঞ্জন অধিকারী। তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই স্নেহভাজন শ্রীভুবনারায়ণ মোদক (এম,এ, দর্শন)-এর কাছেও।

Dhaka University Institutional Repository

তবু আরও অনেকের কাছে ঋণ রয়ে গেল । ঋণ রয়ে গেল শ্রীগোপাল মৈত্রী এবং স্বর্গীয় শ্রীভবতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে । কারণ শ্রীভবতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম আমাকে কলকাতা থেকে পত্র মাধ্যম ভবার মহাপ্রয়াণ সম্বন্ধে জানান । শ্রীগোপাল মৈত্রী আমাকে বিভিন্ন সময়ে তথ্য পাঠান ।

অভিসন্দর্ভটি অত্যন্ত যত্ন এবং ধৈর্য-সহকারে টাইপ করেছেন মোঃ মনসুর রহমান । তাঁকেও ধন্যবাদ ।

গোপিকা রঞ্জন চক্রবর্তী
বাঙলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।
বাংলাদেশ ।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

	বিষয়		পৃষ্ঠা
	প্রথম অধ্যায়ঃ		
১।	জন্ম ও জন্মকাল	...	১-৯
২।	পরিচিতি	...	১০-১৩
৩।	ভবাপাগলার বংশলতিকা	...	১৪-১৫
৪।	বাল্যজীবন ও শিক্ষা	...	১৬-২১
৫।	ভবাপাগলার লাঠি	...	২২-২৮
৬।	বাংলাদেশ ত্যাগ ও ভারতে গমন	...	২৯-৩৩
৭।	ভবাপাগলার মহাপ্রয়াণ	...	৩৪-৪২
৮।	ভবাপাগলা কর্তৃক মন্দির প্রতিষ্ঠা	...	৪৩-৫৫
৯।	শিষ্যের দৃষ্টিতে ভবাপাগলা	...	৫৬-৫৯
	দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ		
১।	ভবাপাগলার গানের সাধারণ পরিচিতি	...	৬০-৭৯
২।	চিন্তাধারা	...	৮০-৯৮
৩।	শক্তিসাধনা ও মাতৃসঙ্গীত	...	৯৯-১২১
৪।	বাউল সঙ্গীত ও ভবাপাগলা	...	১২২-১৪৪
৫।	সাহিত্যমূল্য	...	১৪৫-১৫১
	তৃতীয় অধ্যায়ঃ		
	সঙ্গীত সংকলন	...	১৫২-৩৩৫

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রসূচী

চিত্রসূচী-ক

১। জন্মস্থান সংলগ্ন 'মা আনন্দময়ীর মন্দির'।
আমতা-কালীবাড়ী, ঢাকা।

২। কিশোর রূপে ভবাপাগলা।

৩। মৌলভীর বেশে ভবাপাগলা,
(কোলের উপর সোনার লাঠিটি)
বয়স: আনু: ৪৫/৫০।

৪। হারমোনিয়াম বাদনরত ভবাপাগলা।

৫। চিন্ময়ী দে'র কন্যার সঙ্গে অভিনয়রত ভবাপাগলা।

৬। জনৈক এক ভক্তের কন্যাকে গান শেখাচ্ছেন ভবাপাগলা।

৭। কালনা - মা ভবানীর মন্দিরে, স্ত্রী-শৈবলিনীর পাশে ভবাপাগলা।

৮। গান-রচনায় মগ্ন ভবাপাগলা।

চিত্রসূচী-খ চিঠি।

চিত্রসূচী-গ পান্ডুলিপি।

Dhaka University Institutional Repository

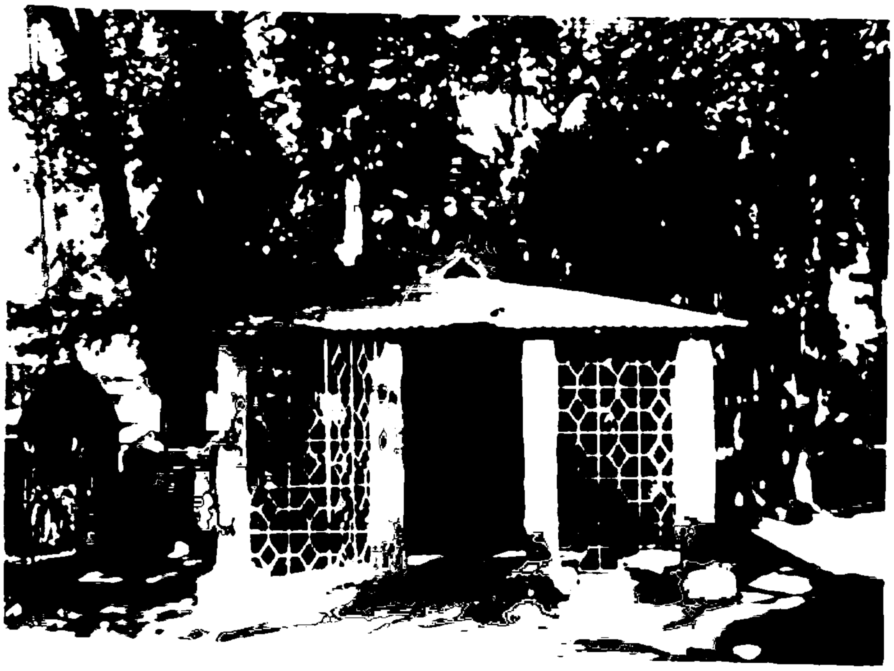

১। জন্মস্থান সংলগ্ন 'মা আনন্দময়ীর মন্দির'।
আমতা - কালীবাড়ী, ঢাকা ।

২। কিশোর বয়সে ভবাপাগলা ।

Dhaka University Institutional Repository

৩। মৌলভীর বেশে ভবাপাগলা,
(কোলের উপর সোনার নাটিটি)
বয়স: আনুমানিক ৪৫/৫০

৪। হারমোনিয়াম বাদনরত
ভবাপাগলা ।

Dhaka University Institutional Repository

। চিত্রর্ণী দে'র কন্যার সঙ্গে অতিবয়স্ক ভবাপাগলা ।

৬। জনৈক এক ভক্তের কন্যাকে গান শেখাচ্ছেন ভবাপাগলা ।

Dhaka University Institutional Repository

৭। কালনা-'মা ভবানীর মন্দিরে
স্ত্রী শৈবলিনীর পাশে ভবাপাগলা

৮। গান রচনায় মগ্ন ভবাপাগলা ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

জন্ম ও জন্মকাল

সাধক ভবাপাগলার জন্ম ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলাধীন আমতা গ্রামে।[১] সাহা সম্প্রদায়ে তাঁর জন্ম ১৩০৭ সনের আশ্বিন মাসে পূর্ণিমা তিথিতে (ইংরেজী ১৯০০ সনের অক্টোবর মাসে)।[২] পাগল পুত্র শ্রীসনৎকুমার চৌধুরী অনুরূপ মত প্রকাশ করেন। প্রীতিমোনাশ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "পরম গুরু ভবাপাগলাঃ ১ম খন্ডে", "পাগলের জন্ম ৩১শে আশ্বিন ১৩০১ সন শুক্রবার কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমায়"[৩] বলে উল্লেখ করেন। প্রীতিমোনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুসরণ করে শ্রীসত্যগিরি মহারাজ লেখেন, "অবিভক্ত ভারত বর্ষের বাংলাদেশের ঢাকা জেলার আমতা গামে ভবাপাগলা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৩০১ সনের ৩১শে আশ্বিন কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমার পুণ্য শুভ লগনে ; ঐ দিন ছিল চন্দ্রের পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ ।"[৪] অধ্যাপক সৈকত আসগরের ধারণা, ভবাপাগলার জন্ম "আনুমানিক ১৮৯৭ ইংরেজী সাল।"[৫]

পাগলের পিতার নাম গজেন্দ্র মোহন রায় চৌধুরী এবং মাতার নাম গয়াসুন্দরী দেবী । পিতার এই "রায় চৌধুরী" উপাধি থেকে আমরা ধারণা করতে পারি যে, ভবার জমিদার বংশেই জন্ম । তিনি যে বালিয়াটীর জমিদার মণি চৌধুরীদের বংশধর ছিলেন, সে সম্পর্কে প্রীতিমোনাশ বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, "বাথের বাগান থেকে শোভাবাজার স্ট্রীট । দূরত্ব বেশী নয় । শোভাবাজার স্ট্রীটের চার নম্বর বাড়িটি একটি প্রকান্ড অট্টালিকা । ঐ অট্টালিকার মালিক বালিয়াটীর সুবিখ্যাত জমিদার রায় চৌধুরীরা। এই রায় চৌধুরীরা ভবাপাগলার পিতৃবংশের সঙ্গে আত্মীয়তা সূত্রে যুক্ত । দেশে (বর্তমান বাংলাদেশে) এই উভয় পরিবারের পৈত্রিক গ্রাম আমতা ও বালিয়াটীর দূরত্বও মাইল নয়-ক্রোশখানেক ব্যবধান মাত্র । বালিয়াটীর ঐ জমিদারগণ দুই বাড়িতে বিভক্ত । 'পূববাড়ি' ও 'পশ্চিম বাড়ি' নামে ঐ দুই বাড়ি পরিচিত । এই পশ্চিম বাড়ির কর্তাদের দানেই ঢাকা শহরের বিখ্যাত মহাবিদ্যালয় 'জগন্নাথ কলেজ' স্থাপিত হয় । শোভাবাজারের পূর্বোক্ত ৪নং বাড়িটিও এই পশ্চিম বাড়ির জমিদারগণের সম্পত্তি।"[৬] বর্তমানে আমতা গ্রামে

Dhaka University Institutional Repository

ভবাপাগলার বাড়ীর যে, ধ্বংসাবশেষ রয়েছে তা থেকে সাধারণের অনুমান, গজেন্দ্র মোহন জমিদার প্রধান না হলেও, অন্তুতঃ প্রচুর অর্থসম্পদের মালিক ছিলেন - সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তথ্য অনুসন্ধান করে জানা যায়, "গজেন্দ্রমোহনের কর্মভূমি ছিল কোলকাতার পোস্তাবাজার অঞ্চলে। সুরজমল নাগরমল কোম্পানীর পাটের দালালিতে যথেষ্ট সুনাম ছিল গজেন্দ্রমোহনের। গজেন্দ্রমোহনের পিতা ঐ দালালি কাজে নিযুক্ত থেকে বিত্তশালী হয়েছিলেন। গজেন্দ্রমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র গিরীন্দ্রমোহনকেও ঐ কাজে নিযুক্ত করেছিলেন তিনি।"[৭]

গয়াসুন্দরী দেবীর ছিল তিন ছেলে, একমেয়ে। গিরীন্দ্র সবার বড়, দেবেন্দ্র ও ভবেন্দ্র (ভবা) যমজ; সতী আগমনী সবার ছোট। এ ছাড়া কিরণশশী, ননীবালা ও টেপু নামে তিন কন্যার কথা ভবাপাগলার বংশ তালিকায় উল্লেখ রয়েছে। সতী আগমনীর "জন্মের কয়েক বৎসর পর গজেন্দ্রমোহন শ্রীধাম পুরীধামে বেড়াতে যান। সেই শ্রীক্ষেত্রেই তিনি মর্ত্যলীলা সম্বরণ করেন।"[৮] আমতা গ্রামের বয়োবৃদ্ধদের সাথে আলাপ করে যা জানতে পারি তা থেকে সিদ্ধান্ত এই, ভবাপাগলা পরিণত বয়সেই বিবাহ করেন। তখন তাঁর বয়স পঁচিশ কী ত্রিশ। শ্বশুর বাড়ী ছিল চৌধুরী বাড়ী থেকে কয়েক মাইল উত্তরে - জামুর্কি পাকুল্ল্যা। বিয়ের দিন 'ভবা'কে বাড়ীতে তুলে আনা হয়। কারণ বর সেজে বিয়ে করতে যাওয়ার ব্যাপারে কেউ তাঁকে রাজি করাতে সক্ষম হননি। ভবাপাগলা ছিলেন এমনই একগুঁয়ে। পিতার কাছ থেকে শ্রুত ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রীসনৎকুমার চৌধুরী বলেন, "৩০বৎসর বয়সে তিনি বিবাহ করেন, তখন শৈবলিনীর বয়স দশ বছর। দুই বউ দুই দরজা দিয়ে শ্বশুর বাড়ী প্রবেশ করেন।" অর্থাৎ গয়াসুন্দরী দেবী ভবার জন্য জামুর্কি পাকুল্ল্যা গ্রামের বসন্ত সাহার মেয়ে শৈবলিনীকে কথা দেয়ার আগেই যমজ অগ্রজ দেবেনের জন্য আমতা গ্রামের যতীন্দ্রনাথ বাবু মেয়ে রেনুবালার বিয়ের কথা প্রায় পাকা করে রেখেছিলেন। ভবেন মায়ের কথায় রাজী হওয়ায় উভয় বিয়ে একই দিনে সম্পন্ন হয়। প্রত্যক্ষদর্শী স্বর্গীয় শ্রীহরিচরণ কর্মকার আমাকে জানিয়েছিলেন যে, এ বিয়েতে

Dhaka University Institutional Repository

পাগল, দেশাচার ও লোকাচার প্রায় সব অনুষ্ঠান সমূহই পালন করেছিলেন। তবুও কনের বয়স এবং ভবার মতিগতি দেখে অনেকেই ধারণা করেছিলেন - হয়তো এ বিয়ে বেশীদিন স্হায়ী হবে না। কারণ -"বিবাহের পরও ভবেনের দিনরাত কিন্তু কাটে তাঁর পূর্ব্বেরই মত মন্দিরে আর মন্দিরের পাশে সেই ছোট বিশ্রাম কুঠুরিতে। পূর্বের মতই পরোপকার, ভক্তগণের গতায়াত, গান লেখা, গান গাওয়া, গ্রাম গ্রামান্তরে অনুরাগীবৃন্দের মন রাখার জন্য ছুটোছুটি আর মাঝে মাঝেই অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে মহামায়ার কৃপাবর্ষণের নিদর্শন সবই অব্যাহত রইলো আগেকার মতন। সংসার সম্পর্কে একেবারে উদাসীন।"[৯] কিন্তু সাধক ভবাপাগলার সমস্ত জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, তিনি কখনোই সংসার বিমুখী ছিলেন না বা স্ত্রী বিমুখী-ছিলেন না। দাম্পত্য জীবনে স্ত্রী শৈবলিনী দেবীকে তিনি যথেষ্ট ভাল-বাসতেন, তার প্রমাণ পাই, তাঁর লেখা গানে।

ভবার বৌ, মরে গেলো, নামছিল তার শৈবলিনী।
স্হানান্তরে সবারই ঘরে, কাটিয়ে গেল জীবনখানি।।[১০]

স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ শুধু গানে নয় পত্র মাধ্যমেও জানাতে ভুল করেননি তিনি। শ্রীচুনীলাল ঘোষকে (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, বাংলাদেশ) পাগল কালনা (বর্দ্ধমান) থেকে পত্র লিখে জানান, "তোমাদের পাগলীমা মরে গেছে। ২৩শা ভাদ্র শ্রাদ্ধ। সবাইকে জানিয়ে দিও।"

Dhaka University Institutional Repository

মা

শুভবা

মা হরবোলা মন্দির

দীঘা

ক্রমিক নং ——————

তারিখ ——————

ওবার পৌষ মাসে — নিজেই শ্রেষ্ঠ দানই —
যাঁহাকে তোমরা — পাগলা মা — বলিতে।
সংসারের সাধন হিসাবে — এই প্রথা, আমার
করিতেই হইবে — যতদিন — [illegible] সন্ন্যাসী
নকেই সাথীরা. এই দিন উৎসবে হইবে —
সুন্দর ভাবে — যাহা প্রয়োজনীয় —
তাহাই করিও — আমি আনন্দ পাবো।
আশীর্বাদ:

প্রাপ্তি তারিখ: (তিন মাসের — তবা আগমণ
ইত্যাদি [illegible] — [illegible] / [illegible] মন্দিরে
১৩৮৫ [illegible] [illegible])

Dhaka University Institutional Repository

প্রাত্যহিক জীবনে, সাধারণের দৃষ্টিতে, তিনি ছিলেন ঘোর সংসারী। কিন্তু মজার কথা এই, উপার্জনের প্রতিযোগিতায় তিনি নাম লেখাননি কখনো; রাম প্রসাদের মতো সংসার করে গেছেন। দায়িত্ব ও কর্তব্য জ্ঞানে তিনি ছিলেন চির সজাগ। সর্বক্ষণ লোক-পিপাসু ভবাপাগলা স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্যও সময় ভাগ করে দিয়েছিলেন। শৈবলিনী দেবী বিবাহের দু'বছর পর মা হবার যোগ্যতা অর্জন করেন। প্রথম সন্তানটি ছিল কন্যা। ভূমিষ্ট হবার আগেই তা মারা যায়। এর দু'বছর পর সনৎকুমারের জন্ম। দ্বিতীয়া কন্যা, নাম প্রতিমা, সর্বশেষে ছেলে সংকল্প। সনৎ, প্রতিমা ও সংকল্পের মধ্যে বয়সের ব্যবধান পাঁচ বছর অন্তর অন্তর। মা গয়াসুন্দরী দেবীর মৃত্যু হয় ভবাপাগলা দারপরিগ্রহ করার অনেক পরে। তখন নাতী সনৎকুমার প্রায় ছ'মাসের কোলে। এ সময় পাগল ছিলেন কলকাতায়। মাতৃবিয়োগের প্রায় একমাস পর সংবাদ পেয়ে পাগল ফিরে এসে মায়ের সমাধি পাশে যান(গৃহের সম্মুখেই গয়াসুন্দরী দেবীকে প্রথমে সমাহিত করা হয়েছিল)। স্থানটি মায়ের শয্যার জন্য অনুকূল নয় মনে করে পাগল তখনই কোদাল সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেন। অতঃপর শবদেহ তুলে-যেখানে ফুলের বাগান পরিশোভিত মাতৃমন্দির- তারই পাশে ভূমিতে, সদ্য প্রস্তুর নির্মিত সমাধি তৈরী করে তাতে সমাহিত করেন।"[১২] প্রীতিমোনাশ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "পরমগুরু ভবাপাগলা (১মখন্ড): আমতা পর্বে" - বলেন, পাগল নাকি তাঁর জননীর পারলৌকিক কৃত্যে (শ্রাদ্ধে) অন্যান্য ভাইদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন এবং প্রচলিত বিধি অনুসারে "মস্তকমুন্ডন" ও করেন। তবে ভবাপাগলার সমস্ত জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, প্রায় সব প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই ছিল তাঁর প্রচন্ড রকমের বাড়াবাড়ি। যেমন, নতুন স্থাপিত মায়ের সমাধিটি তিনি প্রচলিত হিন্দু রীতি অনুসারে (উত্তর-দক্ষিণমুখী) না রেখে তিনি পূর্বে-পশ্চিমে স্থাপন করেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

তাতে বরং দূর থেকে সমাধিটি সহজেই দর্শকের দৃষ্টি কাড়ে । মায়ের সমাধির কাজ সম্পন্ন করে পাগল মাতৃ উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে লেখেনঃ-

যাহার উদরে জনমিয়া
ডাকিতে শিখেছি কালী বলিয়া
সেই পুণ্যময়ী জননীর কায়া,
মহানিদ্রায় অচেতন, ভুলিয়া মায়া ।

সবার ঘুমাতে হবে জীবনের শেষে,
অহংকারে মাতিও না, দেখে শমন হাসে ।
তাই বন্ধু দারাসুত মহামায়ার খেলা,
ভবা বলে, কেউ কারো নয় যখন ডুবে বেলা ।।

ভবাপাগলা
আমতা কালীবাড়ী,
ঢাকা।[১৩]

"ঈশ্বরে প্রগাঢ় বিশ্বাস ও সাধুসন্ত সেবায় গয়াসুন্দরী ছিলেন আত্মনিয়োজিতা।"[১৪] ধামরাই উপজেলায় চিনাইল গ্রামের সিদ্ধ পুরুষ শ্রীক্ষ্যাপা পাগলার কাছ থেকে গয়াসুন্দরী দীক্ষা নিয়েছিলেন । শোনা যায়, গয়াসুন্দরী দেবী শিশু ভবাকে নিয়ে একবার চিনাইল গেলে, ক্ষ্যাপা পাগলা শিশু ভবাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করে বলেছিলেন, "তুই অনেক কাজ করতে এসেছিস ।" তারপর শিশুকে মায়ের কোলে দিয়ে বলেন, "মা তুই যত্ন করিস একে । তোর ঘরে সিদ্ধ পুরুষ এসেছে । ও সিদ্ধি লাভ করবে ।"

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য-নির্দেশ

১। ক. ভবাপাগলার রচিত গান ঃ

দেখবি যদি,, আয় ছুটে আয়,, (এক) বসেছে আনন্দ মেলা ।
ভালবাসার, প্রেম পীরিতির,, নিস্কামিয়া ফেরিওয়ালা ॥

শ্রীক্ষেত্রে,, শ্রীজগন্নাথ দেব, মা বিরাজে শ্রী-বিমলা ।
(সেথায়) হাঁড়ি ছুলে জাত যায় না,, সবাই সেথা আত্মভোলা॥

শ্রী-বৃন্দাবনে,, শ্রীরাধা প্যারী,, শ্রী-গোবিন্দ নন্দলালা ।
(সে-যে) কী আনন্দ,, নন্দের ব্যাটা,, মাখা-মাখি জাত গোয়ালা॥

শ্রীকাশীধামে ,, শ্রীঅন্নপূর্ণা,, শিবের কাঁধে ভিক্ষার ঝোলা ।
ভূমিকম্পের লক্ষমম্প, নাই কো সেথা মৃত্যু জ্বালা ॥

শ্রীগয়াধামে,, গয়াসুরের মাথায় বিষ্ণুর চরণধূলা ।
দ্বিখন্ডিত হয় ব্রহ্মান্ড,, পিন্ড না প'লে একটি বেলা ॥

গয়াদেবীর গর্ভে জন্ম,, নামটী তার ভবাপাগলা ।
গজেন্দ্র জন্মদাতা,, জন্মভূমি ঢাকা জিলা ॥

খ. অন্য আর একটি গানেঃ

তুলসীকে যদি ঠেলে ফেলে দেয় সমাজের মুকুট দল।
আমি আনন্দ সাগরে হাবুডুবু খাব,, এ যে পতিত গঙ্গাজল॥

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধি নাই মোটে,, জ্ঞানও তেমন,, বিবেচনা বড়ই কম।
"কালী" বলে ডাকি,, এই মহাসুখ,, ভয় করে মোরে যম॥

দিনের পর,, দিন কেটে যায়,, হাসি হাসি মুখ ভরা।
বুঝিবে সে জন,, পথের-পথিক জীবনে যে জন মরা॥

পূরব বঙ্গের,, ঢাকার গর্ভে গর্ব্বিত গ্রাম আমতা।
সেই গ্রামে জনম মোর,, পিতা গজেন্দ্র,, গয়া মাতা॥

বাঁচন মরণ, এই দুইকূল,, সমাজ অমর ধাম।
সেই সমাজের অধিকারী মুই, ভবাপাগলা মোর নাম॥

২। "১৩০৭ সাল, ভবাপাগলার মা" — পাগলের শ্রীহস্তে প্রতিষ্ঠিত কালনার ভবানী মন্দিরের চূড়ায় অনুরূপ ফলক পাগল স্থাপন করে রেখে গেছেন। এর রহস্য পাগল কারো কাছেই প্রকাশ করে যাননি।

৩। প্রীতিমোনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরমগুরু ভবাপাগলা (প্রথম খন্ড): আমতা পর্ব, ২৪পরগণা, ১৩৯১, পৃ. ৪০

৪। সত্যগিরি, ভবাপাগলা(সংক্ষিপ্ত জীবনী), ভবার মহাতীর্থ(বাতুর), মুর্শিদাবাদ, ১৩৯৫, পৃ.১৩

৫। সৈকত আসগর, মানিকগঞ্জ জেলার লোক সাহিত্য, মানিকগঞ্জ, ১৩৯৩, পৃ. ১৪৭

৬। পরম গুরু ভবাপাগলা (১মখন্ড): আমতা পর্ব, পৃ. ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

৭। ভবাপাগলা (সংক্ষিপ্ত জীবনী), পৃ. ১৬-১৭

৮। ঐ, পৃ. ১৬

৯। পরম গুরু ভবাপাগলা(১মখন্ড):আমতা পর্ব, পৃ. ১৩০

১০। ভবার, বৌ,মরে গেলো,, নাম ছিল তার শৈবলিনী ।
সহানান্তরে, সবারই ঘরে কাটিয়ে গেলো জীবনখানি ।।

ভবাও তাই ভবঘোরে, ঘুরে বেড়াতো,,
ভিক্ষা করি, গান শুনিয়ে, মাৎ করে দিতো ।
দু'এক মুঠো ভাত, ডাল দিলে, সে খেতো,
বড়,ঘরের, বড় সংসার, চালাতো মা ভবানী,,
ভাবি, না কিছু আমি,, আসে,, কেন কিসের চিন্তা
মিষ্টি , খাই না, নুন, ঝাল খাই, ভালবাসি নুন্তা,
দিনান্তে,, চেয়ে দেখি,, এগিয়ে এলো রজনী,,
ভালই হলো বৌ-মরিল,, ভবা মলেই ঘুচলো ল্যাঠা,,
তবুও ভবা,, ভুলবে নাকো, মা বেটির ঐ চরণ দু'টা ।
গনছি বসে , অবশেষে, বাকি আছে, দিন ক'টা,,
ঐ, দিনটা দেখো মাগো, শ্বাস-প্রশ্বাসের টানাটানি ।।*

১৩৮৭ সেন ১ই ভাদ্র, সন্ধ্যা ৬-২০মিঃ পাগলের স্ত্রীর মৃত্যুর পর দিন রচিত, শ্রীশরৎকুমার চৌধুরীর সৌজন্যে প্রাপ্ত ।

১১। ১৬ই ভাদ্র ১৩৮৫ সন, শ্রীচুনীলাল ঘোষকে (গড়পাড়া,মানিকগঞ্জ,বাংলাদেশ) লিখিত পাগলের চিঠি ।

Dhaka University Institutional Repository

১২। প্রবন্ধঃ "ভবাপাগলা প্রসঙ্গে"- গোপিকা রঞ্জন চক্রবর্তী, প্রকাশ-ভবামৃত, সম্পাদকঃ শ্রীগোপাল মৈত্রী, কার্তিক-অগ্রহায়ণ-১৩৯৫ সন সংখ্যা ।

১৩। লেখাটি ফলক আকারে ভবাপাগলার মায়ের সমাধি গাত্রে আজও বর্তমান আছে।

১৪। ভবাপাগলা (সংক্ষিপ্ত জীবনী), পৃ. ২৪

-------০-------

Dhaka University Institutional Repository

পরিচিতি

তিনি দেখতে ছিলেন এরকম —হালকা পাতলা গড়ন, গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, চিবুকে এক গোছা দাঁড়ি।[১] অধ্যাপক সৈকত আসগরের এই মন্তব্যের সঙ্গে মাত্র একটি বিষয় ছাড়া আমি সম্পূর্ণ একমত। বিষয়টি পাগলের গায়ের রং। পাগলের গায়ের রং ছিল —গৌর বর্ণ। শ্রীচিত্তরঞ্জন সাধু (বর্তমানে আমতা মন্দিরের একজন সেবায়েত এবং পাগলের সঙ্গে প্রায় দশ বছর কাটিয়েছেন) আবেগ কণ্ঠে জানান, "আমার পাগলের মত রং আমি কোথাও খুঁজে পাইনা।" গড়পাড়ার জমিদার ভ্রাতা শ্রীচুনীলাল ঘোষ এবং পাগলের স্নেহ-ধন্যা নীলিমা ঘোষ সহ যার কাছেই গিয়েছি কেউ পাগলের শ্যামল বর্ণের কথা স্বীকার করেননি। ভবাপাগলার জীবন যাত্রার মান ছিল অতীব সাধারণ। "পরনে হাঁটুবাড়া একখানা নীল বস্ত্র দুলিয়ে দিতেন বক্ষের দু'ধারে। নগ্ন পা, নগ্ন গা, (বৃদ্ধ বয়সে ভক্তদের অনুরোধে জামা ব্যবহার করেছেন), সুগম্ভীর নাভি কমল, বুদ্ধিদীপ্ত জ্যোতি বিকশিত মুখমন্ডল। তাতে নয়নে জাগরণে প্রস্ফুটিত মধুর হাসি। সুদীর্ঘ শ্মশ্রু শোভিত বদন কমল। চাঁচর কেশদাম শোভিত শ্রীমুখ।[২] শ্রীসোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে লেখেন", শীত-গ্রীষ্ম বারোমাস খোলা গা, খালি পা। পরনে শুধু দু'হাত বহরের পাঁচ হাত লম্বা এক খন্ড লাল বস্ত্র। ব্যস, এই পর্যন্ত, শুধু পূজো করার সময় একটি নীল চাদর গলায় রাখেন, আর কয়েকটি বিশিষ্ট মালার গুচ্ছ গলায় পরেন। মাথায় উস্কোখুস্কো কেশদাম। চিবুকে অতি সামান্য শ্মশ্রু। দেহ যষ্টি স্থূল নয়, মেদপূর্ণ নয়। একহারা পাতলা গড়নের চেহারা। ফোঁটাকাটা তিলক আটা নয়। আড়ম্বরের বালাই কিছুমাত্র নেই, কোন দিনই নেই।"[৩] শ্রীসত্যগিরি এবং শ্রীসোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই লেখা দু'টি পাঠ করার আগে আমি বাংলাদেশের অনেকের কাছেই গিয়েছি পাগলের জীবন যাত্রা সম্পর্কে জানার জন্য। গত আশ্বিনে কালনা বসে পাগলপুত্র

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীসনৎকুমার চৌধুরীর নিকট এর সত্যতা যাচাই করে যে, ধারণাটি জন্মে তাতে পাগল ছিলেন, অন্যান্য পাগলের আচরণ বিধির চাইতে একটু ভিন্ন প্রকৃতির। তিনি অত্যন্ত ছোট বয়স থেকেই কাপড় পরতে পছন্দ করতেন, তবে খুবই সীমিত। ১০/১২ বছর বয়স থেকেই লাল বস্ত্র পরিধান করতেন কিন্তু তা মোটেই দশহাতী বা পূর্ণগজী নয়। বিদ্যালয় ছাড়ার পর থেকে বার্ধক্যের আগ পর্যন্ত কখনো গায়ে জামা বা গেঞ্জি জড়াননি। শেষকালে ভক্তদের অনুরোধ উপরোধ রক্ষার্থে অনেক কিছুই তাকে মেনে নিতে হয়েছে। শ্রীচুনীলাল ঘোষ তাঁর অভিজ্ঞতা (১৯৫২-১৯৫৭) বর্ণনা করে বলেন, "পাগল পাঁচ হাত দীর্ঘ লাল একখন্ড বস্ত্র ধুতির মত করে এমন ভাবে কোমরে জড়িয়ে নিতেন, মনে হোত যেন এর অধিক কাপড় তাঁর জন্য প্রয়োজন ছিল না। অর্থাৎ আস্ত একটি ধুতির কাজ তিনি অর্ধখানা দিয়েই সম্পন্ন করতেন। গলায় নীল বস্ত্র ঝুলিয়ে দেয়ার ব্যাপারটি তিনি নিজেও স্বীকার করেন। শয্যার ব্যাপারে পাগল বরাবরই মাটিতে অথবা নিরাভরণ কাঠের চৌকি বা খাট পছন্দ করতেন। মাথায় বালিশের পরিবর্তে শক্ত পেতলের কাঁসর ব্যবহার করতেন। মাথার চুলগুলো সর্বদা উন্মুক্ত থাকত - তাতে চিরুনি পড়েছে এমন কেউ বলেননি। পাগল প্রতিদিন স্নান করতেন। গায়ে বা মাথায় সাবান মাখার কথা বাংলাদেশে তাঁর ভক্তদের, কারো কাছ থেকে শোনা যায়নি। ওপার বাংলার অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় "পাগল বড় বড় চার বালতি জলে স্নান করেন। শীতের দিনে দু'বালতি গরম জলে আর দু'বালতি ঠান্ডা জলে। মাথায় প্রতিদিন সাবান মাখেন পাগল। তিনি বলেন — তাঁর মাথার চুলগুলিই এরিয়েল। বিশ্বের বাণী তিনি ওর মাধ্যমেই শুনে থাকেন। তাই মাথার লোমকূপ পরিস্কার থাকা চাই। গায়ে সাবান মাখা পাগলের মোটেই পছন্দ নয়। মাঝে মাঝে জোর

Dhaka University Institutional Repository

করে হাতে পায়ে ধুকে দিয়ে একটু একটু সাবান মাখতে বাধ্য করে 'ডলি'। (ডলি ঘটক কালনা মন্দিরের আশ্রমবাসী এক মেয়ে)।[৪]

খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে পাগলের কোন বাছ-বিচার ছিল না। জাত পাতের বালাই মানতেন না। হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রীস্টান, সবার হাতে বা সবার বাড়ীতেই তিনি আমন্ত্রিত হলে খেয়ে নিতেন। তবে তিনি সব সময় স্বল্পাহারী ছিলেন। "পাগলের প্রিয় জলযোগ ফেনাভাত, একটু ঘি, আর তেল-লঙ্কা ভাজা। শুকনো ডাল যদি সঙ্গে থাকে তবে তো অতি উত্তম।"[৫] শ্রীগোপাল ক্ষেত্রী (সম্পাদক ভবামৃত) আমাকে জানান, পাগলের প্রিয় ছিল ডিমের মামলেট। মাংস আহারের কথা কেউ স্পষ্ট করে বলেননি। তবে মৎস আহারী ছিলেন তিনি। দুধ, আধুনিক বিস্কুট, চানাচুর, মিষ্টি, হরলিক্স প্রভৃতি খাবার খেয়েছেন ভক্তদের অনুরোধে।

ভবাপাগলার পথ চলার গতি ছিল সাধারণ মানুষের চাইতে একটু দ্রুততরো। তাঁর সাথে পথ চলেছেন অনেকেই। আমতার রাইচরণ কর্মকার আমাকে জানান, "কখনো অমনোযোগী হয়ে পড়লে দৌঁড়ে যাওয়া ছাড়া আমাদের কোন উপায় থাকত না।" পাগল চেষ্টা করতেন গাড়ী ঘোড়ায় না চড়ে পায়ে হেটে যাবার। তাই বলে তিনি আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতাকে উপেক্ষা করেছেন একথা বলা যাবে না। বাংলাদেশ ত্যাগ করে ভারত চলে যাবার পর অনেক কিছুই বরণ করে নিয়েছিলেন তিনি। ভক্তরা গাড়ী পাঠালে উপেক্ষা না করে তা সাদরে গ্রহণ করতেন। অনেক সময় চিঠি পাঠিয়ে ভক্তদের কাছ থেকে গাড়ীও চেয়ে নিতেন। সোদপুর, ২৪ পরগণার শ্যামাপদ সাহা এবং

Dhaka University Institutional Repository

কলকাতার শ্রীগোপাল ফেত্রীর নাম এক্ষেত্রে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর পথ চলার মধ্যে সঙ্গীতের মত এক প্রকার ছন্দ পরিলক্ষিত হোত। আর এই ছন্দ যোগাত হাতের ঘুমকাবাঁধা সুর্ণের লাঠিটি। (লাঠিকে নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরে করা হবে)।

১। সৈকত আসগর, মানিকগঞ্জ জেলার লোক সাহিত্য, পৃ. ১৪৭

২। সত্যগিরি, ভবাপাগলা, পৃ. ৯

৩। শ্রীতিমোনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরমগুরু ভবাপাগলা, (২য় খন্ড) কালনাপর্ব, পৃ. ২৮

৪। ঐ, পৃ. ১১১

৫। ঐ, পৃ. ১৩১

-----o-----

Dhaka University Institutional Repository

ভবাপাগলার বংশলতিকা: 'ক' *

- মাগন চন্দ্র
  - বাঁশারাম
    - নবকান্ত
      - কৃষ্ণকান্ত
        - কেশব মোহন
          পত্নী: ১. রুদ্ধময়ী
          ২. শুশীলা সুন্দরী
        - গজেন্দ্র মোহন
          পত্নী: গুয়াসুন্দরী
          - গিরীন্দ্র মোহন
            পত্নী: রাধা কুন্ডদেবী
            ছয় পুত্র:
            ১. গৌর মোহন
            ২. গোবিন্দ মোহন
            ৩. গদাধর
            ৪. গোকুল মোহন
            ৫. গোলোক মোহন
            ৬. গোপী মোহন
          - কিরণশশী
          - ননীবালা
          - টেঁপু
          - দেবেন্দ্র মোহন
            পত্নী: রেনু বালা
            এক পুত্র, দুই কন্যা
            ১. দক্ষিণা রঞ্জন
            ২. পারুল
            ৩. অর্চণা
          - ভবেন্দ্র মোহন
            পত্নী: শৈবলিনী
          - সতী–আগমনী
        - হরেন্দ্র মোহন
          পত্নী: কুলকামিনী

সদয় চাঁদ চৌধুরী সম্পাদিত, 'ভবাভবা' ৪র্থ-বর্ষ-২য় সংখ্যা/শ্রাবণ ১৩১০, মাসিক পত্রিকার সৌজন্যে প্রাপ্ত ।

Dhaka University Institutional Repository

ভবাপাগলার বংশলতিকা: 'খ' **

- ভবাপাগলা
  পত্নী: শৈবলিনী
  - সনৎ চৌধুরী
    পত্নী: ১. পাখী চৌধুরী
    ২. বীণা চৌধুরী
    - সনৎ চৌধুরী
      পত্নী: পাখী চৌধুরী
      - শিখী পুচ্ছ চৌধুরী
        পত্নী: সোমা চৌধুরী
        - রাজ্যশ্রী চৌধুরী
      - কানু চৌধুরী
        পত্নী: বুবু চৌধুরী
        - প্রিয়ঙ্কা চৌধুরী
      - রণতরী চৌধুরী
        পত্নী: সুনীতা চৌধুরী
        - গুঞ্জা চৌধুরী
        - রণিতা চৌধুরী
      - অপরূপা চৌধুরী
      - সমাপ্তি চৌধুরী
    - সনৎ চৌধুরী
      পত্নী: বীণা চৌধুরী
      - সীমান্ত পারাবার চৌধুরী
  - প্রতিমা চৌধুরী
    স্বামী: মনোরঞ্জন সাহারায়
    - নির্মাল্য সাহারায় (পুত্র)
  - সংকল্প চৌধুরী
    পত্নী: বন্দনা চৌধুরী
    - সোনালী চৌধুরী (কুন্ডু)
      স্বামী: নিত্যানন্দ কুন্ডু
    - ঝুনঝুন চৌধুরী
    - টুলু টুলু চৌধুরী

** সৌজন্যে: শিখীপুচ্ছ চৌধুরী। (গত ১৯শে আশ্বিন, ১৩৯৭ সন বাংলা/৫ই অক্টোবর-১৯৯০ সন ইংরেজী, শ্রীপাগলের নাতী শ্রীমান শিখীপুচ্ছ চৌধুরী, কালনা, বর্ধমান, মন্দিরের সংলগ্ন নিজ শোবার ঘরে বসে, রাত্রি আনুমানিক আটটায় এ বংশলতিকাটি প্রদান করেন)।

Dhaka University Institutional Repository

বাল্য জীবন ও শিক্ষা

ভবাপাগলার শিক্ষা জীবন খুব বেশী এগোয়নি । সপ্তম শ্রেণীতে উঠেই তিনি পড়াশোনার পাঠ চুকিয়ে ফেলেন । তবে খুব ছোট বয়সেই পাঠশালামুখী হয়েছিলেন । ২১শে চৈত্র, সোমবার ১৩৭২ সন 'ভবার অভিজ্ঞতা' নামক নিবন্ধে পাগল অতীত স্মৃতি-চারণ করতে গিয়ে লেখেন, "আমার বয়স যখন সাড়ে চার কি পাঁচ তখনকার কথা । আমি খুবই দুর্দান্ত ছিলাম যা জিদ ধরেছি বা বায়না করেছি তাহা না হইলেই একে বারে হুলুস্থুল লাগাইতাম । কিন্তু মন দিয়ে লেখাপড়া করিয়াছি । আমি পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছি, ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়া সপ্তম শ্রেণীতে উঠিয়া পড়া ছাড়িলাম ।"[১] পাগলের এই সাত বছরের (প্রথম পাঠ থেকে সপ্তম শ্রেণী) শিক্ষা জীবনকে আমরা দু'টি পর্বে ভাগ করতে পারি। প্রথম পর্ব প্রথম পাঠ থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী উত্তীর্ণ পর্যন্ত । দ্বিতীয় পর্ব পরবর্তী চার বছর ।

প্রথম পাঠ কালে ভবা গ্রামেরই মাইনর স্কুলে(আমতা এম,ই,স্কুল) পড়াশোনা করেন । পিতা গজেন্দ্রমোহন দেবেন্দ্র এবং ভবেন্দ্রকে বাড়ীর অন্যদের পরামর্শে উক্ত বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দেন । তথ্য অনুসন্ধান করে জানা যায়, তখন সে স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন অনুদাবাবু এবং সহকারী প্রধান শিক্ষক ছিলেন উপেন্দ্রবাবু । দু'জনেই ছিলেন বিক্রমপুর নিবাসী । এ সময় ভবার পিতৃ বিয়োগ ঘটে । পিতার মৃত্যুর পর ভবেনের অত্যাচার বালক-সুলভ) যেন সংসারে অনেকটা বেড়ে যায় । তখন বড় দাদা গিরীন্দ্রমোহন এবং মা গয়াসুন্দরী দেবী সিদ্ধান্ত নেন ভবেন্দ্র এবং দেবেন্দ্রকে আমতা থেকে কয়েক মাইল দূরে সেই পাকুটিয়ায় রেখে পড়াশোনা করাবেন । বিদ্যালয়টির

Dhaka University Institutional Repository

নাম ছিল বি,সি,হাই স্কুল-(বৃন্দাবন চন্দ্র উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়,পাকুটিয়া)। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন উক্ত গ্রামেরই জমিদার শ্রী উপেন্দ্র মন্ডল । এই স্কুলটি সম্পর্কে বিষদ বর্ণনা দিয়ে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন সাহা,(ভবাপাগলার বাল্য বন্ধু) শ্রীভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে জানান ,—

"আমাদের সময়ে প্রধান শিক্ষক ছিলেন শ্রীযুক্ত কামাখ্যা রায়,সহকারী প্রধান শিক্ষক ছিলেন শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র সরকার । হেড পন্ডিত ছিলেন দেবেন্দ্র অধিকারী, অপর পন্ডিত শ্রীযুক্ত জগদীশ গোস্বামী । শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সাহা ইতিহাস পড়াতেন এবং ইংরেজী ট্রানস্লেশন ও কম্পোজিশনের ক্লাসও নিতেন । শ্রীযুক্ত রাসবিহারী সাহা নামে একজন শিক্ষক ছিলেন । সবাই তাঁকে এল,টি মাস্টার মশাই" বলতাম (কেন ঐ নাম জানি না)। তিনি অঙ্ক করাতেন এবং ভূগোল পড়াতেন । তাছাড়া শ্রীযুক্ত হরিপদ সিকদার, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র হাজরা, শ্রীযুক্ত কুমুদ বাবু, শ্রীযুক্ত অমল বাবু, শ্রীযুক্ত তারক বাবু, শ্রীযুক্ত মধুবাবু, শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ বাবু, শ্রীযুক্ত হরলাল বাবু প্রভৃতিও খুব নামী শিক্ষক ছিলেন । ভবেন দাদা পাকুটিয়া স্কুলে তৃতীয়,চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে আমাদের সময়েই পড়েছিলেন । ষষ্ঠ শ্রেণীতেও প্রমোশন পেয়ে উঠেছিলেন , কিন্তু তিনি স্কুলে আর তো গেলেন না । দেবেন দাদাও ভবেন দাদার সঙ্গে একই শ্রেণীতে পড়তেন । আমি পড়তাম দুই শ্রেণী নীচে । আমিও ঐ একই ছাত্রাবাসে থেকে পড়তাম '। দেবেন দাদা ও ভবেন দাদার পাশের ঘরে ছিল আমার সীট ।[২]

সুতরাং ক্লাসে ভাল ছাত্রের খাতায় নাম থাকা সত্ত্বেও ভবাকে বেশীদিন বইয়ের পাতার সীমায় ধরে রাখা সম্ভব হয়নি । যে ক'টা দিন ছাত্রাবাসে বা ক্লাসে থাকার কথা তাও মাঝে মধ্যে কাউকে না বলে বাড়ী চলে এসেছেন । শিক্ষকগণ এর জন্য তেমন রাগ করেছেন বলে শোনা যায়নি । তাঁরা এ দু'ভাইয়ের স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে ভাল করেই জানতেন । ভবাপাগলা তাঁর বাল্য স্মৃতি-চারণ

Dhaka University Institutional Repository

করতে গিয়ে আপন চরিত্রের দুরন্ত স্বভাবের কথা উল্লেখ করেছেন । তিনি ছোট বেলায় বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে দলবেঁধে প্রায়ই নদীর ধারে বেড়াতে যেতেন । গ্রামের নবীন প্রবীন বৌ-ঝিরা মাটির কলসী নিয়ে জল ভরতে আসতেন ঘাটে । ভবেন্দ্র দুষ্টামী করে ঢিল ছুঁড়ে মাঝে মধ্যেই তাদের কলসী ভেঙ্গে দিতেন । সে জন্য নালিশও যেত গয়াসুন্দরীর কাছে ; পাগলা তাঁর গানে বন্ধু বান্ধবদের ফিরিস্তি গেয়েছেন এই ভাবে :-

কত আনন্দ ভবাপাগলার এবার সহচর পেয়েছে সঙ্গে ।
ভাগ্যে আমার সদাই সনে থাকে ঐ যে প্রাণের বন্দে ॥

বিধু আমার বাল্য বন্ধু , অশ্বিভূষণ প্রেমের সিন্ধু ।
গঙ্গাচরণ পারের বন্ধু , যে দিয়েছে ব্রহ্মময়ী ঐ অনুদে ॥

মামা আমার পূর্ণচন্দ্র, দাদা গিরীন্দ্র, সুরেন নগেন্দ্র ।
ভক্ত শ্রেষ্ঠ গিরীজাকান্ত," হলোহার" কপালে দাগ বসি শ্রীপদে ॥ [২০]

পরেশ, রমেশ , সুরেশ, ননী, শিবা, নিবারণ নিকুঞ্জ মণি ।
ভবার মাথার ব্রহ্মননী, হরিদাসের তরে প্রাণটি কাঁদে ॥

অবিনাশ , অমল , রবি, কৃষ্ণদাস, দেবেন্দ্র ,ললিত সাগর কালীদাস।
রাজহংসরূপী নামের আভাস, পেয়ে ভাসে তারা সদানন্দে ॥

Dhaka University Institutional Repository

অমিয় , বসন্ত, গদু, নন্দ, শচী, মদন, রাধা গোবিন্দ ।
ভবানী , অমূল্যচন্দ্র, তারা পড়লো এসে মায়ের ফাঁদে ॥

কচু , চনু, কেষ্টু, হরু, মঙ্কা, যোগী, যোগেশ, জীবন ।
রাধাবল্লভ, উপেন, পানু, লালমন, প্রেমে ভাসে তাঁরা কেঁদে কেঁদে ॥

সুধীর, সুশীল, বান্টু গোপী, শ্যামা নাম হৃদয়ে জপী ।
ফকীর , মন্মথ, বাদল , মন্টী, রোহিনী, কিরণ ঐ ফিরেছে ॥

মহেন্দ্র, জ্ঞান, পাঁচু গোপাল, গোকুল গৌর নিত্য গোপাল ।
(এরা) নাম শুনিয়ে করলো মাতাল, সুখে থাকবে মায়ের আশীর্বাদে ॥

মুক্ত কন্ঠে সদাই বলি, কালী কালী মহাকালী ।
ভবাপাগলার ফুটলো বুলি, পেয়ে সকল পারিষদে ॥

এই সকল পারিষদদেরনিয়েই চলত পাগলের শৈশবকালীন দিন গুলির পরিকল্পনা। শোনা যায় , একবার " নষ্ট চন্দ্র " তিথিতে ভবা, তাঁর জ্যাঠাইমার বান্ধবী লেবুর বাগানে সদল বলে হানা দিয়েছিলেন রাত্রি দ্বিপ্রহরে । তার চেয়েও বড় কথা এই যে, পাগলা যখন বয়সে কিশোর তখন এই সব বন্ধু-বান্ধবের তথা সমবয়সীদের নিয়ে তিনি আমতা গ্রামে একটি কনসার্ট পার্টি গঠন করেছিলেন । যার মূল উদ্যোগতাই ছিলেন তিনি নিজে । শ্রীগিরিজা শঙ্কর রায়, (ভবা-পাগলার আবাল্য লীলাসঙ্গী) শ্রীমনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কে এ সম্পর্কে পত্র লেখে জানান, (৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭০)

Dhaka University Institutional Repository

"কনসার্ট পার্টি যখন আরম্ভ হয়।
তখন আমাদের বয়স অনুমান ১৬/১৭ বছর। স্কুলে পড়াশোনা করি।
কনসার্টে ভবাপাগলা বাজাতেন বেহালা, আমি হার্মোনিয়াম, মধু ও
ভাসানী বৈদ্য বাঁশী, তবলা ও ঢোলক বাজাতো উপেন্দ্রনাথ বৈদ্য, খোল
গিরীন্দ্র কর্মকার, মন্দিরা ও করতাল বাজাতেন রমেশ সরকার।[৩]

গ্রামের বয়োবৃদ্ধদের অভিমত, "কনসার্ট" নাকি খুব জমেছিল। কারণ
ভবাপাগলার বেহালার হাতছিল খুবই নিপুণ। বালক ভবা, পাঠশালার
পার্থিব শিক্ষার পাশাপাশি অন্যান্য শিল্প কর্মের প্রতিও ঝুঁকে পড়ে ছিলেন।
বিশেষ করে সঙ্গীতশিল্পও মৃৎশিল্পের প্রতি। তাঁর প্রথম রচিত গান :-

এস মা কালী শুন মা বলি, আমার প্রাণের বেদনা।
লাগেনা ভাল কি যে করি তুমি আমায় বলনা।।[৪]

অত্যন্ত ছোটবয়সের রচনা এটি। প্রথমে মুখে মুখে গান রচনা করে, সেটিতে
সুরারোপ করতেন ভবা। (পরে সে গুলিকে কাগজে লিপিবদ্ধ করে গেছেন।)
পাগলের স্নেহভাজন শ্রী চুনীলাল ঘোষ (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ) মত প্রকাশ করে
বলেন, "এস মা কালী শুন মা বলি" ভবা পাগলার ৫/৬ বৎসর বয়সের
রচনা। শ্রী সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'পরম গুরু ভবাপাগলা' গ্রন্থে উক্ত
গানটি উল্লেখ করে লেখেন, গানটি পাগল বালক বয়সে শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীকে
গেয়ে শুনিয়ে ছিলেন। গানটি "ঝিঝিট-মিশ্র কাহারবা" রাগে গাওয়া হয়ে
থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১। "ভবার অভিজ্ঞতা" — প্রকাশ: পরম গুরু ভবাপাগলা: ১মখন্ড - আমতা পর্ব, পৃ. ১৭৫

২। ঐ, পৃ. ৬২

৩। ঐ, পৃ. ৮২

৪। সঙ্গীত (সংকলন), গান নং ৫৪

-----০-----

Dhaka University Institutional Repository

ভবাপাগলার লাঠি

ভবাপাগলা যেমন ভারতীয় উপমহাদেশের একটি বিখ্যাত নাম - তেমনি বিখ্যাত হয়ে আছে তবার লাঠিটিও। ভবাপাগলা জীবদ্দশায় যতজন শিষ্য বা ভক্ত রেখে গেছেন, এমনকি এপার ও ওপার বাংলার যে সব অঞ্চলে তিনি পরিভ্রমণ করেছেন 'পাগলের লাঠি'"র গুণগান এখনো তাদের মুখে গল্পের মতো শোনা যায় ।

'লাঠি' বাউলদের সাধনার একটি হাতিয়ার । কথিত আছে বাউলেরা সাধনায় যখন তাঁর মোকামকে বশ' মানাতে পারছেন না মনে করতেন , তখনই লাঠির আশ্রয় নিতেন । "শাসন দন্ড" সাধন দন্ড হয়েছে এমন বহু প্রমাণ বাউলদের জীবনী থেকে পাওয়া যায় । অধ্যাপক মুহম্মদ আবু তালিব, তাঁর "লালন শাহ্ ও লালন গীতিকা" গ্রন্থের 'রবীন্দ্রলালন — সাক্ষাৎকার[১] নিবন্ধে লালন শাহের লাঠির কথা উল্লেখ করেছেন । শুধু উল্লেখ করেছেন বললে কম বলা হবে, কেননা, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লালনের যে প্রথম পরিচয় ঘটে সে এই লাঠিকে উপলক্ষ্য করেই । বাংলার বাউল সাধনায় লালন শাহ্ (১৭৭২-১৮৯০) ছাড়া অন্য যাঁরা কৃতিত্বের উচ্চাসনে বসে আছেন, সেই দুদ্দুশাহ্ (১৮৪১-১৯১১), জহরুদ্দীন শাহ্ (১৮৪২-১৯০৮), পাঞ্জুশাহ্ (১৮৫১-১৯১৪), মদন বাউল, পাগলা কানাই প্রমুখ বাউল সাধক ও কবি কমবেশী 'লাঠি' ব্যবহার করতেন ।

সাধনার হাতিয়ার ছাড়া বাউলেরা বার্ধক্যের কারণেও লাঠি ব্যবহার করতেন । কিন্তু ভবাপাগলার লাঠির ইতিহাস সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যচারী । পাগল তাঁর লাঠির ইতিহাস গল্পচ্ছলে বহু জায়গায় বহু মানুষকে শুনিয়েছেন ।

Dhaka University Institutional Repository

একটি গল্প এরূপঃ

ভবাপাগলার বয়স ত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ । পাগলের তখন বিয়ে হয়েছে । সংসারী তিনি । ভারতের কোন এক পাহাড়ী অঞ্চলে পাগল যান বেড়াতে । (কারো কারো অভিমত, পাগল কামাখ্যায় গিয়েছিলেন)। ঘোর অরণ্যের মধ্য দিয়ে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন আপন মনে । (কেউ বলেন, পাগল ঔষধের সন্ধানে যান সেখানে)। হঠাৎ এক অদ্ভুত কান্ড দেখে পাগল থমকে দাঁড়ান । দেখেন, এক বাঁশ ঝাড় থেকে একটি বাঁশ পাশা-পাশি অপর ঝাড়ের এক নিরীহ বাঁশের , দিকে এগিয়ে এসে বার বার আঘাত করছে । পাগল বাঁশটির এই কান্ড দেখে এগিয়ে যান । বাঁশটি তখন শান্ত সুবোধ বালকের মতো তাঁর দিকে এগিয়ে আসে । পাগল বাঁশের গায়ে হাত রাখেন এবং গভীর মনোযোগের সাথে বাঁশটিকে দেখতে থাকেন । অদ্ভুত আচরণী এই বাঁশটির অদ্ভুত গঠন লক্ষ্য করে পাগল বুঝতে পারলেন এটি সামান্য বাঁশ নয় । পাগল আর দেরি না করে তৎক্ষণাৎ তের কোপে বাঁশটিকে কেঁটে নেন ।

ভক্তদের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাস স্বয়ং " দেবাদিদেব মহাদেব " পাগলকে এ লাঠিটি উপহার দিয়েছিলেন ।

প্রীতিমোনাশ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর " সোনার লাঠি " নিবন্ধে লেখেন ঃ-

" ময়মনসিংহ জিলার টাঙ্গাইল মহকুমার এলাকা । ওখানে বংশাই নদীর ধারে দীর্ঘ বাঁশবন ছিল । ভবাপাগলা একদিন পায়ে হেঁটেই চলছিলেন সেখান দিয়ে । সঙ্গে ছিল গৃহভৃত্য

Dhaka University Institutional Repository

গণেশ বিশ্বাস । উভয়ে সেই বাঁশ বনের ভিতর দিয়ে
হেঁটে চলছিলেন । একটা সরু বাঁশের ডগা ভবাপাগলার
গায়ে এসে পড়ছিল। তির্যক দৃষ্টিতে তিনি তাকাইলেন
বংশ - পুঙ্গবের পানে । আবার, আবার এসে বাঁশের
ডগা লাগলো পাগলের গায়ে । হঠাৎ কৈলক স্বামীর ভাব
মনে জাগলো ভবাপাগলার ।....... সঙ্গীচ্যুতা গণেশের
কোমরে ছিল একটা নেপালের ভোজালী । সেই ভোজালীটা
দিয়ে ভবেন্দ্র তের-টা কোপ দিয়ে বাঁশ টা কেঁটে দিলেন
তৎক্ষনাৎ ।"[৩]

পাগলপুত্র শ্রীশরৎকুমার চৌধুরী জানান, " ভবাপাগলা গোড়াই পাহাড় থেকে সোনার লাঠিটির বাঁশ সংগ্রহ করেন । তখন পাগলের বয়স ২০/২২ বৎসর । ভোঁজালী বা ছুরি দ্বারা পাগল তের কোঁপে** ওটিকে কেঁটে নেন । বাঁশটি সাধারণ বাঁশের চাইতে একটু ব্যতিক্রম, অদ্ভুত গিট সমুলিত ।"

গোড়াই পাহাড়ে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, গোঁড়াই পাহাড়ের সাওতালী মেয়ে পুরুষদের অনেকেই পাগলের পরম ভক্ত ছিলেন এবং তারা পাগলের কাছে বসে গান শুনতেন । পাগল নিজেও তাদের সম্বন্ধে গান লেখেন। যেমন :-

আমি মুচি , আমি মেথর, আমি ডোম, আমিই চন্ডাল ,,
আমি কোঁচ, আমি ব্যাধ, আমি সাওতাল ।[৪]

** তের কোঁপের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে ভবাপাগলা বলেন, তেড়া-বেড়া ভাব-ভাঙ্গাবার জন্য তের বার দায়ের কোপ দেন ।

Dhaka University Institutional Repository

বাঁশের গুণ বর্ণনা করে যে কয়টি গান রচনা করেন , এটি তাদের মধ্যে অন্যতম, -

বাঁশ ধন্য , নয় সামান্য, রয় না কেবল সে বনে ।
ধন্য বাঁশের ডালি, যা'তে জবা তুলি,
এনে পাগলী মায়ের দেই চরণে ॥

ত্রেতা যুগে রামের হাতে,
ধনুক হল ঐ বাঁশেতে ।
(দ্বাপরে) বাঁশের বাঁশী গোকুলেতে,, বাজায় কালা শ্রীবদনে ॥

(হরিশ্চন্দ্র) চন্ডাল সেজে গুনির হেতু,,
(শ্মশানে) নিশাকালে জাগতো নিতু ।
কত মাথা করতো ছাতু,,
বাঁশ দিয়ে সে আপন মনে ॥

শ্মশানে ঐ শ্যামা হাসে,,
বাঁশের খেলা শ্মশান বাসে।
ভবাপাগ্লা কোন্ দিবসে ,,
বাস করবে ঐ বাঁশের সনে ॥

সোনার লাঠির রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে পাগল অন্য আর এক স্হানে লেখেন,
সোনায় মোড়া লাঠিখানি,
বনদেবী, বনরাণী ।
বনমাঝে দৈববাণী,
(ওরে) বাঁশ ভবানীর করিস পূজা ॥[৫]

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে পাগলের "সোনায় মোড়া লাঠিখানি", কালনা মন্দিরে রক্ষিত আছে।[৬] এটি একটি উত্তম শিল্পের নিদর্শনও বটে । পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি দৈর্ঘ্য, অজস্র মণিমুক্তায় অলংকৃত এই লাঠিটির গোড়ার দিকটা রূপোর পাতদ্বারা বাঁধানো। গাঁটে গাঁটে সোনার পাত । সোনার পাতে মঙ্গলঘট, শঙ্খ, কূর্ম, মাছ, সিংহমুখ, কালীমূর্তি, দুর্গা, মসজিদ, শিব প্রভৃতি শতাধিক নক্সা তৈরী করে লাঠির সর্বাঙ্গে জড়িয়ে দেয়া হয়েছে । এ সব কিছু এসেছে ভক্তদের মাঝ থেকে । লাঠিতে অনেকের নাম উপহার সমূহের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে । যার সব গুলি পাঠ মনে রাখা সম্ভব হয়নি । তন্মধ্যে মা, ভানু, ছামাদ, এলোকেশী, হরিদাস (কেদারপুর) নাগু (বেতিলা, মানিকগঞ্জ) নাড়ু, ওঁ কালাচাঁদ প্রভৃতি নাম অন্যতম । বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তিখচিত এ লাঠি খুব একটা মোটা না হলেও এর মধ্যে মোটা অংকের স্বর্ণালংকার খচিত রয়েছে ।

ভবাপাগলার এই লাঠির কৃপায় বহুলোক বহু বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছেন । পাগল বহু জটিল রোগের চিকিৎসা এই লাঠির সাহায্যে করেছেন। তিনি ছিলেন কালীর সাধক । সেবার (বাং-সম্ভবতঃ ১৩৫২, মাঘ/ফাল্গুন) সুরশী সাহার (ডাউটিয়া, মানিকগঞ্জ) বাড়ীতে কালীপূজা উপলক্ষে পাগলকে নিমন্ত্রণ করা হয় । পাগল আসেন পায়ে হেঁটে আমতা থেকে । সারা রাত ধরে পূজা হ'লো । উপস্থিত ভক্ত জনদের কে পাগল মাতিয়ে রাখলেন গান গেয়ে । রাত প্রায় শেষ । পূবের আকাশ , ফর্সা হয়ে যাবে আর কিছুক্ষণ পরে । এমন সময় খেদানী সাহা নামে এক ভদ্রলোক ধূলায় লুন্ঠিত অবস্থায় পাগলের পা জড়িয়ে ধরে । গানের তাল কেটে গেল দেখে পাগল, চড়াও হয় তার উপর । লাঠির আঘাতে আঘাতে খেদানীকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে । কিন্তু কী আশ্চর্য্য, আঘাতে খেদানী ঘায়েল হওয়া দূরে থাক দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠে । অতঃপর ভবাপাগলা তাকে ঘাড়ে ধরে কালীর আসনের নীচে ছুড়ে দেন । খেদানী দু'হাতে

Dhaka University Institutional Repository

মায়ের চরণামৃত পান করে পাগলকে প্রণাম করে ঘরে ফিরে যায় । (বেদানী সাহা ছিল অর্ধাঙ্গ বাতের রোগী । সদরপুর থেকে রাতভর গড়িয়ে গড়িয়ে ছাউটিয়া এসে ছিলেন পাগলের কাছে ।) [৭] এরকম অনেক অসাধ্যই সাধন করেছেন ভবাপাগলা । ভবাপাগলা তাঁর লাঠির কারণে অনেক বিপদেরও সম্মুখীন হতেন মাঝে মধ্যে । চোর ডাকাতের লোলুপ দৃষ্টি থেকে মুক্ত ছিল না তাঁর এ লাঠিটি । কিন্তু দেখা গেছে, চোর - চুরি করাতো দূরের কথা, নিজে বয়ে নিয়ে এসে পাগলের হাতে পৌঁছে দিয়ে গেছে ।

তথ্যনির্দেশ

১. মুহম্মদ আবু তালিব, লালন শাহ্ ও লালন গীতিকা, ১ম খন্ড, জুন ১৯৬৮, ঢাকা ।

২. সৈকত আসগর, বাউল সাধক কানুশাহ্, ১লা জানুঃ ১৯৮২ ।

৩. প্রীতিমোনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরম গুরু ভবাপাগলাঃ ১ম খন্ড, পৃ. ১১৯

৪. প্রীতিমোনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরম গুরু ভবাপাগলাঃ ২য় খন্ড, পৃ. ৯২

৫. গান :

(ভবার) সোনার লাঠি দেখতে ভাল, সইছে কত কাঁটার খোঁচা ।
চাবুক হাতে বিধিমতে, অন্যায়কে, মন, দিতে সাজা ॥

ছড়ি আর চামর বেত „
বেদ-বেদান্ত, ঋগ্বেদ ।
নাই কোন আর ভেদাভেদ „
অভেদ মাত্র রাজা প্রজা ॥

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণবোধ, বর্ণ পরিচয়,
সুবোধ, নির্বোধ, দুটাই হয় ।
জ্ঞান মার্গে ঘটে বিপর্য্যয়,
পণ্ডিত সে জন্ম অজ্ঞা ॥

সোনায় মোড়া লাঠি খানি,,
বনদেবী,, বনরাণী ।
বনমাঝে দৈববাণী,,
ওরে বাঁশ ভবানীর করিস পূজা ॥

বাঁশের বংশ বংশবাটী,,
রামের ধনুক হয় আসল খাঁটি ।
কৃষ্ণের বাঁশী,, ভবার লাঠি,,
গৌর দন্ড বঙ্গের রাজা ॥

৬. শ্রীশরৎ কুমার চৌধুরীর সৌজন্যে লাঠিটি বিগত ৮-১০-৯০ তারিখে আমি প্রত্যক্ষ করি ।

৭. তথ্য, শ্রীচুনীলাল ঘোষ, গড়পাড়া , মানিকগঞ্জ ।

------ ০ ---------

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ ত্যাগ ও ভারতে গমন

ভবাপাগলা ভারত উদ্দেশ্যে আমতা ত্যাগ করেন ১৩৫৭ সনের আষাঢ় মাসে। চারিদিক থৈ থৈ বর্ষা। বালিয়াটী জমিদারদের পানসী নৌকাতে চড়ে পাগল গড়পাড়া আসেন। সঙ্গে কষ্টি প্রস্তর নির্মিত কালীমূর্তি। ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন শ্রীগণেশ ব্রহ্মচারী, (টাঙ্গাইল, পাগলের একমাত্র প্রিয় তবলা বাদক) লালু লাহিড়ী (টাঙ্গাইল, পাগলকে প্রতিদিন পূজার জন্য ফুল তুলে দিতেন), তেজেন ব্রহ্মচারী, (মানিকগঞ্জ) ও হেম ব্যানার্জি (মুর্শিদাবাদ) অন্যতম। পাগল তাঁর স্ত্রী-পুত্র কন্যাদের এক মাস পূর্বে কলকাতা পাঠিয়ে দেন। তেজেন ব্রহ্মচারী ও হেম ব্যানার্জি তাদেরকে পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুর্শিদাবাদে রেখে আসেন। পাগল কলকাতা যাচ্ছেন শুনে, গড়পাড়ার জমিদার শ্রীমোহিনী ঘোষ নিজেও পাগলের সঙ্গে যাবার ইচ্ছা পোষণ করেন। ফলে পাগলকে বেশ কয়েকদিন গড়পাড়ায় অবস্থান করতে হয়। পাগলকে শেষবারের মত দেখার জন্য অনেক ভক্তবৃন্দের আগমন ঘটে। পাগল সবাইকে সাধ্যমত সান্ত্বনা এবং তাদের সুখ কামনা করেন। গড়পাড়া থেকে যারা পাগলের সঙ্গে কলকাতা উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন তাঁরা হলেন শ্রীমোহিনী মোহন ঘোষ, লীলাবতী ঘোষ(স্ত্রী), নীলিমা (মোহিনী ঘোষের কন্যা এবং পাগলের স্নেহধন্যা), এবং মোহিনী ঘোষের অন্যান্য পুত্র কন্যা(মানস, মলয়, দীলিপ ও সন্ধ্যা)। ১৩৫৭ সনের ৪ঠা শ্রাবণ শুক্রবার (১৯৫০ সন) পাগল সবাইকে নিয়ে নৌকা যোগে রওনা হন। শ্রীচুনীলাল ঘোষের মতে, বর্ষার জলে পথ ঘাট নিমগ্ন থাকার কারণে ঘোষ বাড়ীর ঘাট থেকেই নৌকায় চড়তে হয়। ঘাটে অনেকের মধ্যে বিভূতিমোহন ঘোষ, ক্ষিরোদমোহন ঘোষ, নিরদমোহন ঘোষ, চুনীলাল ঘোষ এবং তৎমাতা উপস্থিত থেকে পাগলকে চোখের জলে বিদায় সম্বর্ধনা জানান। পাগল পানসীতে চড়ে প্রথমে শিবালয় (বর্তমানে আরিচা ঘাট) যান। সেখান থেকে স্টীমারে গোয়ালন্দ। অতঃপর দর্শনা হয়ে কলকাতা। শ্রীশরৎকুমার

Dhaka University Institutional Repository

চৌধুরী (২২শে আশ্বিন, ১৩৯৭ সন) কালনা মন্দিরে বসে জানান, "বাবা আমরা ছেড়ে আসার আগেই আমাদিগকে পাঠিয়ে দেন । প্রথম দলে ছিলাম, মা শৈবলিনী দেবী, বোন প্রতিমা, ভাই সংকল্প, বাবার স্নেহধন্যা লক্ষ্মীরাণী কুন্ডু, হেম ব্যানার্জি, তেজেন ব্রহ্মচারী এবং আমি । হেম ব্যানার্জি ও তেজেন ব্রহ্মচারী আমাদিগকে মুর্শিদাবাদ রেখে পুনরায় বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে) ফিরে যান । (পাগল পরিজনদের পৌঁছে দেয়ার জন্যই তাঁদের সঙ্গে গিয়েছিলেন ।) আমরা মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জ নামক শহরে শ্রীবিজয় কৃষ্ণ দে'র বাসায় গিয়ে প্রথমে উঠি । বড় পরিবার এবং স্থান সংকীর্ণ বিবেচনা করে দু'দিন পর আমরা লালবাগ, (কুতুবপুর) লক্ষ্মীরাণীর দাদার বাসায় আশ্রয় নেই । লক্ষ্মীরাণী কুন্ডুর ছিল দু'ভাই । বিমলকুন্ডু ও শৈলেন কুন্ডু । তারা তখন একান্নবর্তী পরিবারভুক্ত ছিলেন । জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম থেকে চৈত্র মাস অবধি আমরা সেখানে ছিলাম । দ্বিতীয় দলে ছিলেন ভবাপাগলা, গণেশ ব্রহ্মচারী, লালু ঠাকুর (লাহিড়ী), হেম ব্যানার্জি, তেজেন দা' ও ঘোষ পরিবার । তারা এসে শোভাবাজার ২২নং বলরাম মজুমদার স্ট্রীট শ্রীমল গোবিন্দ সাহার (ফটিক) বাড়ীর চতুর্থ তলায় অবস্থান নেন । পিতার কলকাতায় আগমনের সংবাদ পেয়ে আমি এক সপ্তাহের মধ্যেই উক্ত বাসায় সাক্ষাৎ করি ।"

ভবাপাগলার পার্ষদ শ্রীযতীন দাস, এই তথ্যের সত্যতা স্বীকার করে বলেন, "পাগল ৪ঠা শ্রাবণ ১৩৫৭ সন শুক্রবার গড়পাড়া থেকে নৌকা যোগে আগমন করেন । ৫ই শ্রাবণ শনিবার রাত্র ৩'৩০ ঘন্টা বা ৪'০০টায় ২২ নং বলরাম মজুমদার স্ট্রীটে পদার্পণ করেন ।"[১] ভবাপাগলা কলকাতা পৌঁছেই জমি কেনার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন । দাইহাট, কাটোয়া মুর্শিদাবাদ, ঘোলা প্রভৃতি স্থানে ভক্তদের পাঠিয়ে জায়গা দেখতে থাকেন । কিন্তু কোন স্থানই তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

পছন্দ হচ্ছিল না । অনেক জায়গা পরিভ্রমণ করে পাগল "স্থির নিবিষ্ট চিত্তে' কালনা,- বর্দ্ধমান বিনোদ বিহারী রায়ের, বাসায় এসে ওঠেন। "বিনোদ বিহারী রায় (বি,বি,রায়) যিনি পাগলের কলকাতা চলে আসার প্রস্তাব ও অনুরোধ জানিয়ে প্রথম চিঠি লিখেছিলেন — আমতা গ্রামে /, তিনিই এক বিঘা জমি দেখালেন পাগলকে কালনা শহরে । কালনা শহরের পুরানো হাসপাতাল পাড়ায় বিনোদ বিহারীর নিজের বাড়ী । সপরিবারে বাস করেন তিনি সেখানে । তাঁরই বাড়ীর অদূরে এবং গঙ্গা থেকেও দূরে নয় ঐ জমিখন্ড । বিনোদ বিহারী পাগলকে নিয়ে গেলেন জমি দেখাতে। জমিখন্ডের উপর পাগলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করলো দুটি গাছ, একটি বট গাছ আর একটি তাল গাছ । সাধারণ নয়, তাল-বট বিশেষ ভাবে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে এক ঠাই । একেবারে অঙ্গাঙ্গী । তালবটের ওই মিলিত রূপ দেখেই পাগলের পছন্দ হল জমিটি মায়ের মন্দির গড়বার জন্যে ।"[২]

শ্রীযতীন দাস (দমদম) জানান, "পাগল ১৩৫৭ সনের ৮ঠা ফাল্গুন শুক্রবার ২২ নং বলরাম মজুমদার স্ট্রীট থেকে মোটর যোগে সর্বসমেত কালনা উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন ।" শ্রীমতি বীণা চৌধুরী (শরৎ চৌধুরীর ২য় স্ত্রী বয়স ৪২,) আলাপ প্রসঙ্গে বলেন ,(৯ই অক্টোবর ,১৯৯০,মঙ্গলবার) পাগল তাঁর পরিবার সহ প্রায় এক বছর বি,বি, রায়ের বাড়ী ছিলেন এবং ভারত এসে প্রথম কালীপূজা (বৈশাখের শেষ শনিবার) ঐ গৃহে সম্পন্ন করেন। কালনায় ভবাপাগলার আগমন-স্মৃতি স্বরূপ এই রচনাটি পাগল মন্দিরের সদর দরজায় মর্মর খচিত করে রেখে যান :-

ঢাকা জেলার অন্তর্গত আছে আমতা গ্রাম ।
তথায় ছিলেন দেবী, "আনন্দময়ী" নাম॥

Dhaka University Institutional Repository

কি তাঁর মহান ইচ্ছা, কি তাঁর ভাবনা ।
নাচিয়া নাচিয়া শ্যামা এলেন কালনা ॥
আমি ভবা কিবা বুঝি সেবাপূজা তাঁর ।
রাঙা জবা দেই পায় পাতিয়া সংসার ॥

স্থানীয় লোকদের অভিজ্ঞতা থেকে প্রকাশ, জায়গাটি ছিল তখন "বনতুলসী" গাছে ভরপুর । বন জঙ্গল আবৃত এই স্থানটিতে আর এক কালের সাক্ষী হয়ে আজও আছে একটি তালগাছ ও একটি বটের চারা । কালনার তাল-বট যুগল নিয়ে পাগল লেখেন:-

তালই বটে জড়িয়ে ধরা, মিথ্যা কথা নয় ।
তাল ছাড়া যে বেতাল চলে, তারই শুধু ভয় ॥
তাল মত চলবে ভাই, কেহ কারো নয় ।
দু'দিন পরেই সব ফাঁকা ভবাপাগলা কয় ॥
সিদ্ধ গাব ছেড়ে এলাম, তাল বটের নীচে ।
ব্রহ্মময়ী নিত্য হেথা শিবের বুকে নাচে ॥

('সিদ্ধ গাব ছেড়ে এলাম' – বলতে পাগল আমতা মন্দিরের সিদ্ধ গাব গাছের কথা বলেছেন । বর্তমানে উক্ত গাব গাছদুয়ের একটি, এখনো জীবিত রয়েছে।) সেখানটি "তাল বট" যুগল বেদীমূলে প্রস্তর খোদিত হয়ে আছে ।

বনতুলসী, তাল বট বৃক্ষ ছায়া জমির মাঝখানে আর ছিল টালির ছোট ঘর । ভবাপাগলা নিতাই সাহার নিকট থেকে জমি ক্রয় করলেও, তার পূর্বে এ জমির মালিক ছিলেন বি,বি,রায় নিজে । ভবাপাগলার সঙ্গে বি,বি, রায়ের সম্পর্ক; নিতাই সাহা, বি,বি,রায়ের কাছ থেকে খরিদসূত্র; উপরন্তু ভবাপাগলা সম্পর্কে নিতাই সাহার সম্ভ্রমবোধ প্রভৃতি কারণে নিতাই সাহা পাগলকে জমি

Dhaka University Institutional Repository

দিতে রাজী হন । একবিঘা পরিমাণ এই জমির দাম নির্ধারিত হয় ১৭০৮/- টাকা । সম্পূর্ণ টাকাটাই পাগলকে দেন পাগলের এক পরম ভক্ত শ্রীদীনেশ ঘোষ। শ্রীসনৎকুমার চৌধুরী জানান, ১৩৫৭ সনের ৪ঠা ফাল্গুন জমিটি স্থানীয় আদালতে পাগলের নামে রেজিস্ট্রিকৃত হয় । এর প্রায় এক বছর পর (১৩ই মাঘ ১৩৫৮ সন, বুধবার) মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন পাগল । মন্দিরের নির্মাণ কাজ শেষ হলে পাগল আমতা থেকে সঙ্গে করে নিয়ে আসা বিগ্রহ মা আনন্দময়ীকে প্রতিষ্ঠিত করেন, (৩০শে আশ্বিন, ১৩৫৯ সন , বুধবার)।[৩] এবং নতুন নামকরণ করেন "মা ভবানী"। এ সময় পাগলের পাশে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে লালু ঠাকুর(লাহিড়ী), সিদ্ধি ঘোষ, ভোলা দত্ত, পবিত্র সরকার (স্থানীয় এডভোকেট) , অমর গোবিন্দ সাহা(ফটিক সাধু), তেজেন ব্রহ্মচারী, কালীসাহা, মুরারী চক্রবর্তী, নন্দ দাস, রমেন চক্রবর্তী, ও দ্বাদাতা শ্রীযতীন দাস অন্যতম ।

"ক্রমে ক্রমে মায়ের মন্দিরের সামনে নাটমন্দির, ভিতর বাড়ীর দ্বিতল ঘর, নীচে রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, প্রশস্ত দালান প্রভৃতি তৈরী হল । উঠলো চারপাশে পাকা পাঁচিল । ভক্তবৃন্দের জন্য আরও অনেকগুলি ঘর তৈরী করান পাগল । জল-কল-পায়খানা-স্নানাগার প্রভৃতিতে সুসম্পূর্ণ কালী বাড়ী ভবার ভবানী মন্দির ।"[৪]

তথ্য নির্দেশ

১। শ্রীযতীন দাস, বয়স ৭৫/৭৬, ৮৩, দমদম রোড, কলিকাতা, শেষ সাক্ষাৎ, ৩০শে আশ্বিন, ১৩৯৭ সন, ইং-১৭-১০-৯০ ।
২। শ্রীতমোনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরমগুরু ভবাপাগলা:২য়খন্ড, পৃ. ৪০
৩। তথ্য, শ্রীযতীন দাস, দমদম ।
৪। পরম গুরু ভবাপাগলা: ২য়খন্ড, পৃ. ৫১

-----০-----

Dhaka University Institutional Repository

ভবা পাগলার মহাপ্রয়াণ

পারিবারিক সূত্রে জানা যায় ভবাপাগলার শরীর - মৃত্যুর কয়েক বছর আগে একবার ভীষণ খারাপ হয়ে পড়েছিল । পাগলী মায়ের মৃত্যুর (৮ই ভাদ্র ১৩৮৭ সাল, সোমবার) পর পাগলের দেহ ও মনের একটা নাটকীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করে থাকেন - অনেকেই । পাগল যেন আগের মতো উৎসাহ- আনন্দ বহুলাংশে হারিয়ে ফেলেছেন ; হারিয়ে - গেছে তাঁর আগের মতো চলৎ- শক্তি টুকুও । খাওয়া দাওয়া কাজকর্মে প্রচন্ড অনীহার কথা বলেন অনেকেই । তাই বলে বিরক্ত প্রকাশ করেছেন এমনতরো শোনা যায়নি । জীবন চলার শুরু থেকে সমাপ্ত পর্যন্ত সর্বক্ষণ বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় - স্বজন, ভক্ত পরিজন দ্বারা পরিবৃত থেকেছেন পাগল । গান লেখা, সুরারোপ করে তা ভক্ত শিল্পীদের দিয়ে গেয়ে সকলকে শুনিয়ে আনন্দ বর্ধন করাই ছিল তাঁর সার্বক্ষণিক কাজ । কিন্তু এ কাজেরও একদিন পরিসমাপ্তি নেমে আসে ভবাপাগলার জীবনে ।

ভবাপাগলার মৃত্যু হয় ১২ই ফাল্গুন ১৩৯০ সন (ভোর ৫ টা ১২ মিঃ ব্রাহ্ম মুহূর্তে), ইংরেজী সন হিসেবে ২৬ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪ সন । মৃত্যুর পনর দিন আগে তিনি দীঘায় ভবার হরবোলা মন্দিরে মায়ের বাৎসরিক মহা- পূজা সম্পন্ন করে আসেন । ২৪ শে মাঘ বুধবার পাগল কালনা কালী বাড়ী অর্থাৎ ভবার ভবানী মন্দির থেকে দীঘার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন । সঙ্গে প্রিয় ভক্ত সদয় চাঁদ , সুকুমার, জলি ঘটক, ভোতা ভট্টাচার্য্য ও আরও অনেকে । (পাগল কখনোই একা একা পথ চলতেন না । যেখানেই যেতেন সদলবলে গমন করতেন ।) " পাগল চিরদিন যাত্রা কালে, খুব লক্ষ্য করলে দেখা গেছে , অতি চকিতে ভবানী মায়ের ডান হাত খানি একটু খানি স্পর্শ করে দ্রুত পদে দরজা পেরিয়ে বেড়িয়ে আসেন । আজও মায়ের হাত খান স্পর্শ করলেন । কিন্তু একটু ব্যতিক্রম যেন ,

Dhaka University Institutional Repository

আজ মুহূর্তেক দাঁড়ালেন তিনি।"[১] পাগল যে মনে মনে চির বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন তার প্রমাণ মিলে নিম্নোক্ত গানে :-

মা, সংসার রচনা করিতে করিতে
(তোমার) গান রচনা করিতে ভুলে গেলাম।
তলিয়ে গেলাম, ডুবে মলাম, একেবারেই সব হারালাম ॥[২]

গানটি পাগল কালনা মন্দিরে বসে ক'দিন আগে লিখে ছিলেন। দীঘার পূজা সেরে পাগল সোজা কলকাতায় শ্রী গোপাল মৈত্রীর বাসভবনে (ভবার মেঘালয়, ১/১ই/৭, রাণী হর্ষমুখী রোড) চলে আসেন।[৩] ৪ঠা ফাল্গুন, শুক্রবার পাগল মেঘালয় থেকে বাগবাজার ষোড়শী ভবনে যাবার আগে দমদম শহরে যতীন দাসের বাড়ী শেষ বারের মতো বেড়িয়ে নেন।[৪] যতীন দাস, ছিলেন পাগলের বহুপূর্ব পরিচিত এবং একজন পরম ভক্ত। আর ষোড়শী ভবনের (১৫-এ , আনন্দ চাটার্জী লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩) মালিক ছিলেন ঢাকা জেলার বালিয়াটী গ্রামের বিখ্যাত জমিদার রায় চৌধুরীরা। বংশ পরম্পরায় তাঁরা ছিলেন পাগলের অত্যন্ত কাছের মানুষ। পাগল কলকাতা এলেই এখানে আসা চাইই। এবং একবার ষোড়শী ভবনে গেলে আর শহরবাবুদের নাম নেই। পাগলের শরীর ভাল যাচ্ছে না দেখে অনেকেই ডাক্তার দেখানোর পরামর্শ দেন। " হোমিওপ্যাথ ডাঃ বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত এম,বি,এস ; হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ -ডাঃ তপন ব্যানার্জি , এম,বি,বি,এস(কলকাতা), এম, আর,সি,পি(ইউ,কে), ডাঃ ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য্য এম,ডি, এবং ডাঃ মহেশ মল্লিক"-[৫] পাগলকে দেখেও যান। কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শ মেনে চলা পাগলের কোন সময়ই সম্ভব হয়ে ওঠেনি।এবারেও পারলেন না। অনর্গল কথা বলা,উপদেশ দেয়া,গান শোনার জন্য সকলকে ধরে বসানো ইত্যাদিই নিত্য দিন ঘটতে লাগল।ক্রমেই ১২ই ফাল্গুন এগিয়ে এল। " রীতি মাফিক আজও ভবাপাগলার সাধনা সঙ্গীতের

Dhaka University Institutional Repository

সান্ধ্য আসর বসলো যোড়শী ভবনে । পাগল শুয়ে শুয়ে গান শুনলেন । ভক্ত শিষ্যবৃন্দ সম্মুখে উপবিষ্ট ।...... আগর পাড়ার সমুদে হার্মোনিয়াম নিয়ে বসে ছিলেন । পাগল তাকে একটি বিশেষ গান গেয়ে শোনাতে বললেন । সমুদে গাইলেন -

তোমায় আমায় ওগো , কত খেলাই হ'ল ।
(মা) তুমি রইবে অনন্তকাল, আমার বেলা ডুবে এলো ।।[৬]

প্রীতিমোনাশ বন্দ্যোপাধ্যায় আরও লেখেন, আজ সন্ধ্যা সাতটাতেই পাগল, কাছে বসা সদয়চাঁদকে বললেন, ' আজ সবাইকে বাড়ী যেতে বল, আমি বিশ্রাম করব ।'সদয়চাঁদ সবাইকে বলল: পাগল আপনাদের সবাইকে আজ বাড়ী যেতে বলছেন । তিনি বিশ্রাম করবেন । পাগলের পক্ষে এরকম আদেশ একেবারে ব্যতিক্রম । তবু তাঁর শরীরের অবস্থা ভেবে ভারাক্রান্ত মন নিয়েই ভক্তগণ একে একে চলে গেলেন । কিন্তু পাগলের শুতে রাত এগারটাই হয়ে গেল । রবি ঘটক, তোতা ভট্টাচার্য্য, সদয়চাঁদ ও সুকুমার মিস্ত্রী পালাক্রমে রাত জেগে পাগলের পাশে বসে থাকবেন, ওদের মধ্যে স্থির করা ছিল । ...... । রাত একটা চল্লিশ মিনিটের সময় পাগল চোখ মেলে চাইলেন । পূর্ণভাবেই জেগে উঠলেন "।[৭]

শ্রী সুকুমার মিস্ত্রী (চাকদা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ; ২০শে আশ্বিন ১৩১৭ বাং শনিবার) এক সাক্ষাৎকারে জানান , এর অল্পক্ষণ পরেই পাগলের দেহ যেন অবসন্ন হয়ে পড়ে । হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসে । চোখে-মুখে সে এক অস্বাভাবিক চাহনি। ভিড়ের মধ্যে একজন, ডাক্তার ডাকার কথা বলেন । সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ মল্লিককে নিয়ে আসা হয় । ডাক্তার এসে জানান নাড়ি নাকি পাওয়া যাচ্ছে না । রক্তের চাপ খুব ধীরে - - বইতে শুরু করেছে । অর্থাৎ আশা নেই । শেষ চেষ্টার জন্য কাছেই আর, জি, কর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । পাগলের তখন প্রচন্ড শ্বাস কষ্ট হচ্ছিল । হাসপাতালে এসে সবকিছু

Dhaka University Institutional Repository

ঠিক ঠিক প্রস্তুত ছিল সত্য কিন্তু পাগল কাউকেই যেন সে চিকিৎসার সময়টুকু দিলেন না। ভোর পাঁচটা বার মিনিটে পাগলের মহাপ্রয়াণ ঘটল। হাসপাতালের বেদী তখন লোকে লোকারণ্য। ভক্তরা অশ্রু বিসর্জন করে চলেছেন। মাত্র সাতচল্লিশ মিনিটের জন্য পাগল হাসপাতালে এসেছিলেন। (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, পরদিন সকাল ন'টায় ভবাপাগলার এই মৃত্যু সংবাদ আকাশবাণী থেকে প্রচার করা হয়।)

পাগলের মৃত্যুর পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বিষয়টি ছিল পূর্ব পরিকল্পিত। মৃত্যুর চৌদ্দ বছর পূর্বে ভবপাগলা তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া "সম্পন্ন করা" সম্পর্কে একটি নির্দেশ পত্র রচনা করে রেখে গিয়েছিলেন। রচনার পরদিন শ্রীতমোনাশ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আদেশে কপি করে রাখেনবলে আমাকে জানান, (ঝুলন পূর্ণিমা, ৬ই ভাদ্র ১৩৮৫ সন)। নির্দেশ-নামাটির অনুলিখন নিম্নরূপঃ-

"যে দিন আমাকে আমার মা চির বিদায় ভূষিত করবেন, আমার এই নশ্বর-দেহটিকে একদিনের জন্য মায়ের মন্দির নাট্যশালায় রাখিয়া দিয়ু কাঠের খাটিয়ায় লাল তোষকটি পাতিয়া একটি মাত্র নীল বালিশটী মাথায় দিয়া দিবা। দেহ হইতে প্রাণটি বাহির হইবা মাত্র নীল চাদরখানি গলায় দিও। যখন সমাধি মন্দিরে নামাইয়া দিবে, তাহার আগে বুকের উপর একটী বেলপাতা, তাহার উপরে একটী পঞ্চমুখী জবা দিবা। অন্য ফুল বা ফুলের মালা দিয়ু না। এমনকি আমার জীবন ভর যে গুচ্ছ মালা ব্যবহার করিতাম তাহা সযতনে মাতৃ মন্দিরে রাখিয়া দিবা। আর যে সমস্ত বেত দিয়া আমি অন্যায়ে প্রহার করিতাম তাহাও মাতৃমন্দিরে রাখিয়া দিবা। সঙ্গে দিবা নূতন বেত, আর দিবা একটী প্যাড ও কালী ভরা নূতন পেন, আর দিবা আতর-সেন্ট, নানা রকম সুগন্ধি কর্পূরাদি ধুনা বা দীপ, ধুপকাটি-জ্বালাবে না, সম্পূর্ণ নিষেধ। আর আমার জন্য কেহ কাঁদিবা না, হাসি মুখে বিদায় দিবা। আর একটি বিশেষ কথা আমিও কত অন্যায় করিয়াছি, সবাই নিজগুণে আমাকে ক্ষমা করিও।"[৮]

Dhaka University Institutional Repository

পাগলের মৃত্যুর পর শ্রীতমোনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, পাগলের শ্রদ্ধোচ্চারণ করতে গিয়ে লেখেন, "জগজ্জননী ভবানীর জাগ্রত বিগ্রহটি সঙ্গে নিয়ে ভবাপাগলা কালনা শহরে আগমন করেছিলেন — ১৩৫৭ বঙ্গাব্দের ৪ঠা ফাল্গুন শুক্রবার। ১৩৫৮ সনের অগ্রহায়ণ মাসে তিনি স্থাপন করেন কালনায় ভবার ভবানী মন্দিরের। সেই থেকে তেত্রিশ বছর ধরে এই কালনা কালী বাড়ীতে কত লীলা, কত গান, কত শিক্ষা-দীক্ষা, কত আদর-সমাদর, যত্ন, স্নেহ-ভালবাসা, কত মনোরঞ্জন, কত ম্রিয়মানের জীবনে নূতন উজ্জীবন, কত রোগ-শোক-সন্তাপ দূরীকরণের ঘটনা ঘটিয়েছেন তিনি। পাগলের সঙ্গ-সুখ লাভের আকর্ষণে দূর-দূরান্ত থেকে কত লোকের আগমন ঘটেছে; স্বয়ং পাগল কালনার বাজারে গেলে দোকানীদের কত আনন্দই না হয়েছে। সেই কালনাবাসীদিগকে শেষ দর্শন ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের সুযোগ দিবার উদ্দেশ্যে শ্রীপাগলের নশ্বর দেহ একটি লরিতে স্থাপন করে নামকীর্তনের সঙ্গে শোভাযাত্রা সহ কালনা শহরের পথ পরিক্রমা করা হ'ল (১২-২'২৫ইং)। তারপর কালী মন্দিরে প্রত্যাগমন করার পর আরও কতক ফটো তুললেন চারজন ফটোগ্রাফার। অতঃপর পুণ্য অন্ত্যেষ্টির জন্য প্রস্তুত হলাম। যে সমাধি মন্দির তিনি নিজেই নির্মাণ করিয়ে রেখে গেছেন সেই দিকে সকলে মিলে তাঁর পবিত্র দেহ নিয়ে অগ্রসর হলাম। গঙ্গা জল ছিটিয়ে শয্যা রচনা করা হ'ল। সেই শয্যায় মা ভবানী মন্দিরের দিকে শিয়র রেখে অগণিত মানুষের পরম গুরু ভবাপাগলার পুণ্য নশ্বর দেহ লাল বস্ত্র নীল চাদরে ঢেকে অন্তিম বিশ্রামে শায়িত করলাম তাঁরই পূর্ব নির্দেশ যথাসাধ্য পালন করে (অপরাহ্ন ৪ ঘটিকা ১৫ মিঃ)।

Dhaka University Institutional Repository

শয্যা পার্শ্বে নূতন বেড, লিখবার প্যাড, কালিভরা নূতন কলম, আতর সেন্ট কর্পূরাদি পঞ্চ প্রকার সাজিয়ে দেয়া হল । সেবক সেবিকাদের ইচ্ছাক্রমে আরও সাজিয়ে দেওয়া হল স্টিলের থালাবাটি গ্লাসে পাগলের এক কালে প্রিয় অন্ন ব্যঞ্জনের ভোগ । আর দেওয়া হল একটি কালো রুমাল, একটি খেলনা বন্দুক ও পিস্তল, যা নিয়ে তিনি শিশু সুলভ আনন্দ করতেন এবং একটি করে লোহার ছেনি ও হাতুড়ি । শয়নের পর সঙ্গে সঙ্গেই রাজমিস্ত্রীগণ তাদের কাজ আরম্ভ করলেন ।"[৯]

পাগলের জীবনের এরূপ পূর্ব পরিকল্পনাকে কেউ কেউ অদ্ভুত ভাবতে পারেন । তিনি জীবনকে আনন্দের উৎস হিসাবে দেখেছেন। তার প্রমাণ তাঁর গানে আছে --

এ জনম তো গেল আমার আনন্দ করিতে করিতে,
আবার গাহিব গান এহেন পৃথিবীতে ।[১০]

এপার বাংলাদেশেও পাগল নিজ গ্রামে "মা আনন্দময়ীর মন্দির" পাশে অনুরূপ একটি পরিকল্পিত সমাধি তৈরী করে রেখে গেছেন । যা কালের স্বাক্ষী হয়ে আজও আমতায় বর্তমান রয়েছে । ঠিক পূর্ব পার্শ্বে মন্দির ঘেঁষা মাটির উপর প্রস্তর নির্মিত এ সমাধিটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা । যেন একজন লোক নির্দ্বিধায় সমাধির ভিতর শয্যা রচনা করতে পারেন - এমনই তোরণের মতো করা সুরঙ্গ পথটি । উত্তর দিকটা আগলা করে ঘেরা । আর রয়েছে সমাধির উপর দন্ডায়মান মহাদেবের ছোট্ট একটি বিগ্রহ । কালনায় পাগলের স্থাপিত সমাধিটি দেখে আমার মনে যে প্রতীতি জন্মে, তাতে কালনা যেন আমতা মন্দিরেরই বৃহত্তর সংস্করণ । পাগল সময় করে উঠতে পারেননি বলে বাকী প্রাক্কলন তিনি কালনা ভবানী মন্দির স্থাপন করে সবাইকে দেখিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

গেছেন । ভবাপাগলার সমাধি-সৌধ তাঁর পরিকল্পনার স্মৃতি অংশ কিনা তা বোঝা যায় তাঁর সমাধিগাত্রে মর্মর প্রস্তর খচিত ফলকটির লেখা পাঠ করলে । পাগল তাঁর সমাধিগাত্রে যে বাণীসমূহ খোদাই করে যান তা নানা কারণে উল্লেখযোগ্য । পাগলের সমাধি গাত্রফলকের লেখাটি এইরূপঃ-

[৩৮]বিশ্বের কেউ ছিল না আপন ।
যে জনা আপন,, সে মোরে করেছে গোপন ।।
তাই মহানন্দে পাড়ি ঘুম,, অভয়ার কোলে।
স্বপন দেখিনা আর,, সোট গেছে চলে ।।
তুচ্ছ ঘুম নহে ,, ওরে,, মহাযোগ এর নাম ।
আপনি শিব ছাড়ে কাশী,, পাইয়া এমন ধাম।।
এমন নিঝুম শ্মশানে,, আমার বসতি ।
খুঁজিয়া কে পাবে বল,, কাহার শকতি ।।
শক্তি লুকায় তাঁর আদরের ছেলে ।
ভবাকয়,, ডাক কালী, ছুঁবে না রে কালে ।।
শিব ছাড়ে শিব লোক,, ইন্দ্র ছাড়ে স্বর্গ।।
ব্রহ্মা ছাড়ে ব্রহ্মলোক ,, দিতে এথায় অর্ঘ্য ।।
নারায়ণ আসে হেথা,, নারায়ণী সনে ।
হেরিতে আনন্দময়ী,, আনন্দ এখানে ।।
শ্মশান ইহার নাম,, সমাধি শ্মশান।
ধনী,মানী, জ্ঞানী, মুর্খ এখানে সমান ।।
মরিবার আগে ভবা লিখিয়া যে গেল।
জয়কালী, জয়কালী বদনেতে বল ।।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১। পরম গুরু ভবাপাগলা, (২য় খণ্ড), পৃ. ২০৯

২। ঐ , পৃ. ২০৯

৩। তথ্য, শ্রীগোপাল মৈত্রী, ১/১ই/৭, রাণী হর্ষমুখী রোড, কলিকাতা - ৭০০০০২

৪। তথ্য, শ্রীযতীন দাস, কলিকাতা ।

৫। পরম গুরু ভবাপাগলা, ২য় খন্ড, পৃ. ২১১

৬। ঐ , পৃ. ২১২

৭। ঐ , পৃ. ২১৩

৮। শ্রীতমোনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত ডায়েরী ।
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ যে, ভবাপাগলার উক্ত রচনার মূল কপিটি আমি কালনা মন্দিরে গিয়ে খুঁজে পাইনি । পাগল পুত্র শ্রীসনৎকুমার চৌধুরীও আমাকে এ বিষয়ে কোন তথ্য দিতে পারেননি ।

৯। নিবন্ধ । শ্রীতমোনাশ বন্দ্যোপাধ্যায় । প্রকাশ - "ভবাভবা" পত্রিকা। প্রকাশকঃ- সদয় চাঁদ চৌধুরী । মার্চ-এপ্রিল, ১৯৮৪

১০। ভবার রচিত গানঃ-

মা আমাকে নতুন করে সাজাবে আবার ।
মৃত্যু শেষে পুনর্জন্ম,, মাতৃনাম করিতে প্রচার ।।

এ জনম তো গেল আমার আনন্দ করিতে করিতে।
আবার গাহিব গান,, এ হেন পৃথিবীতে ।।

জানিবে জনগণ, জাগিবে মানব মন ।
জগন্মাতা, বিশ্বমাতা,, যুগ যুগ অবতার ।।

Dhaka University Institutional Repository

ভবার ভাগ্য কত,, ভাবিতে আনন্দ হয়,,
নাই এ হৃদয় কূলে,, হিংসাগন্ধ সমুদয় ।।

হাসির ছন্দ গন্ধে,, মোহিত ভক্তবৃন্দে,,
আলোতে চাঁদমা হাসে ,, নাশিতে ঐ অন্ধকার ।।

এ জনমে নামখ্যাত, বিখ্যাত এ ভবাপাগলা ,,
পর জনমে পুত্র হব,, পিতা মোর কিশোরী লালা ।।
যোধপুরে, উদয়পুরে,, দেশে দেশে, ঘরে ঘরে ,,
মাইকো বেটা,, সাচ্চা আবিশ্কার এ অম্বিকার ।।

৩৮

-----০------

Dhaka University Institutional Repository

ভবাপাগলা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মন্দির সমূহ

ভবাপাগলা তাঁর জীবদ্দশায় বেশ কতকগুলি কালীমন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। এ গুলির মধ্যে বাংলাদেশের আমতা গ্রামে "মা আনন্দময়ীর মন্দির" এবং কালনা,(বর্দ্ধমান) "মা ভবানী মন্দির" প্রধান।

অপ্রধান মন্দিরগুলির মধ্যে (১) ভবার শ্যামা মন্দির, নাটাগড়, উত্তর ২৪ পরগণা; (২) ভবার ঐশ্বর্য্য প্রদায়িনী মন্দির, মাজদিয়া, নদীয়া; (৩) ভবার মহাতীর্থ বাবুর, কান্দি, মুর্শিদাবাদ; (৪) কৃষ্ণ ভাণ্ড প্রদায়িনী মন্দির, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ; (৫) ভবার পূর্ণানন্দ আশ্রম, বাপুজীনগর, বাদকুল্লা, নদীয়া; (৬) ভবার সাগর পারের হরবোলা, দাঁহা, বর্দ্ধমান; এবং (৭) ভবার মহাশান্তি আশ্রম, সুখচর বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

"মা আনন্দময়ীর মন্দির"

শ্রীশিবৎকুমার চৌধুরী তাঁর পিতার কার্যাবলী সম্পর্কে তথ্য প্রদান করতে গিয়ে বলেন, ভবাপাগলা শিশু বয়স থেকেই পূজা পার্বনের প্রতি আকৃষ্ট হন। পাগলের সাত বছর বয়সকালীন মাতৃপূজায় বলিদানের উপকরণ,(যেমন,ক্ষুদ্রাকৃতি খড়গ, হাড়িকাঠ, পূজার নৈবেদ্য সাজানোর পাত্র প্রভৃতি) সযত্নে রক্ষিত অবস্থা থেকে বেরকরে দেখিয়ে বলেন, তিনি নিজ হাতে মাটির প্রতিমা গড়ে, মাটির সন্দেশ বানিয়ে মাকে পূজা করতেন। দৈবক্রমে সে সব সন্দেশ ছানার সন্দেশ হয়ে যেত। এইরূপ তথ্য প্রমাণের জন্য ভবাপাগলার একটি লেখা, আমতা মন্দিরের গাবগাছ তলায় প্রস্তরখচিত অবস্থায় এখনও রয়েছে।

গাবের তলায়,, কত খেলায়,, দিন হত তার গত।
নিশা কালে,, দিশা হারায়* শ্যামা পূজায় রত ॥

---

* অজ্ঞান হওয়া বা সুতাবিকৃত নষ্ট হওয়া।

Dhaka University Institutional Repository

ছেলে বেলায়,, মাটির সন্দেশ,, মা* টিকে সে দিত ।
ছানা ভাবে ভাবময়ী,, করিত ছানায় পরিণত ॥

—ভবাপাগলা

ছোট ছোট বন্ধু-বান্ধব নিয়ে পুতুল খেলার ছলে শ্যামা পূজায় ভবাপাগলা আত্ম নিবেদন করতেন । কিশোর বয়সেই ভবা পাগলা "মাতৃসাধক ভবাপাগলা" হিসেবে সকলের নিকট সমাদৃত হন । এ সময় তিনি বাড়ীর সম্মুখে কালীমন্দির নির্মাণ করে দেয়ার জন্য বড় ভাই গিরীন্দ্রকে খুব করে ধরেন । ছোট ভাইয়ের আবদার উপেক্ষা করতে না পেরে , শেষ পর্যন্ত গিরীন্দ্রমোহন ভবেন্দ্রকে(ভবাপাগলা) মাতৃমন্দির নির্মাণ করে দেন । ভবাপাগলা তার নামকরণ করেন "মা আনন্দময়ীর মন্দির" ।

আমরা মন্দিরের ফলক থেকে জানা যায়, ভবাপাগলা ১৩২২ সনের ২৫শে বৈশাখ শনিবার প্রথম সেখানে কালীপূজা করেন । পরে ভগ্নপুরর গঙ্গাচরণ সাহা, ভবাপাগলার মনোবাসনা পূর্ণকরার জন্য কলকাতা থেকে প্রস্তর নির্মিত বিগ্রহ এনে দিলে ১৩৪৪ সনের ২৫শে বৈশাখ শনিবার ভবাপাগলা সেখানে মাতৃবিগ্রহটি পুনর্স্থাপন করেন ।[১]

১৭ফুট ৪ইঞ্চি দৈর্ঘ্য এবং ৭ফুট ৩ইঞ্চি প্রস্থ এই মাতৃমন্দিরটি এমন পরিমাপে দরজা দিয়ে ঘেরা যেন মাথা নীচু না করা ছাড়া কারো প্রবেশের সাধ্য নেই । মন্দিরটির সামনে রয়েছে একটি ছোট নাট-মন্দির, পূর্বপাশ ঘেঁষা ভবাপাগলার জন্য তৈরী প্রস্তর নির্মিত সুরঙ্গাকৃতি সমাধি । পশ্চিম পাশে মা গয়াসুন্দরী দেবীর সমাধি (৬'৬"x২'১১"), আর সাধন পীঠ(১০'৯"x৮'৬")। মন্দিরের পিছনে কালের সাক্ষ্য প্রদানের জন্য এখনো সিদ্ধ গাব গাছটি তার বেদীর মূলে দাঁড়িয়ে রয়েছে ।

---

* কালী মূর্তিকে ।

Dhaka University Institutional Repository

"কালনা -মা ভবানী মন্দির"

কালনা, বর্দ্ধমান-ভবার 'মা ভবানী মন্দির' সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। ভারত পৌঁছে ভবাপাগলা, কালনা মন্দিরের ভিত্তি স্থাপনের (১৩ই মাঘ, ১৩৫৮ সন, শুক্রবার) আগে, ঐ সনের বৈশাখের শেষ শনিবার, ভবাপাগলা তাঁর মা আনন্দময়ীর বিগ্রহপূজা বিনোদবিহারী রায় মহাশয়ের বাস-ভবনে(উত্তর বাড়ী নামে খ্যাত) সম্পন্ন করেন।[২] অতঃপর মন্দিরের নির্মাণ কাজ শেষ হলে, ৩০শে আশ্বিন, ১৩৫৯ সন, শুক্রবার - ভবাপাগলা মা আনন্দময়ীকে কালনা মন্দিরে স্থাপন করেন এবং নতুন নামকরণ করেন — "মা ভবানী"।

উপরের দু'টি মন্দির ছাড়া তিনি ভক্তদের এবং শিষ্যদের অনুরোধে আরও কয়েকটি মাতৃমন্দির স্থাপন করেন। সেগুলির নাম, ধাম দিয়ে দেওয়া হল:-

১। ভবার শ্যামা মন্দির:

সোদপুর রেল ষ্টেশনে নেমে কলকাতাগামী বাঁদিকে অটোরিক্সার বেশ খানিকটা পথ-নাটাগড় (কদমতলা), সোদপুর, ২৪ পরগণা--'ভবার শ্যামা মন্দির'। 'ভবার শ্যামা' কথাটাকে আমরা এখানে দু'অর্থে ব্যাখ্যা করতে পারি। এক, ভবাপাগলা তাঁর শ্যামা-মাকে উক্ত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন— তাই শ্যামা মন্দির। দুই, ভবাপাগলা তাঁর প্রিয় শিষ্য শ্যামাপদ সাহার বাস ভবনে এ মন্দির, শ্যামাপদ সাহার ইচ্ছায় ও অর্থানুকূল্যে মা'কে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। গত ২৩শে ফাল্গুন ১৩৯৭ সাল (১০-১০-৯০ইং) স্বর্গীয় শ্যামাপদ সাহার স্ত্রী, শ্রীমতি সুরবালা[১৩] সাহা এক সৌজন্য সাক্ষাৎকারে বলেন, শ্যামাপদ সাহার জন্ম এবং পূর্ব নিবাস বাংলাদেশের মানিকগঞ্জ জেলা শহরের উপকণ্ঠে হিজুলিয়া গ্রামে। চল্লিশের দশকে ব্যবসার কারণে কলকাতায় চলে যান এবং

Dhaka University Institutional Repository

সোদপুরে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন। ভবাপাগলার সঙ্গে শ্যামাপদ সাহার পরিচয় বাংলাদেশে থাকাকালীন সময়ের। পাগল ভারত চলে গেলে পুনরায় তাঁদের মধ্যে যোগাযোগ সূচিত হয়। শ্রীমতি সুরঞ্জনী সাহা ভবাপাগলার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে জানান, প্রায় ২২/২৩ বৎসর পূর্বে ভবাপাগলা শ্যামামন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠার আগে সেখানে রাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ পূজা করা হোত। ভবাপাগলার ইচ্ছাক্রমে মন্দিরের ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি ও সংস্কার সাধন করা হয়। শ্রীতমোনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত, ভবাপাগলা ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে আগস্ট, ২৪ পরগণার নাটাগড়ে (সোদপুর) শ্রীশ্যামাপদ সাহার গৃহে ভবার শ্যামামন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন।[৩] কিন্তু মন্দিরের কোথাও এ ধরণের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। মন্দিরের পাশেই 'সিদ্ধ গাবের তরু'। ভবাপাগলা কালনা মন্দিরে বসে উক্ত গাব-বৃক্ষ সম্পর্কে লেখেন, --

সাধন করিত ভবা-গাবু গাছ তলে।
চলে এলো কদমতলা,,* হেলে আর দুলে ॥
ঢাকা জেলার অন্তর্গত,, আছে আমতা গ্রাম।
জন্মভিটে,, সেথায় ভবা,, কলি কালী নাম ॥
সেই গাবের বংশধর,, এই বৃক্ষটি।
শরণ** করিয়া দেয় - চরণ দু'টি ॥
প্রণাম,, করিও সবে দু'টি বেলা।
অবহেলা,, করিও না - কহে ভবাপাগলা ॥

— ভবাপাগলা
কালনা (বর্দ্ধমান)
১৩৮৩সন, ২১শা আষাঢ়
শনিবার সকাল ৫-৩০মিনিট।

---

* কদমতলা=নাটাগড়, কদমতলা।
** আশ্রয় অর্থে।

Dhaka University Institutional Repository

শ্যামাপদ সাহা, ভবাপাগলার বিশ্রামের জন্য বেশ বড় করে পাকা বিশ্রামাগার তৈরী করে দেন। ভবাপাগলা কদমতলা এলে, সেখানে ভক্তদের নিয়ে গান বাজনায় অনন্দমুখর করে রাখতেন। এই জন্য তার নামকরণ করেন - 'ভবার অনন্দ নগরী'।

২। ভবার ঐশ্বর্য্য প্রদায়নী মন্দির, মাজদিয়া, নদীয়া:

ভবাপাগলা কালনা আগমনের পর পরই ভক্তদের ডাকে নদীয়া যান। এ সময় মাজদিয়ার সূর্য্যকান্ত মিস্ত্রীর স্ত্রী, ধনুষ্টংকার রোগে মৃত্যুর পথযাত্রী। বাঁচার কোন আশা নেই। সূর্য্যকান্ত মিস্ত্রী ইতিপূর্বে ভবাপাগলার নাম শুনেছেন এবং এও জেনেছেন, ভবাপাগলা মাজদিয়াতেই রয়েছেন। তিনি ভবাপাগলাকে সমস্ত বিষয় অবগত করালে পাগলা নিজ পাশে থেকে সূর্য্যকান্ত মিস্ত্রীর স্ত্রীকে ভাল করে তোলেন। সূর্য্যকান্ত মিস্ত্রীর পুত্র শ্রীশিকুমার মিস্ত্রী,[৪] জানান, ভবাপাগলার অনুমতি নিয়েই সূর্য্যকান্ত মিস্ত্রী মন্দির তৈরী করেন এবং ভবাপাগলা তার নামকরণ করেন, 'ভবার ঐশ্বর্য্য প্রদায়নী মন্দির'। মন্দির প্রতিষ্ঠার তারিখ জানতে চাওয়া হলে তিনি তা স্মরণ করতে পারেননি।

৩। ভবার মহাতীর্থ বাতুর, কান্দি, মুর্শিদাবাদ:

ভবাপাগলার নিজ হাতে প্রতিষ্ঠিত, যতগুলি মন্দিরের কথা আমরা জানি বাতুরের মন্দিরটি তন্মধ্যে অন্যতম। ভবার অন্তরঙ্গ সাধনসঙ্গী, যাঁকে পাগল দেশ ত্যাগের পরও সঙ্গছাড়া করেননি - সেই তেজেন ব্রহ্মচারীর ইচ্ছায় ভবাপাগলা এই মন্দির স্থাপন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

ভবাপাগলা, বাতুরের মন্দির স্থাপনের আগে বোয়ালিয়ান (বাতুরের নিকটবর্তী) গ্রামে ভক্ত ও শিষ্য শ্রীগণেশ দারোগার বাসায় যান কালীপূজায় যোগ দিতে। (১৩৭১ সন, ভাদ্র মাসের শেষ শনিবার)। তেজেন ব্রহ্মচারী তখন শ্মশানে সন্ন্যাস গ্রহণ করে স্বামী সত্যানন্দ গিরি নামে গিরি সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েছেন। শ্মশানটি, বাতুর সিদ্ধেশ্বরী তলা নামে খ্যাত। চারিদিক ধু-ধু-মাঠ, প্রান্তর। পাশেই প্রবাহিত নদী। স্থানটি দেখে ভবাপাগলার ভীষণ পছন্দ হয়। তিনি তেজেন ব্রহ্মচারীকে নির্দেশ দেন জমি ক্রয়ের জন্য। তিনি দ্রুত জমি কিনে ফেলেন। রেজিষ্ট্রিতে নাম দেন ধর্মপিতা ভবাপাগলা।"[৫] শ্রীসনৎকুমার চৌধুরীর মতে, ১৩৮৩ সনের অগ্রহায়ণ মাসের পঁচিশ তারিখ শনিবার ভবাপাগলা বাতুর মহাতীর্থে প্রথম পূজা সম্পন্ন করেন।

পরে ভবাপাগলা, তাঁর গানে বাতুর মন্দির স্থাপনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ ব্যাখ্যা করেনঃ-

চল যাই এবার মহাতীর্থে।*
জাতের বালাই,, নাইকো কারো,,
(যেমন) প্রভু জগন্নাথ শ্রীক্ষেত্রে॥

সবার মুখে মিষ্টি হাসি,,
নাইকো দেখা রেষারেষি।
কিবা দেশী,, কি-বিদেশী,,
মেলামিশি, সব সমভাব,, রয় একত্রে॥

---

* মহাতীর্থ, বাতুর।

Dhaka University Institutional Repository

মুক্ত আকাশ ,, পূর্ণ মাঠে,,
রক্ত সূর্য্য নামে, ওঠে ।
ট্রিক ধুনা (ঐ) পবন ছোটে,,
ধুলট লুটায় সবার গাত্রে ।।

নগ্ন দেহের চাষীর দল,,
রাখে সাহস,, ভক্তি বল ।
দেখলে জনম হয় রে সফল,,
ভরে যায় জল দু'টী নেত্রে ।।

ভবার ভাষ্য ভবিষ্যতে,,
রটিবে এই পৃথিবীতে ।
প্রমাণ হবে হাতে হাতে,,
দেখবে সবাই পুঁথিপত্রে ।।[৬]

৪। কৃষ্ণ ভক্তি প্রদায়িনী মন্দির,লালগোলা,মুর্শিদাবাদঃ

ভক্ত নারায়ণ সরকারের ইচ্ছায় ভবাপাগ্‌লা এই মন্দির তাঁর বাসগৃহে স্থাপন করেন । ভবাপাগ্‌লা মুর্শিদাবাদ এলেই লালগোলায় নেমে ভক্ত নারায়ণ সরকারের বাড়ী দু'চারদিন কাটিয়ে যেতেন । অনেক ভক্ত সমাগম ঘটতো সেখানে । মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল জানা যায়নি ।

৫। ভবার পূর্ণানন্দ আশ্রম, বাপুজীনগর, বাদকুল্লা, নদীয়াঃ

নদীয়া জেলার এক পল্লীগ্রাম বাপুজীনগর। তবে নিকটেই বাদকুল্লা রেল ষ্টেশন। হাসখালি থানাধীন চূর্ণী নদীর পারে ভবাপাগলা এ মন্দিরটি স্থাপন করেন। মন্দিরের সেবাকর্মের জন্য ভবাপাগলা ইতিপূর্বে স্বামী বিজয়ানন্দ গিরিকে নির্বাচিত করে রেখেছিলেন। স্বামী বিজয়ানন্দ গিরির পূর্ব পরিচয় শ্রীবিভূতিভূষণ রায়। পূর্ব নিবাস ছিল বাংলাদেশের মানিকগঞ্জ জেলায়। দেশ বিভাগের পর ভবাপাগলা ভারতের পশ্চিম বঙ্গে চলে গেলে ১৯৬৩-৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তেজেন ব্রহ্মচারীর মাধ্যমে ভবাপাগলার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। অতঃপর ভবাপাগলা বিভূতিভূষণকে ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। 'পূর্ণানন্দ আশ্রম' সম্পর্কে শ্রীতমোনাশ বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, "১৩৮৭ সনের শেষের দিকে ভবাপাগলা কালনায় দু'খান বড় শ্রীশ্রীমহাচণ্ডী কালীর একটি প্রতিমা গড়ালেন মায়াপুরের শিল্পী শ্রীমৃত্যুঞ্জয় পালকে দিয়ে। পাগল প্রতিমাখানি বগুলার শ্রীমৃণাল কান্তি ঘোষকে দিয়ে মেটাডোর যোগে পাঠিয়ে দিলেন বাপুজীনগরে বিভূতিভূষণের কাছে। ঐ বছরেই, চৈত্র মাসের শেষ শনিবার, (১৩৮৭ সাল), স্বয়ং পাগল বাপুজীনগরে শ্রীশ্রীমহাচণ্ডী কালী বিগ্রহখানি প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি আশ্রমের নামকরণ করলেন 'পূর্ণানন্দ আশ্রম'।"[৭] শ্রীসুকুমার মিস্ত্রী আমাকে জানান, ভবাপাগলা বাপুজীনগরে আশ্রম স্থাপনের কথা তার মাধ্যমে বিভূতিভূষণকে বলে পাঠান। বিভূতিভূষণ ইতিপূর্বে বাতুর আশ্রম থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করে 'গিরি সম্প্রদায়' ভুক্ত হয়েছিলেন। বিজয়ানন্দের কাছে গ্রামবাসী, ভবাপাগলা কর্তৃক মন্দির প্রতিষ্ঠার ইচ্ছার কথা শুনে উৎসাহ বোধ করেন এবং মন্দির তৈরীর প্রাথমিক কাজ, যেমন, জমিদান ও ঘর তৈরী প্রভৃতি তারাই সম্মিলিতভাবে সম্পন্ন করে। শোনা যায় চূর্ণী নদীর তীরে মন্দির নির্মাণের জন্য আট কাঠা জমি গ্রামেরই একজন অবস্থা সম্পন্ন ভক্ত শ্রীহরিপদ সিকদার দান করেন।

Dhaka University Institutional Repository

৬। ভবার সাগর পারের হরবোলা মন্দির, দীঘা, বর্দ্ধমান:

ভবাপাগলার গান ও বাণীর অন্যতম প্রচারক, "ভবামৃত" পত্রিকার সম্পাদক ও ভারতের বিখ্যাত 'ক্ষেত্রীর গোলাপ জল' এর মালিক শ্রীগোপাল ক্ষেত্রীর ইচ্ছায়, আগ্রহে ও অর্থানুকুল্যে ভবাপাগলা দীঘার সাগর পারে এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশে এই মন্দিরটি স্থাপন করেন। প্রথমে সাত কাঠা জমির উপর এই মন্দিরের নির্মাণ কাজ শুরু হলেও, পরে ভবাপাগলার আশীর্বাদে[৮] আরও সাত কাঠা জমি এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়। ১৯৭৯ সনের ২৬শে মার্চ শ্রীগোপাল ক্ষেত্রী তাঁর ও স্ত্রী মণিকা ক্ষেত্রীর নামে এ জমি ক্রয় করেন বলে জানান। তিনি মন্দিরের স্থাপত্য নক্সা দেখিয়ে বলেন, মন্দিরটি পুরোপুরি ভবাপাগলার করে দেয়া নক্সা অনুসারে নির্মিত হয়েছে। ১৩৮৬ সনের মাঘ মাসের শেষ শনিবার ভবাপাগলা হরবোলা মন্দিরের পূজা সম্পন্ন করেন। পূজার আমন্ত্রণ পত্রে সবাইকে উদ্দেশ্য করে ভবাপাগলা লেখেন,—

হরবোলা মায়ের আবাহন --
তোমরা সবাই মাঘমাসের শেষ শনিবার -
আমার মহাপূজায় প্রতি বৎসর আসিও
আমি — আনন্দ পাবো
তোমাদের সবাইকে আমার
কাছে পাইয়া ॥
আশীর্বাদক
ভবাপাগলা।

দীঘার হরবোলা মন্দিরের কর্মপদ্ধতি ও কর্মসূচী বর্ণনা করে প্রীতিমোনাশ বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন,--

Dhaka University Institutional Repository

"....... ভক্তগণ মায়ের নিত্যপূজা এবং বাৎসরিক মহাপূজা ও মহাসম্মেলনের বড় আয়োজন করা ছাড়াও মায়ের মানব সেবার অনেকগুলি কার্যক্রম ইতোমধ্যেই গ্রহণ করেছেন । .... । তাঁদের সেবামূলক কার্যক্রম সমূহের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য দরিদ্র সাধারণের মধ্যে বাৎসরিক বস্ত্র বিতরণ, বন্যাত্রাণে শিবির, দাতব্য চিকিৎসালয়, গরীব শিশুদের নিত্য দুধ-রুটি বিতরণ, অনাথ আশ্রম, সাগরস্নানের সময় জলসত্র স্থাপন, হাসপাতালে রোগীদের ফল বিতরণ, রক্তদান শিবির, দুঃস্থদের সাহায্য দান প্রভৃতি।"[৯]

ভবাপাগলা, দীঘার মন্দির দর্শনার্থীদের উদ্দেশ্যে লেখে রেখে যান,--

মা আমার সাগর পারের হরবোলা ।
জাতিভেদ নাইকো হেথা, মায়ের আমার এইতো খেলা ।।

অগাধ সমুদ্র যেমন,,
মায়ের আমার স্নেহ তেমন ।
ভবাপাগলার তাইতো লিখন,, শুন যত কুলবালা ।।

দীঘায় বেড়াতে এসে,,
একটু ফাঁকে,, দেখো বসে ।
মায়ের আমার মোহন বেশে,, শিবহৃদে খাচ্ছে দোলা।।

ভবাপাগলার চার মুরতি,,
ক্ষিতি, অপ, তেজ, পরম জ্যোতি ।
ব্যোম ভোলানাথ পদেনতি,, গলে নাই যার মুন্ডমালা।।[১০]

Dhaka University Institutional Repository

বলা যায়, ভবাপাগলা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত যতগুলি মন্দির এপার বাংলাদেশে ও ভারতে রয়েছে, তন্মধ্যে দীঘার হরবোলা মন্দির, ভবাপাগলাকে বিশ্বজনের কাছে অধিক পরিচিতি দান করেছে ।

৭। ভবার মহাশক্তি আশ্রয় ভবদারা মন্দির, সুখচর:

খরদা রেল স্টেশনে নেমে প্রায় দুই কিলোমিটার পথ 'সুখচর' 'ভবার মহাশক্তি আশ্রয় ভবদারা' মন্দির । মন্দিরের সম্মুখে দেবতাকে প্রণাম করে ভক্তরা যে কথা কয়টি পাঠকরে থাকেন - তা এই,--

"ভবার মহাশক্তি আশ্রয়"

ভবার ভক্তমন্ডলীদের আগ্রহে ভবা

পাগলার প্রতিষ্ঠিত --"ভবার ভবদারা"

সুখচর,২৪ পরগণা

বুধবার ৮ই চৈত্র

১৩৮৯ সন।

অর্থাৎ ভবাপাগলা তাঁর ভক্তমন্ডলীর অনুরোধে গঙ্গার কিনারে এই মন্দির স্থাপন করেন ।

'ভবার মহাশক্তি আশ্রয় ভবদারা' স্থাপনে যাঁর আগ্রহ ছিল সর্বজন অগ্রগণ্য—ভবাপাগলা সেই সদয়চাঁদ চৌধুরীকেই উক্ত মন্দির পরিচালনার ভার প্রদান করেন । মন্দিরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকটি খোলা । পশ্চিম পাশে একতলা বিশিষ্ট দাতব্য চিকিৎসালয় ও ভক্তদের থাকার ঘর । পূজার ভোগের ঘরটি মন্দির সংলগ্ন পশ্চিম-উত্তর দিকে অবস্থিত । মন্দিরের

Dhaka University Institutional Repository

দক্ষিণ ভাগে, অদূরে - দুটি গাবের চারা ভবাপাগলা রোপন করে দিয়ে যান ।

এ-সব মন্দির ছাড়াও ভবাপাগলা যে সমস্ত স্থানে, যথা ব্যারাকপুর , পানিহাটি, খরদা, মানিকতলা, কলকাতা, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, বিহার , পুরী, উড়িষ্যা, কালিয়াগঞ্জ প্রভৃতি জায়গায় গিয়েছেন, সে সব স্থানে ভক্তরা বা শিষ্যরা ভবাপাগলার আগমন, গমন, জন্ম - গ্রহণ -তিরোধান তিথিতে পাগলের বিগ্রহ মন্দিরে পূজা দিয়ে থাকেন ।

তথ্য-নির্দেশ

১. আমতা কালী-মন্দিরের সম্মুখের ফলক:-

জয় মা আনন্দময়ী কালী-মায়ের বাণী
বৈশাখের শেষ শনিবার মায়ের পূজা তোমরা আসিও ।

ভবাপাগলার আকিঞ্চনে,
ভক্ত প্রবর গঙ্গার প্রাণে,
শ্যামা মা অতি সঙ্গোপনে,
প্রভুর মূর্তীর বিধানে
ভাস্কর রেণু পদের তৈরী
আমাদের মা পরমেশ্বরী।

স্থাপিত:-
২৫শে বৈশাখ শনিবার ১৩২২ সন,
নব প্রতিষ্ঠিত প্রভুর মূর্ত্তী
২৫শে বৈশাখ শনিবার ১৩৪৪ সন,
গ্রাম আমতা (ঢাকা) ।

Dhaka University Institutional Repository

২. তথ্য, ভবাপাগলার পুত্রবধূ শ্রীমতি বীণা চৌধুরী ।

৩. ঝুলন পূর্ণিমা, ৬ই ভাদ্র, ১৩৯৫

৪. শ্রীসুকুমার মিস্ত্রী, অত্যন্ত ছোট বয়সে ভবাপাগলার সান্নিধ্যে আসেন । ভবাপাগলার আশ্রমে থেকে পড়াশোনা করেন । পাগলের সঙ্গে বহু স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন । এমন কি ভবাপাগলার মৃত্যুক্ষণ পর্যন্ত তাঁর সেবা করেছেন ।

৫. পরম গুরু ভবাপাগলা : ২য় খন্ড , পৃ. ১৮৮

৬. ঐ , পৃ. ১৯০

৭. ঐ, পৃ. ১৯৫

৮. ভবাপাগলা একদিন পথচলার সময় গোপাল ক্ষেত্রীকে বলেন , চিন্তা করোনা ও জমিটাও মন্দিরের কাজে লাগবে ।

- তথ্য,গোপাল ক্ষেত্রী ।

৯. পরমগুরু ভবাপাগলা :- ২য় খন্ড , পৃ. ২০০-২০১

১০. লেখাটি ভবার হরবোলা মন্দির ফলকে উৎকীর্ণ হয়ে আছে । দর্শকগণ তা পাঠ করে থাকেন ।

৩০

------ 0 ---------

Dhaka University Institutional Repository

শিষ্যের দৃষ্টিতে ভবাপাগলা

"হাসি খেলায় পাগলামির মধ্যে যাঁরা ধরা দিয়েও নিজেকে লুকিয়ে রাখেন, ভবাপাগলা সেই বিরল সাধক সমাজের অন্যতম।"[১] ভক্তরা বা শিষ্যরা তাঁদের আপন অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি থেকে পাগলকে নানাভাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন।

ভবাপাগলা তাঁর এই দীর্ঘ ৮৪ বৎসর জীবনে, বহু জায়গায় পরিভ্রমণ করেছেন; বহু লোকের সান্নিধ্যে গিয়েছেন। প্রায় দেড় লক্ষাধিক ভক্ত শিষ্য রেখে গেছেন। গানের ভাষায় এবং উপদেশের বাণীর মধ্যে আপনার মতাদর্শকে প্রচার করে গেছেন। তবুও, ভক্তদের অন্তরে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জেগেছে তিনি মূলতঃ কোন্ পথের পথিক ছিলেন? তান্ত্রিক? শাক্ত? বৈষ্ণব? না, বাউল? কেউ ভেবেছেন তান্ত্রিক; বাহ্যিক আচরণে মনে হোত শাক্ত; আবরণে ছিলেন বাউল — ধার্মিক জনেরা মনে করতেন পরম বৈষ্ণব। কখনো কখনো ধরে নেয়া হোত তিনি এঁদের সবক'টিই; আবার মনে হোত কোনটাই না। তবে যে বিষয়টির সঙ্গে সকলেই একমত হবেন — তাহ'ল, তিনি ছিলেন সহজ মতের সাধক। অর্থাৎ সহজিয়া। মনের মধ্যেই বাউলদের মত মনের মানুষ খোঁজেন।

ভবাপাগলা মানুষ খোঁজে,
সদা থাকে চোখটি বুজে।
মনের মানুষ মনেই আছে
আমার মা সে ব্রহ্মময়ী।।[২]

ভবাপাগলার ধর্মমত নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কথা সাহিত্যিক সন্তোষ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "..... তিনি ধর্মে বাউল ছিলেন না মর্মে।"[৩]

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীপ্রতাপ নারায়ণ চক্রবর্তী, কলকাতার একজন প্রখ্যাত তন্ত্র বিশারদ। তিনি বহু দিন বহু সময় পাগলের সান্নিধ্য পেয়েছেন। তিনি পাগল সম্পর্কে লেখেন, -- "তিনি এক অবধূত। তবে গুপ্ত অবধূত, প্রকাশে আদৌ আগ্রহী নহেন।"[৪] প্রচারে বিমুখ ছিলেন একথা বোধ করি ঠিক নয়। মাতৃনাম প্রচার, জীবনের পাথেয় কি-তা প্রচারের পাশাপাশি নিজের নামটি প্রচারেও কখনো কুন্ঠিত ছিলেন না তিনি। তাই প্রতিটি গানেই নিজের নামটি সংযোজন করে ছিলেন, ভবাপাগলা। তবে "খবর" হতে চাননি কখনো। কারণ তিনি ভাবতেন "খবরে গেলেই গোবরে গেলাম।" কথাটি ঠিক, কেননা, সাধু সন্তদের খবরে যেতে নেই। অনেকেই তাঁকে রাম প্রসাদ বা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উত্তরসূরী হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। এর অবশ্য কারণও ছিল। প্রথম কারণ, ভবাপাগলা - রামপ্রসাদের মতো শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছেন এবং মাতৃনামমন্ত্র প্রচারে উৎসাহী ছিলেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব নিজে গান রচনা করেননি তবে রামপ্রসাদের বা অন্য সাধকদের রচিত মাতৃসঙ্গীতগুলি গান করতেন। ভবাপাগলার মধ্যে এই দুই গুণেরই সমন্বয় আমরা লক্ষ্য করে থাকি। মৃত্যুক্ষণ পর্যন্ত তিনি গান লেখেছেন। বিষয় নির্বাচনে বৈচিত্র থাকলেও তাঁর শ্যামাসঙ্গীতগুলিই - সংখ্যায় ছিল অধিক। তবে পরম-হংসদেবের সাথে তাঁর পার্থক্য এই, তিনি অন্যের রচনা বা গান গানান। তিনি নিজে গান লেখতেন, নিজে সুরারোপ করতেন এবং নিজ কন্ঠে সেধে সবাইকে মুগ্ধ করতেন।

ভবাপাগলা কোন ধর্ম প্রচারক ছিলেন কিনা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-নিয়ামক শ্রীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,- 'ভবাপাগলা কোনও একটি বিশেষ ধর্ম বা সম্প্রদায়ের ধারক ও বাহক নন।...।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি মুক্ত পুরুষ, রিপুগণ তাঁর দাস। তিনি কখনো বিহার করেন— কৃষ্ণের সঙ্গে কখনো বা কালীর সঙ্গে, তিনি কখনো সগুণ, কখনো গুণাতীত। যখন তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলেন, তখন তিনি মানুষ; আবার ক্ষণিকের মধ্যেই ডুবে যান ব্রহ্মানন্দের মহাসমুদ্রে।"[৫] ধর্ম সম্পর্কে পাগলের বক্তব্য ছিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তিনি ভক্তদের বলতেন, "কৃষ্ণ, কালী, বুদ্ধ, চৈতন্য, যীশু, মহম্মদ — যাঁকেই ভজনা কর,— ফল একই।" অর্থাৎ ধর্মে ধর্মে বিরোধ; এবং ধর্ম প্রচারকদের মধ্যে পার্থক্য খোঁজার মধ্যে বিজ্ঞতার কিছু নেই, আছে অজ্ঞতা। "এই তত্ত্ব নিশ্চিত ভাবেই জেনেছিলেন ভবাপাগলা এবং নিশ্চিত ভাবেই নিজের কথা বার্তায়, চলনে - বলনে, আচারে-আচরণে, আদেশ-উপদেশে তিনি সর্বজীবন ভরে সেই সুবর্ণালোকই বিকীর্ণ করে গেছেন, সেই সুমিষ্ট সঙ্গীতই রণিত করে গেছেন, সেই সুবিপুলানন্দই প্রকটিত করে গেছেন সাদরে সাগ্রহে, সানুগ্রহে।"[৬] ভবাপাগলা যে একজন আধ্যাত্মিক পুরুষ ছিলেন, সেকথার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাই আমরা মহামন্ডলেশ্বর শিবানন্দ গিরি মহারাজের লেখায়। গিরি মহারাজ নিজেও ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও সঙ্গীত সাধক। তাই তাঁর মন্তব্যটি ভক্তদের নিকট যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিল। তিনি লেখেন, "যাঁরা স্পর্শ দিয়ে অথবা শুধু ইচ্ছে করলে যে কোন মানুষকে বদলে দিতে পারেন, কুলকুন্ডলিনী শক্তিকে জাগাতে পারেন, ঈশ্বর দর্শন করাতে পারেন, সমাধিস্থ করতে পারেন - ভবাপাগলা সেই অবিশ্বাস্য শক্তির আধার।"[৭]

পাশাপাশি একথা ক'টি ভুললে চলবে না, যে ভবাপাগলা ছিলেন- পাগলের সেরা পাগল। তাঁর পাগলামির আধার ছিল এই ভব সংসার। জগৎমিথ্যা, ব্রহ্মসত্য বলে তিনি যেমন সংসার থেকে সরে যাননি বা

Dhaka University Institutional Repository

সাধন-কুঠিরে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখেননি । তেমনি ঈশ্বরকে সত্য জেনে সৃষ্টির রসঘনত্বকে উপেক্ষা করেননি । মোটকথা, তীর্থকে সংসার এবং সংসারকে তীর্থে পরিণত করে গিয়েছেন তিনি ।

তথ্য নির্দেশ

১। বক্তব্য, মহামন্ডলেশ্বর শিবানন্দ গিরি মহারাজ, আনন্দ আশ্রম,কৈলাশ, ২১/২, বীডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬ ।
শ্রীতমোনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়,'বিদগ্ধ জনের মন্তব্য' ।

২। সঙ্গীত(সংকলন), গান নং-১৪৯

৩। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়,"মন কেন তুই ভাবিস মিছে", ভবামৃত পত্রিকা ; ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৯৪ ।

৪। বিদগ্ধ জনের মন্তব্য, পৃ. ১১

৫। ঐ, পৃ.১২-১৩

৬। ডঃ রমা চৌধুরী,("যাঁকেই ভজনা কর, ফল এক ")।
ভবামৃত — ANNUAL MAHAPUJA NUMBER BHABAMRITA, PAUSH- MAGH- 1394.

৭। বিদগ্ধ জনের মন্তব্য, পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

ভবাপাগলার গানের সাধারণ পরিচিতি

ভবাপাগলার জীবনী পর্যালোচনার মূল আকর্ষণ-তাঁর গান । যতদূর জানা যায়, ভবাপাগলার গান, বাণী, উপদেশ, প্রকৃতি - সবমিলিয়ে সংখ্যায় প্রায় আটাশ হাজারেরও উপরে ।[১] এই তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য আমি গত ৮-১০-৯০ কালিমা মন্দিরে যাই । সেখানে শ্রীসনৎকুমার চৌধুরীর সৌজন্যে আমি ভবাপাগলা কর্তৃক স্বাক্ষরীকৃত সাড়ে পাঁচ হাজার গানের মোট ষোলখানা পান্ডুলিপির সন্ধান পাই । যার কিছু সংখ্যক গান আমি পান্ডুলিপি থেকে ফটো-কপি করে এনেছি । শ্রীসনৎকুমার চৌধুরী ভবাপাগলার আরও দু'টি বৃহৎ পান্ডুলিপির কথা উল্লেখ করে বলেন, ভবাপাগলার মৃত্যুর পর সবগুলি পান্ডুলিপি, শ্রীসদয় চাঁদ চৌধুরী, মন্দির থেকে নিয়ে নেন । পরে শ্রীসনৎকুমার দাবী করলে তার ষোলটি ফেরত দেন । শ্রীসনৎকুমার চৌধুরীর নিকট আটাশ হাজার গানের তথ্যটির সত্যতা সম্পর্কে জানতে চাইলে জানান, ভবাপাগলার গান ভক্ত শিষ্য অনেকের কাছেই রয়েছে। কারণ, ভবাপাগলা অনেক স্থানে অনেকের আঙিনায় বসে গান লিখেছেন ; হয়তো সে সব পান্ডুলিপি তাদের কাছেই রয়ে গেছে । তবে রচনার সংখ্যা আটাশ হাজার না হলেও খুব কম হবে না - বলে, তাঁর অনুমান । শ্রীচুনীলাল ঘোষ, গড়পাড়ার জমিদার শ্রীমোহিনী ঘোষের ভ্রাতা , তিনি ছিলেন ভবাপাগলার অত্যন্ত কাছের মানুষ। তাঁর অভিমত, ভবাপাগলা জন্মভূমি আমতা থেকে শেষ বারের মত ভারত চলে যাবার সময় চৌদ্দ'শ গানের তিনটি পান্ডুলিপি সঙ্গে করে নিয়ে যান । পরে শ্রীতমোনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ করে অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হই ।

ভবাপাগলা অত্যন্ত ছোট বয়স থেকে গান লিখতে শুরু করেন । তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

পান্ডুলিপির প্রথম গান, —

এস মা কালী , শুনমা বলি, আমার প্রাণের বেদনা ।
লাগে না ভাল কি যে করি, তুমি আমায় বলনা ।।*

(সঙ্গীত সংকলন , গান নং ৫৪)

" ঝিঁঝিট মিশ্র - কাহারবা " তালে রচিত এ গানটি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ-দর্শী-গণের অভিমত, ভবাপাগলা ছয় / সাত বৎসর বয়সে মুখে মুখে এ গান রচনা করেন । তখন মাত্র প্রথম দুটি চরণের মধ্যে গানটি সীমাবদ্ধ ছিল । এখানে উল্লেখ-যোগ্য বিষয় হ'ল এই , ভবাপাগলার রচিত শেষ যে গানটি আমরা পেয়েছি,ওটিও একটি অসমাপ্ত গান ।

জীবনের সীমানার কাছাকাছি -
কি করেছি আর কি করছি.....

মাঝখানে এই যে অজস্র গান,এসবের বৈশিষ্ট্য ছিল বিচিত্রতর ।

ভবাপাগলা তাঁর শিল্পী জীবনে একাধারে শ্যামা সঙ্গীত, বাউল,কীর্তন-পদাবলী ভাটিয়ালী , মারফতী ও পল্লীগীতি প্রভৃতি গান রচনা করেন । তবে একথা ঠিক যে, কালীর উপাসক ভবাপাগলা, সমস্ত জীবনে যতগান রচনা করেছেন ;তন্মধ্যে শ্যামা সঙ্গীত বা মাতৃ সঙ্গীতের সংখ্যাই বেশী । তাঁর জীবনের প্রথমার্ধের

---

* গানটি মূল পান্ডুলিপির তালিকার প্রথমে রয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

শ্যামা সঙ্গীত গুলি ছিল এ রকম, —

শ্যামা সঙ্গীত -১,

(মা) তোমারে যেন ভুলিনা আমি,
যত দিন রাখ সংসারে ।
তুমি থেকো মা সঙ্গে সঙ্গে,
বিষয় তরঙ্গ মাঝারে ॥

যত মা ইচ্ছা দিও মা সাজা,
তোমারে করেছি দেহেরি রাজা ।
আমি মা তোমার খাসের প্রজা,
চির-বাকি মা আমারে॥

তব ইচ্ছা যদি নরকে ফেলিবে ,
বড় শান্তি পাব মা আদেশ ভেবে ।
কত কষ্ট দিবে ওগো মহামায়া,
শান্তি-ময় কর , আমারে ॥

বিষয় কষ্ট বিঁধিলে এগায়,
তবু যেন মন থাকে রাঙ্গাপায় ।
ভবাগমনা ভবে,কিছু নাহি চায়,
এই টুকু আশা অন্তরে ॥

(সঙ্গীত সংকলন , গান নং ৭০)

Dhaka University Institutional Repository

শ্যামা সঙ্গীত - ২

যে জন বিপদ কালে , তোকে মা-মা বলে,,
রক্ষা কর তারে রক্ষা কালী ।
যে জন শরণাগত , তুমি তার অনুগত,
শতত: অভয় দাও মাভৈ: বলি ।।

দেখিয়া ভয় হয় মুরতি তোমার,
মহামায়া নাম তব করুণা অপার ।
কালী-প্রেম সরোবরে যে দেয় সাঁতার,
আনন্দে ভবপারে যায় গো চলি ।।

সুখের সময় যে জন ভুলিয়া থাকে ,
শতত: ঘুরাও তারে বিষয় পাকে ।
মায়ার প্রভাবে ধরা দাও না তাকে,
কর, কুবেরের মত তারে ধন শালী ।।

চতুর্ভুজাদেবী মুন্ডমালা গলে,
যে জন স্মরণ লয় মরণ কালে ।
কৃতান্ত দলনী দলিয়া কালে ,
সন্তানে রাখ মাতা বক্ষে তুলি ।।

ভবাপাগলার যবে আসিবে মরণ,
সবা সঙ্গে মিলে যেন পাই শ্রীচরণ।
তোমারে মা ডাকিনি কখন,
(তাই) শমনের কবলে দিও না ফেলি ।।

(সঙ্গীত সংকলন , গান নং ১৭)

Dhaka University Institutional Repository

গান দুটি দেশ বিভাগের পূর্বে এদেশের মাটিতে বসে লেখা । পশ্চিমবঙ্গ , কালনাতে বসেও ভবাপাগলা অনেক শ্যামা সঙ্গীত রচনা করে রেখে গিয়েছেন আমাদের জন্য ;

শ্যামা সঙ্গীত - ৩,

মা, তব হাসি বদনে, মধুর ভাষণে,
অধম সন্তানে শান্তির - শান্তি দায়িনী।
মা, তোমার কেন এত রোষ, হও মা সন্তোষ,
আশেষ করমা শ্যামা করাল বদনী ॥

কবোর জন্ম হলো, মম আশা না মিটিল,
না মিটিল হৃদি জ্বালা , (কেবল)বাড়ে এগিনী।
গগন পরশিতে চায়, জন্মগত অবেলায় ,
কেবল লুটায় মম অশ্রু মন্দাকিনী ॥

এত কি দুঃখ প্রাণে সয়, তুমি না-মা মঙ্গলময় ,
এ অসময় কেন প্রলয় কারিণী ।
তুমি হাসিয়া বিকট গান্সি , দাও তুমি মায়া ফাঁসী,
ভাসি সদা মৃত-প্রায় , (আমি) দিবস যামিনী ॥

Dhaka University Institutional Repository

কি যাতনা দিন দিন, তোমার সকলাধীন,
(আমি) হীন বলি, (তব) রাঙ্গা ছাড়া নই আমি কখনি।
এ দয়ার সংসারে , কেন এ অবিচার, ভাসে কেঃ অশ্রুনীরে,
তুমি কেন এত পাষানী ॥

ভবাপাগলা রটে, এস শ্যামা নিকটে,
সংকটে ফেলিও না শ্যামা , বিপদ বারিণী।
আজ যায়, কাল আসে, কাল যে সদাই হাসে,
কালি হয়ে যায় অঙ্গ , ওমা কালী কপালিনী ॥ *

ভবার বাউল গানের পরিচয় নতুন করে দেবার প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না । কারণ বিখ্যাত বাউল গান সংগ্রাহক ও সংকলক অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, তাঁর " বাংলার বাউল ও বাউল গান" গ্রন্থে [৩] ভবাপাগলার দুটি গান তালিকা ভুক্ত করেছেন । মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন তাঁর " হারামণি "গ্রন্থের সপ্তম খন্ডে লেখেন , " ভবাপাগলা একজন নামকরা বাউল গান রচয়িতা ।.. ... তাঁর গান মানিকগঞ্জ মহকুমায় বহুল পরিচিত ও গীত।[৪] ভবাপাগলার রচিত বিখ্যাত বাউল গান গুলির কয়েকটি নিম্নে প্রদত্ত হ'ল :-

বাউল - ১,

মরণ কারো কথা শুনে না ।
যখন তখন, যেথায় - সেথায় , দিতে পারে সদাই হানা ॥

---

* ভবার গীতিমালা, গান নং ১১৮, সংকলক—শ্রীনন্দ চাঁদ চৌধুরী ।

Dhaka University Institutional Repository

জাল পেতে ঐ মরণ ছলে,
মহামায়া নেয় যে কোলে।
কথায় কথায় মানুষ বলে,
আমার বলতে কেউ রইলো না ॥

বেঁচে আছ এই আশ্চর্য্য,
নাই ক' কার' ব্রহ্মচর্য্য।
থাকতো যদি একটু ধৈর্য্য,
ঐশ্বর্য্য আর গায়ে ধরতো না ॥

মরবে বলে, মনে রেখো,
বেশী দিন বাঁচবে দেখো।
কথার মত কথা শেখ,
মরণের দিন যাবে জানা ॥

নিজের হাতে বাঁচন মরণ,
ভবাপাগ্লার সত্য বচন।
তারে বলে রাখলে স্মরণ,
অকালে মরণ হত না ॥

(সঙ্গীত সংকলন, গান নং ১৫০)

Dhaka University Institutional Repository

০৮ বাউল-২

একতারা বাজায় বৈরাগী, দু'তারা বাজায় বাউল,
তিন তারে বাজায় ফকীর, চারটি তারে বাজায় রে পাগল ।
কেউ গাহে হরে কৃষ্ণ, কেউ গাহে চণ্ডীরাণী,
কেউ গাহে দেহতত্ত্ব, কেউ গাহে রে দলমাদল ॥

দেবতার অন্ত নাই, মহাভারতে কেবল লড়াই,
ভারত বর্ষ, এ আদর্শ, এথায় যত গুরু গোঁসাই ।
এই ভারতে জন্ম লইলেই, তাঁর তুলনা আর কোথাও নাই,
নমঃ নমঃ জন্মভূমি, প্রেমে ভরা চোখের জল ॥

অন্নপূর্ণা বিরাজ করে শষ্য শ্যামল বসুন্ধরা,
মাকে তোরা প্রণাম কররে, মায়ের প্রাণ যে স্নেহভরা।
মায়ের কোলেই নাচি-গাই, মায়ের মোরা ধ্রুবতারা,
মাতৃহারা নাহি মোরা, মা ভরসা স্নেহের আঁচল ॥

ভবাপাগলার গীতিছন্দ, মহানন্দ ভরপুর,
মধুর ভাষায় কেবল দোলায়, প্রাণ মাতাল মধুর সুর ।
সবাই যে রে ভালবাসে, দেশদেশান্তর বহুদূর ;
করযোড়ে ভিক্ষা মাগী, সবাই দিও চরণতল ॥*

---

* নামের ফেরিওয়ালা ভবাপাগলা, পৃ. ১৮১

Dhaka University Institutional Repository

ভবাপাগলার কীর্তন পদাবলীগুলিও যেন এক, অপূর্ব হৃদয়রসের সঞ্জীবনী। বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম, জগদানন্দ, এমনকি রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতাগুলি, পাঠ করে আমরা সকলে মুগ্ধ হই। ভবাপাগলার শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক পদ, শ্রীরাধা বিষয়ক পদ, শ্রীচৈতন্য বিষয়ক পদ গুলিও আমাদের মুগ্ধ করে।

শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক পদ-১,

এখনও সেই বৃন্দাবনে বাঁশী বাজে রে।
(যাঁর) বাঁশী শুনে, বনে বনে ময়ূর নাচে রে ॥

আছে সেই রাধারাণী,
বাঁশী শুনে পাগলিনী।
অষ্ট সখি, শিরোমণি - নব সাজে রে ॥

আছে সেই গাভী গুলি,
গোচরণে ছড়ায় ধূলি,
সখা সনে কোলাকুলি, রাখাল রাজে রে ॥

এখনও সেই যমুনা,
জল ভরিতে যায় ললনা।
কদম তলায় সেই ছলনা, কৃষ্ণ আছে রে ॥

এখনও সেই ব্রজবালা,
বাঁশী শুনে হয় উতলা।
গাঁথে বনফুল মালা, বন মাঝে রে ॥

Dhaka University Institutional Repository

আশা ছিল মনে মনে,
যাব আমি বৃন্দাবনে।
ভবাপাগলা রয় বাঁধনে, মায়ার কাছে রে ।।

(সঙ্গীত সংকলন, গান নং ১৬)

শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক পদ-২

মধুর মুরতি তব শ্যাম, ওগো শ্যাম ।
মধুর মুরতি তব শ্যাম, ওগো শ্যাম ।।

বাঁশরীর গান, যমুনা উজান,
কেবলি বাঁশীতে গাহে, রাধা-রাধা নাম,
রাধা-রাধা নাম ।।

(সঙ্গীত সংকলন, গান নং ২৩)

শ্রীরাধা বিষয়ক পদ -১

ময়লা রয়েছে তোর গায়,,
ধুয়ে নে, ওলো সখী, নীল যমুনায় ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম - গা'রে মুখে অবিরাম,
প্রণাম করনা দু'টী পায় ।।

Dhaka University Institutional Repository

চেয়ে দেখরে তুই কদম তলায়,
মোহনীয়া ঐ, বাঁশরী বাজায় ।
যাহারি ছোঁয়ায় , পাপ চলে যায়,
পারশিতে তাঁরে , ধয় না রাধায় ।।

বনফুল মালা নয়, মনফুল মালা,
যত ভালবাসা ঐ বংশীওয়ালা ।
যত কুলবালা, আর তুই অবলা ,
সিনান করিয়া ওরে তুরা চলি আয় ।।

এখনি আসিবে রাই, সিনান করিতে,
কৃষ্ণের মধুর, বাঁশী শুনিতে ।
কলসী কাঁখে, কারে যেন ডাকে,
ভবা এই ফাঁকে চরণে লুটায় ।।

(সঙ্গীত সংকলন গান নং ৩০)

গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ -১,

(আজ) গৌরাঙ্গ লাল রে, আমার গৌরাঙ্গ লাল,,
নিতাই প্রেমে মাতাল রে, নিতাই প্রেম মাতাল ।
শ্রীঅদ্বৈত, গদাধর, ভকত কাঙ্গাল রে, ভকত কাঙ্গাল ।।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীবাস অঙ্গনে,
কীর্তনে কীর্তনে ।
ফাগুয়া, আবীরের হ'ল লালে ঐ লাল রে, লালে ঐ লাল ॥

নদীয়ার রাঙ্গা মাটি,
নদীয়ার বসত বাটী ।
কোটি, কোটি জনম, মহাভাগ্য ফলরে, মহাভাগ্য ফল ॥

ভবা ফাগুয়া দিনে,
নিবেদন ঐ শ্রীচরণে ।
নদীয়া, শ্রীবৃন্দাবনে, একই খেয়ালরে—একই খেয়াল ॥

(সঙ্গীত সংকলন, গান নং ৩৫)

ভবাপাগলার সাধনা সঙ্গীত, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ধারায় এক অনন্য সংযোজন ।"তাঁর সঙ্গীত বাণীতে বেদ-বেদান্তের শিক্ষা, দেব-দেবীর প্রত্যক্ষ দর্শন বর্ণনা, ভক্ত প্রাণের পরম পথ ও পাথেয় লাভের নির্দেশনা সকল দিকেই সমুজ্জ্বল মণিমুক্তা ছড়ানো বিরাট ভান্ডার।"[৫] তারপর লোক শিক্ষার সহজতম পন্থায় বাউল, পদাবলীর মত ভাটিয়ালী,পল্লী-গীতি, মুর্শিদী বা মারফতী প্রভৃতি লোক সঙ্গীতের বিপুলতর বাগান সাজিয়ে রেখে গেছেন ।

Dhaka University Institutional Repository

ভাটিয়ালী-১

নাও বাইয়া, নাও বাইয়া মাঝি, নদীর আইল বান,
সাবধান মাঝি, বন্ধু সাবধান, বৈঠা গুঁড়িমার টান্ ।
মাঝি বদর বইল্যা ধৈর পারি,
জাইন, যাহা মুস্কিল তাহাই আসান ।।

(সঙ্গীত সংকলন, গান নং ১৭২)

ভাটিয়ালী-২

কাইন্দা কি পামুরে তারে ।
সে-যে হাসিকান্নার ধার ধারেনা, বান্ধা পড়ে ভক্তি ডোরে ।।

কতলাক কত আকু-তাকু,
মনের আগুন জ্বলে হুঃহুঃ। রে-
আমি মিতালী করিলাম বন্ধু, (দেখি) সবাই যে মোর দফা সারে ।।

বাইরে কান্দে কত জনা,
অন্তরে কেউ কান্দে না ।
(তাই) কেহ তাঁর নাগুর পায় না, (তবু) কাছে কাছে সদাই ঘুরে।।

(তাঁর) নাম শুইন্যাছি বড়ই দয়াল,
(তবু) দয়া করে জাইনা কপাল । রে -
দুঃখে দুঃখে যায় চিরকাল, কি যেন মোর কর্ম্ম ফ্যারে ।।

Dhaka University Institutional Repository

ভক্তি শক্তি নাহি জানি,
(কেবল) কাইন্দা করলাম আঠুপানি । রে-
দয়া কর মা ভবানী, ভবা কয় এই অভাগারে ।।

(মূল পান্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত)

পল্লীগীতি-১

কালা নাম আর মুখে আইনো না,
(ওরে, কৃষ্ণ নাম আর মুখে কইও না)
অন্তরে জপিতে পার, মুখে প্রকাশ কইরো না ।।

(সঙ্গীত সংকলন, গান নং ১৮৪)

'মারফত' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'মধ্যস্থতায়' । সুফীতত্ত্বে এর ব্যাখ্যা অবশ্য অন্য রকম । অধ্যাপক আর,এ, নিকলসন তাঁর 'দি আইডিয়া অব পারসোনালিটি ইন সুফিইজম' গ্রন্থে সুফীতত্ত্ব নিয়ে যে, আলোচনা করেন, অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, তার অনুবাদ করেন-এ রকম, 'মারফত'-এর অর্থ ভগবানের সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান । বুদ্ধির উর্দ্ধস্তরে যে, দিব্যজ্ঞান, সেই দিব্যজ্ঞানে উদ্ভাসিত হৃদয়ে ভগবৎ সত্ত্বার অপূর্ব আনন্দময় অনুভূতিই এই 'মারফত' পন্থার বৈশিষ্ট্য । এই অবস্থায় এই মরমীয়া সাধক নিজের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়া ভগবৎ আস্তিত্বে মিশিয়া গিয়া থাকে । ইহাকে 'তৌহীদ' বা ভগবানের সহিত একাত্ম হওয়া বলে।[৬] আরও একটু সহজ

---

* The Idea of personality in sufism,

- R.A. Nicholson, Page- 10-11,

Dhaka University Institutional Repository

করে শ্রীভূদেব চৌধুরী বলেন, "মুসলমান লোক সমাজে বাউলের অনুরূপ সহজ সাধনার পন্থাকেই মুর্শিদী বা মারফতী ধারা নামে অভিহিত করা হয়।"[৭] অর্থাৎ বাউল সাধনা যেমন আনুষ্ঠানিক শাস্ত্র ধর্ম নিরপেক্ষ, তেমনি মুর্শিদী বা মারফতী সাধনাতেও শাস্ত্রাচার বর্জন করা হয়েছে। বাউলদের মত এদেঁরও সকল সাধনার কান্ডারী হচ্ছেন গুরু বা মুর্শিদ। ভবাপাগলা তাঁর গানে গুরুবাদ বা গুরুতত্ত্বকে প্রচার করে গেছেন। গুরুর কৃপা প্রার্থনার কথা ধ্বনিত হয়েছে তাঁর গানে,—

গুরুকে দিয়ে গান-১,

(ওগো) গুরু আমায় কর করুণা।
ঝড় তুফানে - বেয়ে যাব (গুরু)
তোমার দেওয়া তরীখানা।।

ভব নদীর ভীষণ তুফান,
কেঁপে কেঁপে ওঠে পরান।
তুমি গুরু সকল আসান,
মুস্কিলে যেন পড়িনা।।

(সঙ্গীত সংকলন, গান নং ৮,)

গুরুকে নিয়ে গান -২,

গুরুকে ধরতে হলে, ঠিক কর তোমার মন।
চঞ্চল হও, ক্ষতি কি, ঠিক থেকো, ডাকবে যখন।।

Dhaka University Institutional Repository

একটি তাকেই পাবে সাড়া,
(যারা) নির্বিকার, জগৎ ছাড়া।
দেহ স্মৃতি, মৃত্যু জরা,,
(সাবধান) এই -লতাতে কন্টক ভীষণ ।।

(সঙ্গীত সংকলন , গান নং ১১,)

এ ছাড়া ভবাপাগলা মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যেও বেশ কিছু সঙ্গীত রচনা করেন - যাকে আমি , আমার সংকলনে " ইসলামী ভাবাপন্ন গান " হিসেবে তালিকা ভুক্ত করেছি । যেমন -

ভবাপাগলার ইসলামী ভাবাপন্ন গান-১,

এখন তুই নমাজ পড়, এখন খোলা আছে মসজিদ ঘর ।
কোন্ সময়ে বন্ধ হইব, হময় থাকতে , ঢুইক্যা পড় ,
তাড়াতাড়ি গোছল কর ।।

(ফজর) পাঁচ উওম তুই নমাজ পাইর‍্যা,
দিলি যে-রে নমাজ ছাইর‍্যা ।
বাকী উওম রইল পইর‍্যা, ভুলডা করলি তুই যে নবর ।।

(জহর) তাক নমাজ আর নিশুম নমাজ,
কোনডার না করলি নমাজ।
করলি কত ধান্দাবাজি, আসল কাজের নাইরে খবর ।।

Dhaka University Institutional Repository

(আছর) নিয়াস ধইরা বলবে আল্লা,
নমাজের তর বারবো জেল্লা।
তুই দুনিয়ার মারবি কেল্লা, দোয়া করবো সেই পয়গম্বর ॥

(মোগরম) মক্কা যাইয়া কেনা পানি,
পান করস মন তাতো জানি।
এ দুনিয়ার আদম যিনি, পয়দা করে সব পানির ভিতর ॥

(এশা) শুন বলি ভাই, ও মুসলমান,
পরগা যাইয়া কেতাব কোরাণ,
ভবাপাগলার আসল জবান, জান গেলেই না দিব কবর॥
(সঙ্গীত সংকলন, গান নং ১৮৫,)

ইসলামী ভাবাপন্ন গান -২,

(ওতুই) মক্কা যাইবার করলি নারে নাম।
(তোর) দেহের মধ্যে আছে মক্কা,
কওনারে তারে হাজার সালাম ।।

মন মদিনা চরণ দাড়ি, হাজম করলি দুনিয়া ঘুরি।
কয় উগ্র তুই নমাজ পড়ি, রোজার ঘরে দিলি বিরাম ॥
(সঙ্গীত সংকলন, গান নং ১৮৭)

Dhaka University Institutional Repository

গান ছাড়া ভবাপাগলার রচিত আরও অনেকগুলি উপদেশমূলক ছন্দ-বদ্ধ বাণী, ও ধাঁধার সন্ধান আমরা পেয়েছি - যা তিনি ভক্ত-শিষ্যদের জন্য 'জীবন চলার পাথেয়' হিসেবে রেখে গেছেন ।

পাঠক হয়তো অবাক হবেন - কিন্তু প্রত্যক্ষ দর্শীরা জানেন, ভবাপাগলার প্রতিভার চমৎকারিত্ব ছিল এই, তিনি যে গানটি রচনা করতেন, সঙ্গে সঙ্গে সেটিতে সুরারোপ করে হারমোনিয়ামে কন্ঠ সেধে সবাইকে মুগ্ধ করে দিতেন *। সঙ্গীত বাদ্য যন্ত্রের প্রায় সব শাখাতেই তাঁর যথেষ্ট পারঙ্গমতা ছিল । তিনি বেহালা** সেতার, হারমোনিয়াম, তবলা, বাঁশী, জলতরঙ্গ, গিটার প্রভৃতি সমকালীন এমন কোন বাদ্যযন্ত্র ছিল না - যা তিনি হাত দিয়েছেন,অথচ সার্থক হননি । সঙ্গীতের প্রধানতম দু'টি বাহন "সুর ও ছন্দ" বোধকরি বিধাতা পুরুষ, তাঁর কন্ঠে ও অন্তরে জন্মের প্রারম্ভেই প্রদান করেছেন । ভবাপাগলার কন্ঠের মাধুর্যছিল অতি অপূর্ব । তাঁর প্রায় সমস্ত গান ছিল রাগ ভিত্তিক । সঙ্গীতকে সমৃদ্ধির আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি নতুন নতুন রাগ সৃষ্টি করে গেছেন ।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ :

১. শ্রী তরণী সাধুর 'স্মৃতি-চারণ' আমতা, বালিয়াটী ।

২. ' নবাতরা' মাসিক পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা,
ফাল্গুন - ১৩১০,

সম্পাদক - শ্রী সদয় চাঁদ চৌধুরী ।

৩. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বাংলার বাউল ও বাউল গান, পৃ. ১২৩, ১২৬ ,

৪. মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, হারামণি, সপ্তম খন্ড, ভূমিকা , পৃ. ৬৩,

৫. ' তবাসৃত' শ্রাবণ ভাদ্র সংখ্যা ১৩১৩,

সম্পাদক - শ্রীতমোনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়
নিবন্ধ :- " মহা ভাবের মহাকবি তবাপাগলা'

- শ্রীতমোনাশ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

৬. বাংলার বাউল ও বাউল গান , পৃ. ৫৩

৭. শ্রীভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পৃ. ১২৩

* তবাপাগলা তাঁর প্রিয় তবলা বাদক গণেশ ব্রহ্মচারীর মৃত্যুর পর গান গাওয়া ছেড়ে দেন । গণেশ ব্রহ্মচারীর মৃত্যু হয় ১৩৬২ সনের ২৫ শে ভাদ্র, রবিবার ।

** তবাপাগলা তাঁর জীবনের প্রথমার্ধে বিভিন্ন স্থানে প্রতিযোগিতামূলক বেহালা বাজিয়ে, ও অজ্ঞনে মেডেল পুরস্কার লাভ করেন । মেডেল গুলি ছিল - সোনা ও রূপার সংমিশ্রনে তৈরী । মেডেল গুলি থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় :

ক. ক. মেডেল (বেহালা) মাত্র সাধক তবাপাগলা
আমতা
কালীবাড়ী
ছামাদ ।

বর্তমানে সংরক্ষিত: কালনা মন্দির ।

Dhaka University Institutional Repository

খ. মেডেল - বেহালা বাদনে :

আরতি নাট্য সমাজ
বালিয়াটী
১৩৩৯,
বেহালা বাদনের কৃতিত্বে

অপর পিঠে লেখা :- " ব্রজেন্দ্র মোহন সাহা"

সংরক্ষিত :- কালনা মন্দির ।

গ. মেডেল - (অঙ্কনে)

A WARDED TO
B.K.CHOUDHURY; FOR
PAINTING VIOLLN

By

S.K. SHAHA
ENAM SAFULLY FRIEND'S
CLUB
7, JULY 193.

সংরক্ষিত: কালনা মন্দির ।

Dhaka University Institutional Repository

চিন্তাধারা

ভবাপাগলার সৃষ্টির প্রধান পরিচয় তাঁর গান । গানে গানে ভবাপাগলা নিজেকে বিচিত্র অনুভূতি রসে উপস্থিত করে গেছেন । তাঁর বিভিন্ন চিন্তাধারার প্রসারণ ঘটেছে তাঁর বিচিত্র গানে । তিনি নিজের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে --

ভবা পাগল নয় — ভবা পাগলা ,,
সংসার জড়িয়ে থাকি, থাকি একেলা ।
(সঙ্গীত সংকলন, গান নং ২০৪)

তিনি 'পাগলা' শব্দের মানে করতেন, 'পা যার আগলা' — সেই তো পাগলা । তাঁর ধারণা, সংসারে বাস করেও যিনি সংসার-বন্ধনকে উপেক্ষা করতে পারেন স্বাচ্ছন্দে, সেই পাগলা । তাঁর অনেক কথাই মানুষকে ক্ষণিকের জন্য তাক্ লাগিয়ে দিত । যেমন, কেউ যদি ভবাপাগলাকে প্রশ্ন করতেন, "আসলে তুমি কে ?" ভবাপাগলা সহজে বলে দিতেন, 'আমি সেই।' আবার যদি জানতে চাওয়া হোত- 'সত্যিই তুমি কি ?' তিনি হেসে উত্তর দিতেন, 'আমি বহুরূপী'। ('আমি সেই' এবং 'আমি বহুরূপী' ভবাপাগলা কর্তৃক রচিত দুটি গানের প্রথম কলি।)

এই বহুরূপ চিন্তাধারার প্রকাশ , আমরা তাঁর ব্যক্তিজীবন, স্বভাব ও আচরণের মধ্যে লক্ষ করে থাকি । ব্যক্তি জীবনে ভবাপাগলা ছিলেন ঘোর সংসারী, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও পরিজনদের প্রতিপালক । স্বভাব ছিল ঠিক 'শিশুর মত'। স্বভাবে রাগের বালাইতো ছিলই না - অনুরাগে ভরপুর ছিল তাঁর জীবন । জীবন আচরণের দিক থেকে তিনি ছিলেন অতীব সাধারণ । মাথায় ঝাঁকড়া চুল, কখনো সখ্ করে মাথায় মুসলমানদের টুপি পরতেন । (ছবি,মৌলভীর বেশে ভবা)। চিবুকে এক গোছা পাতলা দাড়ি, গলায় রুদ্রাক্ষ-মালা , বক্ষের দু'ধারে সদা

Dhaka University Institutional Repository

ঝুলিয়ে রাখেন একখন্ড নীল বস্ত্র - চেলী, পরণে হাটু পর্যন্ত পাঁচহাতি লালবস্ত্র। পা-খালি ; যেমন খালি থাকে গা । এক হাতে সোনার লাঠি, অপর হাতে সংসারের থলি, কোমরে টাকার 'খুতি'। কন্ঠে গান, মুখে সদা হাসি । খাতাকলম পাশেই রয়েছে, ভক্তরাও রয়েছে । হারমোনিয়ামের রীট বেজে চলেছে কখন থামবে বলা যায় না ; এইতো ভবাপাগলা । অনেক কিছু খাওয়ার আব্দার - খান সামান্যই। তাকিয়ে থাকেন সবার দিকে , দেখেন শ্রীভগবানকে । সবার মধ্যে ভগবানকে অনুভব করতেন ভবাপাগলা । ভগবানের অস্তিত্ব সম্পর্কে ভবাপাগলার চিন্তাধারা ছিল এরকম, -

যার নাই কেউ, তার আছ ভগবান ।
সহিবার ক্ষমতা দিয়াছ বলিয়া
সহি কত আমি ঘোর অপমান ।
১৮
(সঙ্গীত সংকলন, গান নং ৪)

যার কেউ নেই - সেই অসহায়ের সহায়ক হলেন ভগবান । তিনি জীবের পরম বন্ধু । তিনি আমাদিগকে এ পৃথিবীতে ডেকে এনেছেন - তাঁর সৃষ্টিলীলা সার্থক করার জন্য । সেই পরম হিতৈষী প্রতিপালককে অন্তরের প্রণাম জানিয়েছেন ভবাপাগলা - তাঁর গানে , -

বন্ধু তোমারই নাম,
আনিয়াছ তুমি, পালিতেছ তুমি,
অন্তিমে লহিও প্রণাম ।

(সঙ্গীত সংকলন, গান নং ৬)

Dhaka University Institutional Repository

সুধীজনেরা মনে করে থাকেন - ভগবান ভক্তের অধীন ; অর্থাৎ ভক্তাধীন । অভক্তদের প্রতি তাঁর কোন অনুভূতি নেই । ভবাপাগলার ঈশ্বর বিষয়ক চিন্তাধারা একটু ভিন্নতর । তিনি মনে করেন, ভগবান হলেন, 'বাঞ্ছাকল্পতরু'। ভক্ত অভক্ত বড় প্রশ্ন নয় - পতিতদের উদ্ধারই তাঁর কাজ । তিনি যে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, সে পাপীদের উদ্ধারের জন্য ।

পাপীর তরে আসেন ভগবান,
ভক্তের তরে নাই প্রয়োজন, শুন ওগো বিশ্বপ্রাণ ।
এ ব্রহ্মান্ডের কাছে কাছে, ভক্তমুখে তার গুণগান ।।
(সঙ্গীত সংকলন, গান নং ৩)

তাই ভক্ত-অভক্ত, পাপী,তাপী, সংসারী-সন্ন্যাসী সকল মানুষের প্রতিই ভবাপাগলার আকুল আবেদন,

বদন ভরিয়া তাঁরে ডাক ।
কর সংসার এটাও যে তাহার,
হইও না সন্ন্যাসী এখানেই থাক।।

রাখিও সবার মন, ভাবিও একজন,
দিয়না বিসর্জন,(শুধু) মনকে বাধিয়া রাখ,,
(হবে) সার্থক জীবন তোমার,
সে বিনে বন্ধু নাই আর,
(তাই) গোপাল হৃদয়েতে তাঁর ছবি আঁক ।।
(সঙ্গীত সংকলন, গান নং ৫)

Dhaka University Institutional Repository

'হইও না সন্ন্যাসী, এখানেই থাক' --সংসারী সকল মানুষের পাশে থেকে ঈশ্বরকে স্মরণ করতে বলছেন ভবাপাগলা ।

সন্ন্যাস জীবনকে বড়বেশী অপছন্দ করতেন ভবাপাগলা । তাঁর ভাবনা ছিল এই, যদি সংসারই ত্যাগ করে বনে চলে যাব - তবে বিধাতাপুরুষ আমাদিগকে সংসারে না পাঠিয়ে বনে পাঠালেন না কেন ? অতএব, সন্ন্যাসী লোকদের পেলে তিনি তাদেরকে সংসারী হবার পরামর্শ দিয়ে বলতেন,-

ঘরে বসেই তাঁরে পাওয়া যায়, বৃথা কেন বনে গমন।
চুপটি করে ঘরের কোণে, মুদে দ্যাখ তোর দুটি নয়ন ।।

সংসার ছেড়ে বনে যাবি,
ভাত না খাস, ফলতো খাবি ।
(সঙ্গীত সংকলন,গান নং ১২৩)

জীবন ধারণ প্রক্রিয়ার মৌলিক দিক আলোচনা করে ভবাপাগলা দেখিয়েছেন সংসারী ও সন্ন্যাসীর জৈবিক প্রয়োজন বা চাহিদা একই । তাই তিনি একজন আধ্যাত্মিক সাধক হয়েও সংসারে কাটিয়ে গেলেন সারা জীবন । সংসার ও সন্ন্যাস জীবন সম্পর্কে একটি সার্বিক ধারণা দিয়েছেন ভবাপাগলা এ গানটিতে,-

আমি তীর্থবাসী হব না মন,
সংসার তীর্থ সকল পাব ।

সংসারে যা আয়োজন,
সন্ন্যাসীরও তাই প্রয়োজন
তবে বল কিসের কারণ
সংসার তীর্থ ত্যাজিব ।।

Dhaka University Institutional Repository

সংসার মাঝে আছে গয়াকাশী বৃন্দাবন,
স্থির নিবিষ্ট চিত্তে করিব তার অন্বেষণ ।
পরম বন্ধু আমার মন মহাজন,
পথের সন্ধান আমি তার কাছে জেনে লব ।।

আশায় জড়িত এবে, সকল সাধ পূর্ণ হলে,
মনোময় ঠাকুর মোর পথের সন্ধান দেবে বলে ।
ভবাপাগলা তাই আনন্দে দোলে,
সংসারের সন্ন্যাসী আমি ।
প্রেমের ধ্বজা উড়াইব ।।

(সঙ্গীত সংকলন, গান নং ১০২)

গানটিতে ভবাপাগলার কবি চিত্তের যে, চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটেছে তার অর্থ এই,, 'পরমার্থকে লাভের একটি মাত্র উপায় তা হল,সংসারের সন্ন্যাসী হয়ে উপাসনা করা।' কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝা যাবে যে, কথাটি সহজ হলেও কাজটি সহজ নয় । মন একবার সংসার পাকে পড়ে গেলে তাকে ধরে এনে বৈরাগ্যের আসনে বসানো অত সোজা কথা নয়। কারণ --

সংসার ভীষণ অরণ্য,
(এরা) পশুর চাইতে অতি জঘন্য ।
(এরা) পোষ মানেনা খেলেও অন্ন,
এরা বাগে পেলে ছাড়ে না ।।

মানুষের মধ্যে এইসব হিংস্রপ্রকৃতি দেখে এক সময় ভবাপাগলা নিজেও বলতে

Dhaka University Institutional Repository

বাধ্য হয়েছিলেন, 'সংসারে থাকা নিষেধ সাধু-সন্ন্যাসীর।' হিন্দুধর্মের পরম পুরুষ, কলিযুগ অবতার শ্রীচৈতন্য ছিলেন সাধক শ্রেষ্ঠ চূড়ামণি। পাছে সাধনায় বিঘ্ন ঘটে, তাই সংসার ছেড়ে গৌড়ের সন্ন্যাসী সেজে পাড়ি দিলেন - নীলচল পুরীর উদ্দেশ্যে। আর ভবাপাগলা? তিনি 'সংসার অরণ্যময় - আর অরণ্য তাঁর জন্য নয়'' ভেবে ভেবে শেষ পর্যন্ত কালীমায়ের চরণই সার করে নিলেন।

তীর্থে আমি যাব না মা, তোর পদতলে পড়ে রব।
সকল তীর্থের আদি যে তুই মা, তোর পদতলেই দেখতে পাব।।

(ভবার গীতিমালা-২য়খন্ড, পৃ. ১)

তত্ত্বজ্ঞানীরা মনে করেন - এ সংসার 'অনিত্য'। তাই এই অনিত্য সংসারের মাঝে থেকে 'নিত্যবস্তু'কে ভুলে থাকার কোন যুক্তিই হয় না। ভবাপাগলা কিন্তু সে ভুল করেননি। তিনি অনিত্যের মাঝে বাস করেও নিত্য-বস্তুকে চিনে নিয়েছিলেন। শ্যামা মা ছিল ভবাপাগলার 'মোক্ষবস্তু'।

শ্যামা মায়ের নামে চলেছি ভাসিয়া,
আসিব না আর এপারে ফিরিয়া।
পাড়ি দিব মন শ্যামা নাম ধরিয়া,
আর কিছু সে চায়না ভবেন্দ্র।।

(ভবার গীতিমালা-১মখন্ড, গান নং ২৭)

এই 'এপার ওপার' ভাবনা, ভবাপাগলার পারলৌকিক চিন্তাভাবনার আর একটি দিক। তাঁর জীবনের এক দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে এই

Dhaka University Institutional Repository

'পারাপার' ভাবনা ভেবে ভেবে। একবার ভেবেছেন এপারে কিছু নেই, সব ওপারে। পরক্ষণেই মনে হয়েছে 'না এপারেই'। বাউলেরা জানতেন, সত্যিকারের 'মনের মানুষ', 'অসল মানুষ', পরমবন্ধু থাকেন পরপারে। বাউল সাধক- লালনশাহ্ ফকীর তাঁর গানে 'এই পারে' যাবার কাতরতা প্রকাশ করেছেন, --

পারে লয়ে যাও আমায়,
আমি অপার হয়ে বসে আছি।

'পার', 'পরপার' বিষয়ক ভবাপাগলার বেশ কতকগুলি গান আমাদের হাতে এসেছে। গানের চরণগুলি এরকম, --

ক. আমায় কে গো ডাকিয়া কয়, পারে যাবি আয়।
(সঙ্গীত সংকলন, গান নং ১০৮)

খ. ঐ ডাক পড়েছে শুনরে মন, যেতে হবে পারে।
(সঙ্গীত সংকলন, গান নং ১১৫)

গ. আয় কে যাবিরে ভব নদীর পর পারে।
(সঙ্গীত সংকলন, গান নং ১১২)

ঘ. আমারে কে ডাকে বারে বারে যেতে পারে।
(ভবার গীতিমালা-১মখণ্ড, গান নং৩৬

ঙ. (আমি) চিরতরে সবে বিদায় লভিয়া চলে যাব পর পারে।
(সঙ্গীত সংকলন, গান নং ১১৬)

অর্থাৎ এ দুনিয়ায় যে, কেউ একদিন থাকবে না - সেই কথাটি আমাদের সব সময় স্মরণ থাকা দরকার। শুধু স্মরণ রাখলেই হবে না — যাবার

Dhaka University Institutional Repository

জন্য সদা প্রস্তুত থাকা চাই । তাহলে এমন মৃত্যুর পর্বটি হয়ে উঠবে করুণরসাশ্রিত আনন্দময়-ঘনউজ্জ্বল ।

হেসে চলে যাব কাঁদিবে এরা,
সে কাঁদনে আর দেবো নাকো সারা।
মুক্ত হবো আমি, ছাড়ি বসুন্ধরা,
কি যে বাঁধনে রয়েছি সংসারে ।
(সঙ্গীত সংকলন, গান নং ঐ)

আচ্ছা, আমাদের এই যে পৃথিবীতে আসা, এবং চলে যাওয়া , এর উদ্দেশ্য কি ? এটি শুধু একটি নিছক জৈবিক প্রক্রিয়া মাত্র ? না অন্য কিছু ? অন্য কিছু যাই থাক, এ সম্পর্কে ভবাপাগলার চিন্তাভাবনা হল,-

(প্রভু) তোমারই মহিমা করিতে গান,
(তাই) পৃথিবীর বুকে দিয়েছিলে স্থান ।
(আমি) তোমারই করেছি কত অপমান,
ক্ষমা কর প্রভু পাগলা ভবারে ।।
(সঙ্গীত সংকলন,গান নং ঐ,শেষাংশ)

উপরে উক্ত গানগুলি বিশ্লেষণের তাৎপর্য এই, ভবাপাগলা তাঁর গানে জীবনের যে বিচিত্র চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটিয়েছেন, তন্মধ্যে ভগবান চিন্তা, পরপার চিন্তা, সর্বোপরি মৃত্যু চিন্তার বিষয়টি ছিল অন্যতম । তাঁর মাতৃনাম গান, বাউল,ভাটিয়ালী-বিবিধ গানে এই মৃত্যুর কথা এসেছে বিভিন্ন ভাবে । আসলে জন্ম-মৃত্যুর ব্যাপারে ভবাপাগলা ছিলেন পুরোপুরি নিয়তিবাদী । এ পৃথিবী নিয়তির অধীন । নিয়তি' আমাদিগকে সব সময় নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে ।

Dhaka University Institutional Repository

আমরা তার বাইরে যেতে পারি না । মৃত্যু সম্পর্কে ভবাপাগলার ধারণা, নিয়তির ন্যায় । মৃত্যু প্রসঙ্গে তাঁর ভাবনা, --

মরণ কারো কথা শোনে না,
যখন-তখন, যেথায়-সেথায়, দিতে পারে সদাই হানা ॥
(সঙ্গীত সংকলন, গান নং ১৫০)

মৃত্যু আসবে, যখন-তখন, যেখানে-সেখানে ঠিক । তাই বলে আমরা মৃত্যুর অধীন - সেকথা বলছেন না ভবাপাগলা । মানুষের মত না চলে, একটু আত্ম নিয়ন্ত্রণ হলেই 'অযথা মৃত্যু'র ছোবল থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে ।

নিজের হাতে বাঁচণ মরণ,
ভবাপাগলার সত্য বচন ।
তারে বলে রাখলে শরণ,
অকালে মরণ হয় না ।
(সঙ্গীত সংকলন, গান নং ঐ)

বাঁচণ-মরণ অনেকটা নিজের হাতেই । একটু সিদ্ধিলাভ করতে পারলে - এমনকি 'মরণের দিন' জানাও যেতে পারে ।

এবার জন্মান্তরবাদের প্রসঙ্গে আসি । ভবাপাগলা নিয়তিবাদের মত জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন । গীতায় জন্মান্তরবাদের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

নিদর্শন,-

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়,
নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি,
সংযাতি নবানি দেহী॥

অর্থঃ- মানুষ যেমন জীর্ণ (পুরাতন) বস্ত্র পরিত্যাগ করে অন্য নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেরূপ আত্মাও জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে অন্য নতুন শরীর পরিগ্রহ করেন।

ভবাপাগলার সঙ্গীতগুলোর মধ্যে ঠিক এই কথাগুলিই প্রতিধ্বনিত হতে শোনা যায়;

কত দিনে ফুরাইবে আমার ভবে আসা-যাওয়া।
আর তো আমায় সহে না মা, এ দুঃখেরী জন্ম নেওয়া॥
লক্ষ-কোটী জন্ম ঘুরে, পাব নাকি মা তোমারে,
এই ভাবে কি বারে বারে, বাইতে হবে ভবের খেওয়া॥

(সঙ্গীত সংকলন, গান নং ৫৩)

অন্য একটি গানে এ আক্ষেপটি অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছে,

আসা যাওয়া সার হয় কেবল ভবের মাঝারে।
পাড়ি দিবার নাই তোর কড়ি, তাই পড়িস্ রে পাথারে॥

(ভবারগীতিমালা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬)

অতএব, আর দেরী নয়, অচিরেই তিনি এ পর্বটি, চুকিয়ে ফেলতে চান। কারণ যে আশা, উদ্দেশ্য নিয়ে এই ভবে আসা, তাই যদি সম্পন্ন না হল তবে কি লাভ - এ জন্ম নেয়ার। সুতরাং 'মা কালীকে' ডেকে

Dhaka University Institutional Repository

ভবাপাগলা তাঁর অন্তরের শেষ নিবেদনটি জানিয়ে দিলেন ,

আসা যাওয়া মিটিয়ে দেমা, বসি যেয়ে ঘরের কোণে।
নিরবতায় এই অবেলায়, ডাকবো আমি মনে মনে ॥
লাগে না মোর কিছুই ভাল,
দিন যে আমার কেটে এলো ।
না নিভিতে দিনের আলো , দেখতে পাব মা দু'নয়নে ॥

(ভবারগীতিমালা,২য় খণ্ড, পৃ.১৭)

'আসা-যাওয়ার' এই চিরন্তন খেলার পিছনে রয়েছে 'রৌপান্তরিক গতি-তত্ত্ব'। মানুষের চিন্তাভাবনার অন্তরালে বসে বিধাতা এ অদ্ভুত কর্মটি নিয়ন্ত্রণ করে চলেছেন । তাই অনেক পন্ডিতব্যক্তি এর অপব্যাখ্যা করে বলেন , যেহেতু এই বিশ্বসৃষ্টির সবকিছুই স্রষ্টার নিয়ন্ত্রাধীন; অতএব আমরা যা কিছু করি মূলতঃ তিনিই করান । সৃষ্টি উপলক্ষ মাত্র । তাই এই বিশ্বসংসারের পাপ-পূণ্য , ভাল-মন্দ,ন্যায়-অন্যায় কোনটার জন্যই মানুষকে দায়ীকরা যাবে না । অর্থাৎ, পৃথিবীর এই যে, মারামারি, কাটাকাটি, লুটপাট, রাহাজানি, ধ্বংসযজ্ঞ -এ সবই বিধাতার কাজ : ভবাপাগলা বলছেন -তা ঠিক নয় । এ বিশ্ব প্রকৃতি, বিধাতার নিয়ন্ত্রাধীনতো বটেই-অধিকন্তু বিচারাধীনও । বিধাতা মানুষকে পৃথিবীতে পাঠানোর সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণের জন্য, পাপ-পূণ্য,ভাল-মন্দ,ন্যায়-অন্যায় বুঝে চলার জন্য,বিবেক, বুদ্ধি জ্ঞান সবই দিয়ে পাঠিয়েছিলেন : মানুষ তা কতটুকু কাজে খাটাতে পেরেছে তা যাচাইয়ের জন্যই একদিন তাকে বিধাতার নিকট ডেকে পাঠানো হবে । ন্যায় বিচারকারী স্রষ্টা—তাঁর কাছে কোন ফাঁকিঝুকি চলে না ।

Dhaka University Institutional Repository

যাবে যাবে আর আসা হবে না,
মানব জীবন তো আর পাবে না ।
ভেবেছ মনে, এই ভুবনে,
তুমি যাহা করে গেলে - কেউ জানে না ॥

তুমি যাহা করে গেলে, আসিয়া হেথা,
চিত্রগুপ্ত লিখে রাখিল খাতা ।
বিচার করিবেন , ওই বিধাতা,
ফাঁকি ঝুঁকি তাঁর কাছে কিছু চলে না
... ...

সাবধানে চল মন, হও হুঁশিয়ার,
বেলাতে ডুবিয়া যায় আসে অন্ধকার ।
মানুষই দেবতা হয়, হয় শয়তান,
ভবা কয় চোখ মেলে চেয়ে দেখনা ॥

(সঙ্গীত সংকলন, গান নং ১৪১)

চিত্রগুপ্ত, যিনি মানবের তথা সমস্ত জীবের পাপ,পুণ্য, [illegible] হিসাব রক্ষক অর্থাৎ যমরাজ । তিনি প্রতিদিন আমাদের জীবন কর্মের হিসাব নিকাশ করছেন মৃত্যুর পর এই হিসাব-নিকাশ পত্রটি, জমা হবে বিধাতার কাছে । বিচারের সময় তিনি এই খাতা দেখেই রায় দেবেন । অতএব, হুঁশ হুশিয়ার-সাবধান মিথ্যা,কপট-আচরণ, যেহেতু বিধাতার কাম্য নয়; অতএব, সকলের উচিত সত্যকে অনুসরণ করা ।

Dhaka University Institutional Repository

ভবাপাগলা তাঁর গানে সকলকে সত্যানুসরণের পরামর্শ দিয়েছেন ।

কইতে নিত্য সত্য কথা,
এতে যদি হয় তোর মরণ,
অমর কুলে রইবি গাঁথা ।

সত্যের জয় চিরকাল,
মতুকালে ভাঙ্গে না হাল ।
ছুবন খেয়েও বাঁচে তারা,
তাদের জীবন যায় না বৃথা ।।

(সঙ্গীত সংকলন, গান নং ১১৪)

তাদের জীবন বৃথা যায় না - তা ঠিক । কিন্তু কথা হল যে, সত্য পথ অনুসরণ করতে বললেই কি মানুষ সত্য অনুসরণ করতে পারে ? সত্যানু-সরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা দরকার।এ কাজটি যে কঠিন সেকথা ভবাপাগলাও জানিয়েছেন তাঁর গানে, --

(ওরে ভাই) সত্য পথে হাঁটা হ'ল দায় ।
হিংসার কাটা রাস্তা ঘাটে, কাঁটা ফুটে পায় ।।

কারো ভাল, কেউ দেখতে নারে,
এতে পরান আর বাঁচে নারে ।
কতশত,অনাহারে,
কেউ পেটটা ভরে কত খায় ।।

(সঙ্গীত সংকলন,গান নং ১৫৭)

Dhaka University Institutional Repository

এত সামান্যেই সব শেষ নয় । সেখানে আরও আছে, --

মিথ্যার কান্ড, মিথ্যা আলাপ,
এ যেন সব জ্বরের প্রলাপ ।
(ঐ শেষাংশ)

এই জ্বরের প্রলাপ একদিনে এবং মুখের কথাতেই যাবার নয় । তার জন্যে সাধনার দরকার । জন্মের প্রারম্ভ থেকে মৃত্যুক্ষণ পর্যন্ত সে সাধনার পরিধি হওয়া উচিত । মোটকথা চরিত্র গঠনই এর একমাত্র আসল উপায় । ভবাপাগ্লার গানের ভিতর সেই চরিত্র গঠনের পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে সহজ করে ।

401269

পরের দোষটি ধরতে যেও না ভাই,
নিজে কেমন আগে এইটা, করবে যাচাই ।
দেখবে তখন, তোমার মনটি, বাবলা গাছের ছাই ॥

দোষীর মধ্যেও দেখতে পাবে তোমার আপন জন ।
জ্বলবে তখন মন আগুনে, দগ্ধ হুতাসন ।
সেইটা হবে মহাশাস্তি(আর) ক্ষমার উপায় নাই ॥
(সঙ্গীত সংকলন, গান নং ১৩৮)

সদা পরের দোষ খুঁজে বেড়ানো, ভবাপাগ্লার চিন্তাধারা-অনুসারে এটি একটি ক্ষমাহীন অপরাধ । ভক্তদের উপদেশ দিতে গিয়ে বলতেন, 'হিংসানিন্দা পাপ নয়-মনের ময়লা', মন থেকে ধুয়েমুছে ফেললেই চলে গেল।'

Dhaka University Institutional Repository

ভবাপাগলার গানে আমরা সমাজ মানসিকতার প্রতিফলন দেখতে পাই। সমাজসংস্কার-চেতনা তাঁর চিন্তাধারার আর একটি দিক লক্ষ্য করা যায় তাঁর গানে। ভবাপাগলার জন্ম জমিদার বংশে হলেও প্রচলিত হিন্দু সমাজের চোখে তার স্থান খুব একটা উপরের তলায় ছিল না ব্রাহ্মণ্য সমাজপতিদের চোখে তিনি ছিলেন চতুর্থ সম্প্রদায়ভুক্ত (প্রথম-ব্রাহ্মণ, ২য় ক্ষত্রিয়, তৃতীয় বৈশ্য, চতুর্থ শূদ্র)। স্বভাবগত কারণেই তিনি ব্রাহ্মণদের তেমন মাথায় তুলে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না। তারপর নিজ হাতেই কালী-পূজা করেন। জাত পাতের বালাই মানেন না। হিন্দু মুসলমান, ইতর ভদ্র সবাইকে টেনে মন্দিরে নিয়ে যান। প্রভৃতি দেখে এ দেশে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় এক সময় তাঁর বিরুদ্ধে প্রচন্ডভাবে ক্ষেপে গিয়েছিল। ছুঁলেই জাত যায় যে ধর্মের, সে ধর্মের অনুসারীদের উদ্দেশ্য করে তিনি লেখেন,--

> ছুঁলেই জাত যায়, (এ) ছোঁয়াচে রোগ মরলনা হায়।
> ভুক্তভোগী, এমন রোগী, বহু বহু দুনিয়ায়।
> সূর্য্য-চন্দ্র, আকাশ বাতাস, সবার জন্য এদের প্রকাশ,
> বিলায় কিরে জাতটি ধরে।
> (সঙ্গীত সংকলন, গান নং ২০৩)

তাই ভবাপাগলা সবাইকে মনের ময়লা দূর করে দিয়ে প্রকৃত ঠাকুর পূজায় মনোনিবেশ করতে বলছেন। তাঁর অন্তরের বিশ্বাস ঠাকুর ভাতের হাঁড়িতেও যেমন নেই - মন্দিরেও তেমন থাকেন না। মনের ঠাকুর মনেই তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়।

পৃথিবীর অনেক বড় বড় সাধকের জীবন পর্যালোচনা করে দেখা গেছে তাঁরা আধ্যাত্মিক সাধনায় এত বেশী মেতে থাকেন যারফলে পৃথিবীর অনেক

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ই তাঁদের চিন্তায় স্থান পায়নি । ভবাপাগলা সেই বিরল সাধক-কুলের অন্যতম হয়েও বৈষয়িক বিষয়াদিকে উপেক্ষা করেননি । তিনি জানতেন , সংসারে যখন এসেছি কাজেই সংসার করতে হবে । আর সংসার মানেই তো অর্থভাবনা - উপার্জনের খাতায় নিজেকে নাম লেখানো । এ প্রসঙ্গে ভবাপাগলার লেখা একটি অভিজ্ঞতার কথা তুলে দেওয়া হল :

"সন্ধ্যার বাজারে দোকানিদের নিকট হইতে, কত বাকী আনিয়া সংসার চালাই. দোকানদার আমাকে, তীব্র তাগাদা করে, আমি, অম্লান বদনে, তাহা সহ্য করিয়া হাসিয়া ফেলি, আমার আপন মনে । কভু আবার চটিয়াও যাই (জলের দাগের মত রাগ) কিন্তু তাহারা বোঝে না, কেন ভবাপাগলা, তাদের দিনের পর দিন টাকা থাকিতেও টাকা দিতে দেরী করিয়া দেয় । আমি বেশ বুঝি যাহারা পাওনাদার, তাহারা কোনদিনও, আমার মা, আনন্দময়ীকে দেখিতে আসে না । কিন্তু টাকা পাওনা হিসাবে, অনিচ্ছা সত্ত্বে আসিয়া, দেখিয়া যায় আমার, আনন্দময়ী মাকে । আমার তখন কি, আনন্দ হয় । আচ্ছা, বলুন তো, আমি তাদের উপকার করি, না ক্ষতি করি ? যেই সমস্ত টাকা পরিশোধ হইয়া গেলে , আর ভুলেও , কোনদিন এমুখে আসে না। তাই ভাবি চমৎকার বিধির বিধান, সংসার ।" (পরম গুরু ভবাপাগলাঃ ১মখন্ড, আমতা পর্ব, পৃ. ১৭৬)। টাকার বাস্তব ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা যে আরও কত প্রচন্ড -তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর গানে । তাইতো টাকাকে উদ্দেশ্য করে তিনি লেখেন,--

টাকারে তোর বেজায় বড়, বড় সম্মান ।
স্বর্গের যত ঠাকুর-ঠুকুর, হারমানিল ভগবান ।।

Dhaka University Institutional Repository

চোর ডাকাতের হানা হত,
টাকার লোভে মানুষ হত ;
টাকায় হারায় বুদ্ধি যত,
কারুর রাখে না কুলমান ।।

সাধু, গুরু, বৈষ্ণব আদি,
টাকার বশ ঐ অনাদি ।
মরা গাঙ্গে ক্ষীণ নদী,
টাকার বাঁধে ডাকে বান ।।

ভবাপাগলা টাকার তরে
ভিক্ষা করে প্রতি দ্বারে ।
মাতৃনাম গানের সুরে,
শীতল করে সবার প্রাণ ।।

(সঙ্গীত সংকলন, গান নং ১৩১)

সাধু, গুরু বৈষ্ণব - যাই আজকাল টাকার বশীভূত । ভবাপাগলা এও বলতেন - শিষ্য টাকার কুমীর হলে - গুরু প্রথমেই তার বাড়ী গিয়ে উঠেন । অর্থাৎ বর্তমান বাজারে টাকার সম্পর্কই যে বড় সম্পর্ক; স্নেহ প্রেম, ভালবাসা, ভক্তি শ্রদ্ধা এবং টাকার মানদন্ডের কাছে অলীক-সেকথাই ভবাপাগলা লোককে হাসি-ঠাট্টা গল্পের ছলে বুঝাতে চেষ্টা করতেন । এইরূপ একটি রসগান নিম্নে দেওয়া হল, ---

টাকায় বৌ ঘরে আনে, সঙ্গে আনে ফাও ।
বৌ ছাড়িয়া শালী ধরে, আর কি মজা চাও ।
দিন দুপুরে তারা দেইখ্যা, ঝাঁপ দেয় কূপের জলে ।।

Dhaka University Institutional Repository

টাকা যদি হাতে পায়,
পায়ের উপর পা নাচাও ।
তারে পায় কোন্ শালায়,
কাঠের ঘোড়া হুকুমে চলে ॥
(সঙ্গীত সংকলন, গান নং ১৩০)

সুতরাং ভবাপাগলার গানে টাকা সম্পর্কে যে চিন্তাধারা ভবা, প্রকাশ করে গেছেন, তার মর্মার্থ হল এই যে, সংসারে জীবন ধারণের জন্য টাকার গুরুত্ব রয়েছে, কিন্তু তা যেন কোন ভাবেই অতিরিক্ত না হয় । সঞ্চয় করা তাঁর না পছন্দ । সঞ্চয়ের কথা বললে তিনি বলতেন, 'সঞ্চয় করবো কাহার জন্যে।' এর উত্তরে আমরা হয়তো বলবো, সঞ্চয় ভবিষ্যতের জন্যে। ভবিষ্যতের অভাবের জন্যে, আমরা সঞ্চয় করে থাকি । বিশেষ করে বার্ধক্যে আমাদেরকে যাতে অর্থাভাবে পড়তে না হয়, সন্তান-পরিজনদের গলগ্রহ হয়ে না মরতে হয় সেজন্যে । আবার অনেকের জন্যে এই সঞ্চয়ের প্রবণতাটা একটা নেশা - সে কারণেও । যত উদাহরণই দেই না কেন, আধ্যাত্মিক পুরুষেরা কিন্তু তা মানেন না । সঞ্চয় বিষয়ে তাদের চিন্তাধারা সম্পূর্ণ ভিন্নধরণের । সঞ্চয় সম্পর্কে ভবাপাগলার যে চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর গানে, তা হলো,-

দেখছি কত সঞ্চয়কারী,
যাওয়ার দিন যায় নিঃ ভিখারী ।
সঙ্গে নেয় না কানাকড়ি, মায়া কাঁদা কাঁদে অন্যে।।
(সঙ্গীত সংকলন, গান নং ২০৮)

এত কিছুর পরও, ভবাপাগলা তাঁর চিন্তাচেতনা থেকে মাতৃভূমির স্মৃতিকে সরিয়ে দিতে পারেননি । সংসারে ইহলোক ও পারলৌকিক কর্মের ফাঁকে দেশের কথা, দেশের আকাশ-বাতাস-প্রকৃতি, মানুষের কথা ভাবতেন ভবাপাগলা। তিনি জীবনের অপরাহ্নকাল পশ্চিমবঙ্গে অতিবাহিত করলেও মন পড়ে থাকত

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের আমতা গ্রামে । একটি গানের লেখক ভবাপাগলা বাংলাদেশকে নিয়েও গান লেখেছেন,--

(শুন) আমার বাংলাদেশের কথা ।
(এমন) খোলা মাঠ, খোলা প্রাণ, এমন নাই আর কোথা ।।

নাইকো কোন হিংসাদ্বন্দ্ব,
স্নেহময় মধুর সম্বন্ধ ।
নাইকো অলস বৃথা দ্বন্দ্ব, (সবাই) স্নেহের ডোরে গাঁথা।।
(সংগীত সংকলন, গান নং ১৯০)

ভবাপাগলা তাঁর মাতৃভূমিকে যে কত ভালবাসতেন, তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায়, ১৯৭৩ সনে গড়পাড়ার শ্রীচুনীলাল ঘোষকে লেখা চিঠি পড়লে । উক্ত পত্রে অন্তরের শেষ আকুলতার কথা ব্যক্ত করে গেছেন চুনীলালের কাছে । চিঠির বর্ণাক্ষরগুলি এই — "ভাদ্র মাসের মাঝের দিকে বাংলাদেশে আসিবো, বাস করিবো আমতা গ্রামে । বাণপুর, দর্শনা হতে সবাই আমাকে এগিয়ে লইও । আমি আনন্দ পাবো । তোমাদের কাছে কিছু দিন থাকিবো ।" শারীরিক অসুস্থতা এবং রাজনৈতিক কারণে ভবাপাগলার আর বাংলাদেশে আসা সম্ভব হয়নি ।

আমরা ভবাপাগলার গানে তাঁর চিন্তাধারার সূত্রগুলি উল্লেখ করেছি । তাঁর চিন্তার জন্ম হয়েছিল এ দেশের মাটিতে বসেই । তাঁর ভাটিয়ালী ও অন্যান্য গানে নদী, মাটি ও মানুষের কথা বিধৃত হয়েছে । গানগুলি মানে ও গুণে এমনই বৈশিষ্ট্য ধারণ করে যা একজন সাধকের অন্তর উপলব্ধি থেকেই জাত, সমধর্মী লোকসঙ্গীত থেকে তাকে সহজে আলাদাভাবে দেখা যায় ।

-------0-------

Dhaka University Institutional Repository

শক্তি সাধনা ও মাতৃসংগীত

ভারতীয় সাধনার ইতিহাস বিচারে শক্তি সাধনার ইতিহাস অত্যন্ত সু-প্রাচীন ; পক্ষান্তরে শাক্ত সংগীত বা মাতৃ সংগীতের ইতিহাস অতি নবীন। ডঃ শশীভূষণ দাশ গুপ্তের মতে, "বিভিন্ন যুগে কিছু কিছু হিন্দু এবং বৌদ্ধ দেবীমূর্তি প্রাপ্ত হইলেও বৈশিষ্ট্যরূপে শাক্তধর্মকে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বাঙলা-দেশে একটি গৌণ-ধর্ম বলিয়াই মনে হয়, তবে দেহকে অবলম্বন করিয়া এবং শক্তিকে অবলম্বন করিয়াও তান্ত্রিক সাধনা এই যুগের মধ্যে একটি বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ছিল।"[১] সুতরাং বলা যায়,- "এদেশে মাতৃ আরাধনার প্রথাটি অনাদি কালের। বেদে, তন্ত্রে, দর্শনে, পুরাণে একাধিক স্থলে বলা হইয়াছে দেবীই, 'প্রথমা', 'আদ্যা', 'নিত্যা', শাক্ত পদাবলীতে আছে তিনি 'আদিভূতা সনাতনী'।"[২] ঐতিহাসিকগণের ধারণা, ভারতের আদিম জাতি বা আদিবাসীরাই এই মাতৃদেবতার প্রথম উপাসক। এখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠতে পারে,-- এই আদিম অধিবাসী ছিলেন কা'রা ? ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায়, আর্যদের আগমনের আগে এই উপমহাদেশে বাস করত, অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, নিগ্রোবটু ও মোঙ্গলীয়রা। প্রভাতকুমার চক্রবর্তীর অভিমত, "নিগ্রোবটু জাতির তেমন কোন চিহ্নই আজ আর নাই, সম্ভবতঃ এই জাতি, অষ্ট্রিক জাতির সহিত এক হইয়া গিয়াছে। কোল, ভীল, সাঁওতাল, রূপে অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর উত্তরাধিকারীরা আজও বর্তমান। ইহাঁরাই মাতৃ উপাসক। পর্বতে অরণ্যে - ইহাদের বাস, জীবিকা শিকারও কৃষিকার্য্য। ·········আর্য্য পূর্ব জাতিদের ভিতর শিক্ষায় -দীক্ষায় সর্বাপেক্ষা সমুন্নত ছিলেন দ্রাবিড় জাতি। একদিন সমগ্র ভারত বর্ষে, তাঁহাদের একাধিপত্য ছিল। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত

Dhaka University Institutional Repository

বেলুচিস্তান (ব্রাহুই) হইতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত প্রদেশ আসাম পর্যন্ত এবং হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা, এমনকি সিংহল পর্যন্ত ইহাদের অধিকার বিস্তৃত ছিল। পুরাতত্ত্ববিদ-পন্ডিতগণ বলেন, মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার কীর্তি এই দ্রাবিড় জাতির।"[৩]

ঐতিহাসিক মার্শাল এবং ফাদার হেরাশ সহ সকল গবেষক একমত যে, সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার স্রষ্টারা ছিলেন মাতৃ উপাসক। তাঁদের মধ্যে যোগ-সাধনা ও মাতৃ উপাসনা প্রবল ছিল।

"মোঙ্গল বা তিব্বতীয় চীন জাতিও ছিল মাতৃতান্ত্রিক। অর্বাচীন মোঙ্গল জাতির আদি জননী এক বিধবা নারী: The Soberest story on record that their anscestor Budantsar was miracutously conceived of a Mogal widow ,(Encyclo ,Britannica) ; অতএব, ইহারাও মাতৃতান্ত্রিক।"[৪]

বাংলাদেশে দ্রাবিড় জাতির সাথে এই মোঙ্গল জাতির একটি সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। এই জন্য এই দেশে মাতৃসাধনার ইতিহাসে মোঙ্গলীয়দের প্রভাব অপরিসীম। কারো কারো ধারণা, বাংলাদেশের মঙ্গলচন্ডী মোঙ্গলদের উপাস্য দেবতা ছিল।

তার পরের যে ইতিহাস, ভারতবর্ষে আর্যদের আগমনের ইতিহাস। বেদে আর্যদেরকে যে ভাবে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা থেকে বুঝা যায়, আর্যসমাজ ছিল পুরুষ শাসিত সমাজ। সেখানে রমনীদেরকে পুরুষদের চাইতে অত্যন্ত দুর্বল চিত্র অনুদার করে দেখানো হয়েছে। "ঋগ্বেদে দেবতাগণের মধ্যে প্রধান ইন্দ্র, সূর্য, মরুৎ, দ্যৌ, বরুণ, অগ্নি। ইহারা পুরুষ, এক একজনে অসীম শক্তিধর।

Dhaka University Institutional Repository

ইহাঁদের তুলনায় স্ত্রীদেবতা একান্ত নিষ্প্রভ। পুরুষের স্ত্রী, দয়িতা এবং কন্যারূপে প্রতিষ্ঠা। সরস্বতীকে যদিও অম্বিতমে; দেবীতমে' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে তথাপি তিনি সরস্বান নদীর পত্নী, দেবনদী বিশেষ। পৃথিবীমাতা দৌষ্পিতার পত্নী। রাত্রিও উষা 'দুহিতাদিব' অর্থাৎ বরুণের প্রিয়া।"[৫] অথর্ববেদ, উপনিষৎ, বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শনে দেবীর মাহাত্ম্যের বর্ণনা দেয়া আছে। কেউ কেউ, অথর্ববেদকে শক্তিপূজার মূল উৎস বলে চিহ্নিত করে থাকেন। পুরাণে মাতৃদেবীর আদর্শ প্রচার করা হয়েছে। এক কথায় বলা যায়, হিন্দু পৌত্তলিকতাবাদের সূচনা এখান থেকেই। পুরাণে শাক্ত সাধনার প্রভাব যে কত প্রকট, সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে শ্রীমহেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী বলেন, - "পুরাণগুলিতে মাতৃকাশক্তির অধিক প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও শক্তি পুরাণের প্রধান প্রতিমা। কিন্তু সর্বত্রই শক্তির একচ্ছত্র প্রভাব। ব্রহ্মার শক্তিরূপে তিনি ব্রহ্মাণী, বিষ্ণুর শক্তিরূপে বৈষ্ণবী শক্তি, শিব শক্তিরূপে তিনি শিবানী। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের প্রতীক যথাক্রমে তিন শক্তি সরস্বতী, লক্ষ্মী ও কালী। পুরাণগুলিতে শক্তির একচ্ছত্র প্রভাব। অন্য পুরাণের কি কথা, শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে গোপীরা 'কাত্যায়নী' দেবীর পূজা করিয়াছিল। মার্কেণ্ডেয় পুরাণে, দেবীভাগবতে, কালিকাপুরাণে মাতৃদেবীই সার্বভৌম সম্রাজ্ঞী।"[৬]

বৌদ্ধধর্মের মধ্যেও আমরা শক্তিবাদের উল্লেখ পাই। যেমন, আমরা জানি যে, মহামতি গৌতমবুদ্ধ ছিলেন, বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর তিরোধানের পর তাঁর ধর্মমতকে কেন্দ্র করে দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি হীনযান এবং অপরটি মহাযান সম্প্রদায়। হীনযান সম্প্রদায় বুদ্ধদেবের আচার- আচরণ, বাণী, এগুলিকে যথাযথ অনুসরণ করার চেষ্টা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু মহাযান সম্প্রদায় অপেক্ষাকৃত উদার মতাবলম্বী বলেই হিন্দুদের অনুসরণে বৌদ্ধধর্মেও বিবিধ দেব-দেবীর পূজা, তন্ত্রাচার প্রভৃতি স্বীকার করে নেন। "তাঁহার ফলে বুদ্ধ, বুদ্ধের প্রধান শক্তি হিসাবে, তারা প্রভৃতি ধ্যানীবুদ্ধ ও তাহাদের বিভিন্ন শক্তি দেব ও দেবতারূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং তাহাদের পূজা পদ্ধতি হিসাবে এই মহাযান শাখার অন্তর্ভুক্ত বজ্রযানীদের মধ্যে বহু তন্ত্র-গ্রন্থ রচিত হয়। এই তন্ত্রগুলি হিন্দুতন্ত্রের মতই সংস্কৃত ভাষায় রচিত এবং পূজার মন্ত্র, যন্ত্র(মণ্ডল) জপ ও হোমের নির্দেশে পূর্ণ।"[৭] ডঃ শশিভূষণ দাস গুপ্ত 'বৌদ্ধদেবী' নিবন্ধে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন এভাবে, "বৌদ্ধ দোহা ও গীতি গুলির মধ্যে আমরা এক 'দেবী'র উল্লেখ দেখিতে পাই, এই দেবী নৈরাত্মা, নৈরামণি, ডোম্বী, চণ্ডালী, মাতঙ্গী, শবরী প্রভৃতি নানারূপে অভিহিত: সাধনতন্ত্রের মধ্যে এই দেবীকে রূপকচ্ছলেই ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে; কিন্তু সেই ব্যাখ্যাদ্বারা সিদ্ধাচার্যগণের মনঃ সংগঠনের সবখানি পরিচয় পাওয়া যায় না। তৎকালে প্রচলিত ভারতীয় দেবীতত্ত্ব বা শক্তিতত্ত্বের সহিত এই বৌদ্ধদেবীর নিগূঢ় যোগ আছে বলিয়া মনে করি।"[৮]

এবার সাহিত্যের ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরানো যাক। বাংলা সাহিত্যে এই শক্তির প্রভাব অতুলনীয়। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন 'চর্যাগীতিকা'। হিন্দু-বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের রচিত গানগুলিতে দেবীকে ডোম্বী, চণ্ডালী, শবরী, শুণ্ডিনী রূপকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। মধ্যযুগের 'অনুবাদ সাহিত্যে', বিশেষ করে হিন্দু পৌরাণিক কাব্যগুলির অনুবাদে এই শক্তির মাহাত্ম্য বর্ণিত হতে দেখা যায়। অবশ্য 'মাহাত্ম্য' রচনার পিছনে একটি

Dhaka University Institutional Repository

প্রেক্ষাপটও কাজ করেছে। যেমন, মধ্যযুগের কবিদের দ্বারা অনূদিত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতসমূহের রচনা- পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মুসলমান সামন্তরাজারা। নিজেদের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য কাব্যরচনার নিমিত্তে কবিদেরকে প্রচুর অর্থ প্রদান করতেন। এবং একটি সময় বেঁধে দিতেন। কখনো কখনো এমনও ঘটেছে যে, কবিদেরকে রাজদরবারে আসারও অনুমতি ছিল না। নিরুপায় কবিগণ তখন কাব্য রচনার শক্তি সঞ্চয়ের জন্য দেবীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করতেন। কখনো বা রাজাকে বা নিজেকে শক্তিদেবীর বরপুত্র হিসেবে চিহ্নিত করতেন। তাই দেখা যায়, কৃত্তিবাসে যোগাদ্যার বন্দনা এবং দুঃখী শ্যামদাসের গোবিন্দমঙ্গলে গোপগণের হরগৌরীপূজা ও রুক্মিণীর চণ্ডীকাপূজার বর্ণনার কথা। দুর্গামঙ্গল নামে যে কাব্য তা রীতিমতো মার্কণ্ডচণ্ডীর অনুবাদ।

বৈষ্ণব পদাবলীর কবিদের মধ্যে এই শাক্ত-মতের প্রভাব মোটেই কম নয়। বরং অনেক দিক থেকে বেশী বলা চলে। বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের দু'জন বিখ্যাত কবি চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি; এঁরা উভয়েই ছিলেন, শক্তির উপাসক। চণ্ডীদাস, বড়ুচণ্ডীদাসের পদগানে নিজেদেরকে বাশুলীদেবীর উপাসক হিসেবে উল্লেখ করেছেন,--

আতুর সুখাত মোর কাহ্ন অভিলাসে।
বাসলী শিরে বান্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥[৯]

এবং

ফুলের ধনু, হাতে করি কাহ্ন
গেলা বৃন্দাবন পাশে।
বাসলী চরণ, শিরে বান্দিআঁ,
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥[১০]

Dhaka University Institutional Repository

তবে, সব চাইতে মজার বিষয় এই, চন্ডীদাস একজন 'শক্তিসেবক' ও অসাধারণ প্রতিভাধর পদকর্তা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর রচিত কোন শাক্তবিষয়ক গান পাওয়া যায়নি। বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব (১৪৮৬-১৫৩৩) এর, পর এই শক্তি সাধনার প্রভাব যেন অনেকটা কমে আসে। কারণ চৈতন্যদেব এসে শুধু নতুন ধর্মের প্রবর্তনই করেননি - ধর্মের সংস্কার এবং সমাজ সংস্কারকের ভূমিকাতেও অবতীর্ণ হয়েছিলেন। "অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, বিধবা বিবাহ প্রচলন, বহু বিবাহ রদ, সতীদাহ প্রথা দমন প্রভৃতি যে কটি সামাজিক আন্দোলন উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সামাজিক জীবনকে আলোড়িত করেছে, তার সবগুলিরই প্রাথমিক অস্তিত্ব শ্রীচৈতন্যের ধর্মীয় নানা আচরণ ও উপদেশের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।"[১১]

অপর দিকে ইতিহাস প্রমাণ করে যে, এতবড় একটি যুগধর্মের প্রতিষ্ঠাতার সমসাময়িক কালে তাঁর ব্যক্তি প্রভাবের কারণে বৈষ্ণবধর্মের যে জোয়ার বাংলা-দেশের অংশবিশেষকে প্রবল ভাবে, অধিকার করেছিল, তাঁর মহাপ্রয়াণের পর-তা স্তিমিত হয়ে আসে। এর মূল কারণ ছিল, উপযুক্ত দিকনির্দেশনার অভাব। তাই বলতে চাই, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবকালে, শক্তিধর্মের প্রসার খানিকটা কমে গেলেও তা ছিল সাময়িক। এ সম্পর্কে ড: সত্যনারায়ন ভট্টাচার্যের একটি মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত। তিনি বলেন, "শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম শাক্তধর্মের প্রভাবকে স্থান বিশেষ কমিয়ে দিলেও এবং এর প্রকাশকে কিছু পরিমাণে সাত্ত্বিকতামন্ডিত করলেও শাক্তধর্ম আপন অস্তিত্বে শুধু বলীয়ান ছিল না, বৈষ্ণবধর্মকে গ্রাস করারও আয়োজন আরম্ভ করে দিয়েছিল। তবে মধ্যযুগীয় বাঙালীর ধর্মীয় জীবনে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে শাক্তধর্মের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে বৈষ্ণবধর্মের আবির্ভাবের ব্যাপারটি কোন এসময়ই, ছোট করে দেখা যায় না।"[১২]

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম, শাক্তধর্মকে যে, নিঃশেষ করে দিতে পারেনি, তার প্রমাণ, ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে রচিত তন্ত্রগ্রন্থগুলি। ষোড়শ সপ্তদশ শতকে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে এই শাক্ত সাধনার বিষয়টি দারুনভাবে লক্ষনীয়। মঙ্গলকাব্যগুলি মধ্যযুগের সাহিত্যের ইতিহাসের কয়েক শ' বছর জায়গা জুড়ে রয়েছে। খ্রীস্টীয় প্রায় পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এই ইতিহাস বিস্তৃত। মনসামঙ্গলকাব্য, মঙ্গলকাব্যধারার আদি কাব্য হলেও, 'চন্ডীমঙ্গল' এ যুগের শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী সেই চন্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠকবি। তিনিও তাঁর কাব্যের ভূমিকাতে দেবীচন্ডীর বা আদ্যাশক্তির কৃপালাভের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে,

উরিয়া মায়ের বেশে, কবির শিয়র দেশে
চন্ডীকা বসিল আচম্বিতে ॥

তাছাড়া কালকেতুর অত্যাচারে পশুগণ যখন নিরূপায় অসহায়, তখন দেবীচন্ডীকে সহায়রূপে পাবার জন্য অসুরের ব্যাকুলতা প্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছে তারা। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য রচনার সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখেন, -- "বাংলার রাষ্ট্র এবং সমাজ জীবনের এই প্রকার বিপ্লবাত্মক যুগে এদেশে লৌকিক শাক্তধর্মের পুনরুত্থান হইয়াছিল। সমসাময়িক মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যদিয়া বাংলার এই বিশিষ্ট অধ্যায়ে চৈতন্যেরই বিকাশ হইয়াছে-বিভিন্ন প্রকৃতির লৌকিক শাক্ত দেবতাদিগের মাহাত্ম্য কীর্তন করাই এই মঙ্গল কাব্যগুলির উদ্দেশ্য ছিল।"[১৩] তিনি উক্ত গ্রন্থে আরও লিখেন,- "মধ্যযুগের বাংলার যে সামাজিক পরিবেশ হইতে বৈষ্ণব সাহিত্যের জন্ম হইয়াছিল, তাহা অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালীর সমাজ জীবনে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিল না। তুর্কী বিজয়ের ফলে যে সামাজিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়া বাঙালীর সমাজ-মানসে মঙ্গলকাব্য সৃষ্টির প্রেরণা জাগিয়াছিল, তাহাও সেদিন আর অবলুপ্ত ছিল না। সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীতে আসিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যের ধারা এবং শাক্ত সাহিত্যের

Dhaka University Institutional Repository

যায়া উভয়ই লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, ইহাদের প্রবাহ উনবিংশ শতাব্দীর ভিতর দিয়া অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইবার মত ইহাদের আর কোন শক্তি ছিল না।"[১৪] এমনই এক অবক্ষয়ের যুগে মাতৃসঙ্গীত নিয়ে রামপ্রসাদ সেনের বাংলা সাহিত্য-অঙ্গনে অনুপ্রবেশ। রামপ্রসাদ যখন মাতৃনামগানের সুর বাজিয়ে সাহিত্যাঙ্গনে প্রবেশ করেন, - তখন বাংলা সংস্কৃতি অঙ্গন এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছিল। রামপ্রসাদ সেনের শাক্তপদাবলীগুলি যে সময়ে রচিত, "সে সময়ে হিন্দু সমাজ কঠোর বিধিনিষেধের অধীন ছিল সেকালে কন্যার পিতা মাতা বিশ্বাস করতেন যে, কন্যাকে যোগ্য বা অযোগ্য যে কোন বরের হস্তে অর্পন করিলেই অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়। তখন সমাজে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল বলিয়া বিবাহিতা নারীমাত্রকেই সতীনের ঘর করিতে হইত। সেকালে বৃদ্ধ, বিত্তহীন, অবধূত বা অতিকুলে জামাতাকে কন্যা অর্পণ করিয়া কত মাতা-পিতাকেই না সারা বছর অশ্রু বিসর্জন করিতে হইত। আবার স্বামীর অনুমতি ভিন্ন কোন নারী স্বল্পকালের জন্যও পিতৃগৃহে গমন করিতে পারিতেন না।"[১৫] রামপ্রসাদ কর্তৃক রচিত, আগমনী ও বিজয়ার গান'গুলিতে এ সব চিত্র অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিধৃত হয়েছে। তাছাড়া তাঁর মাতৃসঙ্গীতগুলির মধ্যে জীবনের বাস্তব চিত্র যেভাবে ফুটে উঠেছে- তা, পূর্ববর্তী বৈষ্ণব পদাবলী ও মঙ্গলকাব্যগুলিতে দুর্লভ। রামপ্রসাদের গানের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে অধ্যাপক আব্দুল হাই এবং অধ্যাপক আহমদ শরীফ, মধ্য-যুগের বাংলা গীতিকবিতাগ্রন্থের ভূমিকায় লেখেন, "রাম প্রসাদের শ্যামা-সঙ্গীত এক সময় খুব জনপ্রিয় ছিল। তাঁর প্রসাদীসুর বাঙালিকে মুগ্ধ করেছিল।"[১৬]

বাংলা সাহিত্যে 'পদাবলী' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন দ্বাদশ শতকের কবি জয়দেব। তারপর মধ্যযুগের কবিদের রচনার সহায়ক হিসেবে এই 'পদাবলী' শব্দটি সংযোজন করে দেওয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তবে শাক্তপদাবলীর জন্ম কবে হয়েছিল সে নিশ্চিত করে বলা কঠিন। কিন্তু আধুনিক শাক্তপদাবলীর প্রবর্তক রাম প্রসাদ সেন সে বিষয়ে পন্ডিতেরা একমত । তাঁকে অনুসরণ করেই পরবর্তী মাতৃসঙ্গীতের ধারার প্রবর্তনা । কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, প্রেমিক মহেন্দ্রনাথ, গোবিন্দ চৌধুরী, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় , মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, দাশরথী রায় প্রভৃতি মাতৃসাধক কবিগণ এই ধারাকে সমৃদ্ধির আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন । ভবাপাগলার মাতৃসঙ্গীত, সেই সাধককুলের জন্য, এক নতুন প্রয়োজন । তাছাড়া ভবাপাগলা নিজেও সাধনার জগতে আপনাকে রাম প্রসাদ, কমলাকান্তের উত্তর সাধক হিসেবে দাবী করতেন । এরূপ দাবী সম্বলিত একটি গান নিম্নে উদ্ধৃত হল:

ক্ষ্যাপা বেটী ক্ষ্যাপার বুকে খেলছে কত যুগে যুগে ।
কত জনা ডাকছে তাঁকে, যার যেমন মনে লাগে ।।

বীরভূম   বামা ক্ষ্যাপার উপাসনায় ।
কুকুর ছানা সঙ্গে খেলায় ।
মরার হাড়ের কুঁড়েখানায়,,
শ্যামা নাকি থাকতো জেগে ।।

হালিশহর   রামপ্রসাদের গানের ছন্দে,
বেটী নাকি বেড়া বান্ধে ।
স্নানের ঘাটে বসে আনন্দে,
গান শুনাবি ওরে বেগে ।।

Dhaka University Institutional Repository

বর্ধমান — কমলাকান্তেরই ভজন,
শ্যামা মায়ের দু'টি চরণ ।
(একদা) দস্যু বেশে করে আক্রমণ,
অবশেষে, চরণে শরণ মাগে ॥

কামারপুকুর — রামকৃষ্ণ পরমহংসে,
শ্যামা সদা থাকতো মিশে ।
ভাগ্নে হৃদের চোখে ভাসে,
(এ যে) মামা নয় মোর, শ্যামা আগে ॥

নাটোর — রাজা রামকৃষ্ণের কথা,
যা ছিল তার হৃদে গাঁথা ।
শ্যামা বলতো যথা তথা,
শুন রামা, তোর দোহাই লাগে ॥

মেহের — সর্বানন্দ অধিকারী,
পূর্ণা দা তার সহায়কারী ।
শ্মশানে জাগে শঙ্করী,
পুনর্জন্ম তাঁর অনুরাগে ॥

পাবনা — কীর্তখোলার রক্ষকৃষ্ট মা
(মা গো) যে করেছিল তোর ভরসা ।
সুরাপানে, গুরু করে জিজ্ঞাসা,
(তাই) সুখ দেখায় মায়ের ভোগে ॥

Dhaka University Institutional Repository

কুমিল্লা মনোমোহন আর আতাউদ্দিন
যাকে তাকে তারা চিনিদিন ।
নব বাবু মিলনে যে তিন ,
(তাই) ত্রিনয়নী রয় সমান ভাগে ॥

গ্রাম আমতা ভবাপাগলা গানের ছলে,
তত্ত্ব পাবে যাচ্ছে বলে ।
যা বাকি তার মাটি তোলে,
নিশায় বয় রে দিবাভাগে ॥[১৭]

ভবাপাগলার প্রথম দিকের অনেকগুলি গান আমরা পাই যা মূলতঃ রাম-প্রসাদকে অনুসরণ করে লেখা ; যেমন, --

এসমা কালী, শুনমা বলি,
আমার প্রাণের বেদনা ।
লাগেনা ভাল কি যে করি,
তুমি আমায় বলনা ॥[১৮]

ঠিক এই একই ভাবের প্রতিফলন আছে রাম প্রসাদের গানে, --

(আমার) সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল,
সকলি ফুরায়ে যায় মা ।[১৯]

Dhaka University Institutional Repository

এখন থেকে প্রায় দু'শ বছর আগে রাম প্রসাদ (১৭২৩-৭৫ খ্রীঃ) গেয়ে শুনিয়েছিলেন, 'এবার কালী তোমায় খাব'; ভবাপাগলা তাঁর অনেক পরে প্রত্যুত্তরে গেয়ে গেলেন ,--

মা গো এবার পেটটি ভরে খেয়েছি,
নাই কো আমার ক্ষুধার জ্বালা, তাকে লুন্ট করেছি ।[২০]

ভবাপাগলার গানে, রামপ্রসাদ সেনের গানের প্রভাব যে কত, তা নিম্নলিখিত গানগুলি থেকে উপলব্ধি করা যায় ।

ক. মা আমার খেলান হলো ।
খেলা হলো গো আনন্দময়ী ।।—রাম প্রসাদ ।
তোমায় আমায় ওগো কত খেলাই হ'ল ।
—ভবাপাগলা ।

খ. বড়াই কর কিসে গো মা,
জানি তোমার আদিমূল ।—রামপ্রসাদ ।
মা তোর গুষ্ঠির খবর কুষ্ঠি দেখে,
চিনে ফেলেছি । —ভবাপাগলা ।

গ. সে কি শুধু শিবের সতী । - রাম প্রসাদ ।
সতী নারী পতির বুকে রয় । — ভবাপাগলা ।

ঘ. আমি হব না তীর্থবাসী,
মরব গলে দিয়ে তোর নামের ফাঁসি । —রাম প্রসাদ ।

তীর্থে আমি যাব না মা,
তোর পদতলে পড়ে রব । — ভবাপাগলা ।

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. মরলেম ভূতের বেগার খেটে । —রাম প্রসাদ ।
খেলে জবার সনে কাছ নিলিমা পাঠায়ে । —ভবাপাগলা ।

আবার বিপরীতমুখী ভাবনারও অবকাশ ঘটেছে । যেমন, --

ক. আমায় দেও মা তবিলদারী । — রাম প্রসাদ ।
আমার কন্ঠে গাহিতে দিও গান । — ভবাপাগলা ।

খ. মন রে কৃষি কাজ জান না । — রাম প্রসাদ ।
যদি কাজ করবি, আয় শ্যামামায়ের কারখানায় । —ভবাপাগলা ।

গ. হুঙ্কারে সংগ্রামে ওকে বিরাজে বামা । — রাম প্রসাদ ।
হুঙ্কারে নাচে কালী, অসি ধরিয়া হাতে । — ভবাপাগলা ।

ঘ. তবে আর জন্ম হবে না,
ধবে না জননী জঠরে । — রাম প্রসাদ ।

মা আমাকে নূতন করে সাজাবে আবার,
মৃত্যু শেষে পুনর্জন্ম মাতৃনাম করিতে প্রচার ।। --ভবাপাগলা

রাম প্রসাদ সেন এবং ভবাপাগলার মাতৃসঙ্গীত সাধনার প্রধান মৌলিক সাদৃশ্য ছিল এই, উভয়েই ছিলেন গায়ক এবং সাধক । নিজেরা মাতৃসাধনায় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, কালীকে মাতৃ বা কন্যা জ্ঞানে পূজা-অর্চনা করতেন, গান রচনা করতেন, সুরারোপ করতেন; আবার সকলকে গেয়ে শুনিয়ে মুগ্ধ করতেন।

Dhaka University Institutional Repository

সাধক কমলাকান্ত নিজেও গান রচনা করেছেন । রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বা বামাক্ষ্যাপা নিজে সঙ্গীত রচনায় মনোনিবেশ করেননি বটে , কিন্তু রামপ্রসাদ ও অন্যান্য সমসাময়িক কবিদের রচিত মাতৃসঙ্গীতগুলি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত গান করতেন । ভবাপাগলার 'প্রসাদী সুর' ছিল খুবই প্রিয় , এবং প্রসাদীসুরে তাঁর অনেক গান রয়েছে ।

তেমনি কমলাকান্তের অনেক গানের ভাব ও বাণীর সঙ্গে ভবাপাগলার গানের যথেষ্ট মিল লক্ষ্য করা যায় ।

ক.
শ্যামা আমার কালো কে বলে,
অরে মন । কি বল ॥ —কমলাকান্ত *।
আমার কাল মেয়ে,কাল মেয়ে,কাল মেয়েই ভালরে॥
—ভবাপাগলা ।

খ.
এত দিনে জানিলাম, দয়াময়ী কালী গো ,
কাতর দেখিয়ে দীনে দরশন দিলি মা ॥ —কমলাকান্ত ।

মাগো ভবে আমার কেউ নাই,
আর, দয়াময়ী তুমি বিনে । —ভবাপাগলা ।

গ.
আর কিছু নাই সংসারের মাঝে,
কেবল কালী সার রে । —কমলাকান্ত ।

তুমি কারে ভাব আপন, ওরে ভোলামন,
দিন গেল ভাবিলি না শ্যামা মায়ের রাঙা চরণ॥
— ভবাপাগলা ।

---

* শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সংগৃহীত কমলাকান্তের পদাবলী থেকে গানগুলি চয়ন করা হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. কালী জয়, কালী জয়, করাল বদনা জয়,
হেই মন বদনে বলনা ।—কমলাকান্ত ।

কালী বল, কালী বল, মনটি আমার । —ভবাপাগলা ।

ঙ. শিব হৃদে নাচিতে নাচিতে চিকুর এলুলো,
প্রেমাবেশে শ্যামাতনু অবশ হইল ।— কমলাকান্ত ।

শিবেরে কি শিবে তুমি শিশিবে গো — চরণ দিয়ে।
— ভবাপাগলা ।

'কালো মেয়েকে' নিয়ে নজরুলের বেশ কতকগুলি কালীকীর্তন রয়েছে ।

ক. আমার কালো মেয়ে রাগ করেছে,কে দিয়েছে গালি,
(তারে) কে দিয়েছে গালি ।*

খ. (আমার)কালো মেয়ে পালিয়ে বেড়ায় , কে দেবে তায় ধরে ।

গ. আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায়, দেখে যা আলোর নাচন ।

ভবাপাগলাও কালো মেয়েকে নিয়ে গান লিখেছেন ;

ক. কালো মেয়ে মেঘলা বরণ, চুল এলিয়ে বসে ।

খ. একটি মেয়ের কথা শুনেছি
তার রঙটি কালো নাচে ভালো,
শ্বেত পদ্মে নাচে কেবল,
তাই হৃদি পদ্ম পেতেছি । প্রভৃতি ।

* আব্দুল আজীজ আল-আমান - কর্তৃক ভূমিকা সম্বলিত, "নজরুল গীতি অখণ্ড,কলিকাতা, ১৯) থেকে গানগুলি সংগৃহীত ।

Dhaka University Institutional Repository

মোট কথা, শাক্তপদাবলীর জগতে শ্রীরামপ্রসাদ যে স্রোতধারা সৃষ্টি করেছিলেন, কমলাকান্তের ভিতর দিয়ে তা পরিপুষ্ট হয়ে নজরুল, ভবাপাগলা প্রমুখ কবির লেখনী স্পর্শে তাআরও সমৃদ্ধ ও প্রসারিত হয়। রামপ্রসাদের শাক্ত পদাবলী এবং তাঁর অনুসারীদের গানের মধ্যে সাযুজ্যের কারণ এই রামপ্রসাদের গানগুলির মধ্যে 'বাস্তব জীবন জিজ্ঞাসা' এমনি ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে -যা পরবর্তী শাক্তকবিগণের গানের মধ্যেও ধর্মবিশ্বাসের এই বাস্তব প্রতিষ্ঠা আমরা নানাভাবে লক্ষ্য করে থাকি। মাতৃসঙ্গীতগুলি, তৎকালীন সময়ে সমাদৃত হবার আর একটি কারণ হল, শাক্ত পদাবলী যে ভাষায় রচিত - সেগুলি ছিল সাধারণ মানুষের ব্যবহারিক ভাষা। মানুষের নিত্য দিনের কর্ম-কৃষি, বিষয়-সম্পত্তি, মামলা-মোকদ্দমা, জমিদারী তালুক, দলিল-দস্তাবেজ, লেন-দেন, তবিলদারী কথা অনায়াসে স্থান পেয়েছিল সে সব গীতি-কবিতায়। অর্থাৎ অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের বিশৃঙ্খ রাজতন্ত্র ও অসহায় জমিদার তন্ত্রের, কথা তুলে ধরার চেষ্টা করে গেছেন শাক্ত কবিরা। তার কারণ, এই পদাবলীগুলি ছিল তাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতার ফসল। শাক্ত সাধকগণের জীবনের সব চাইতে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল এই, তাঁরা দুঃখ-যন্ত্রণা-দারিদ্র্যের ভয়ে সংসার ত্যাগ করে যাননি। সংসারে থেকেই মাতৃচরণে আত্মসমর্পণ করে দুঃখ-কষ্টকে, নিবারণ করেছেন। তাই বলা হয়ে থাকে 'যথার্থ শক্তিসাধনা-দুঃখ জয়ের সাধনা। আর যথার্থ শাক্তসঙ্গীত দুঃখকে অতিক্রম করার সঙ্গীত।' মাতৃসাধকগণ জানতেন - এমন কি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, "সংসারে সৃষ্টিলীলার পার্শ্বেই ধ্বংসলীলা চলিতেছে, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা, আকস্মিক দুর্ঘটনা, প্রভৃতির মধ্য দিয়া ধ্বংসের যে তাণ্ডবলীলা চলিতেছে, তাহাতে ভীত বা বিচলিত হইলে চলিবে না। সত্যকে অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করিতে হইবে এবং জগদম্বার কৃপায় সর্ব প্রকার বিভীষিকাকে জয় করিতে হইবে।"[২১] সাধক ভবাপাগলার মাতৃগানগুলিতেও এই দুঃখ জয়ের কথা বলা হয়েছে। শুনিয়েছেন হতাশা থেকে পরিত্রাণের বাণী, —

> ছেলে কখনও ভয় পেলে, মা ঢেকে নেয় আঁচল তলে।
> রাখে না সে পথে ফেলে, ছেলের মায়া সকল ভুলে।।[২২]

Dhaka University Institutional Repository

এবং

যাবি চলে সুখে, ডাক আনন্দময়ী,
রিপু বশ হবে শমনে হবি জয়ী ।
নেবেন কোলে করি, এসে দয়াময়ী,
শমনে গালি দেবে রে মন ।।[২৩]

ভবাপাগলার জন্মের প্রায় পঞ্চাশ বছর পর, এদেশে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটে । এ সময় ভারতীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুভূতির বীজ উপ্ত হয়ে উঠেছিল দস্যুর মত । 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলন ; 'বঙ্গভঙ্গরদ আন্দোলন' রাখি আন্দোলন প্রভৃতি স্বদেশী আন্দোলনে রূপ নিয়েছিল । পর পর দুটি বিশ্ব-যুদ্ধও যেন মানুষের মনকে চরম বিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল । তারমধ্যে সাম্প্রদায়িকতা -দাঙ্গাররূপ নিতে বসেছিল । ভবাপাগলা, এসব আচরণ থেকে বিরত রাখার জন্য 'মা' কেই দায়ীকরে লেখেন, --

ভাইয়ে ভাইয়ে কাটাকাটি, মা বেটী কি দেখছিস চেয়ে ।
নিজে রইলি, কোন্ আড়ালে, কোলের ছেলে রণে ফেলে ।।[২৪]

'কোলের ছেলে রণে ফেলে' মাকে পালিয়ে বেড়ালে চলবে না - তাকে এসব মিটিয়ে দেবার ভার নিতে হবে । এছাড়া সম-সাময়িক মহামারী, প্রাকৃতিক দুর্যোগকে নিয়েও তাঁর গান রয়েছে । ১৩৪৪ সালের আশ্বিন মাসে একবার এদেশে ভীষণ ঝড় হয় । সেই ঝড়ে এ দেশের জনজীবন প্রচন্ড ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। ভবাপাগলা সেদৃশ্য বর্ণনা দেন নিম্নের গানটিতে,--

কড়্ কড়্ নাদে, কলুষ বিনাশে, করিছ মা তুমি কতই খেলা ।
বিজলী হাসিয়া, গগন ভরিয়া, পেতেছ মা, তুমি মেঘের মেলা ।।

Dhaka University Institutional Repository

শন্ শন্ করিয়া, ভবগুণ গাহিয়া, পবন নাচিয়া হয়েছে পাগল।
তরঙ্গ হিল্লোলে, তটিনীর কল্লোলে, নাচিছে তালে তালে পাগ্লা ভোলা॥[২৫]

১৯৩৯-৪৫ সনের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিতে ভবাপাগ্লা তাঁর শ্যামা মাকে সম্বোধন করে লেখেন,--

মা, তোমায় আমি এবার লাখে লাখে মুন্ডু পরাবো।
যেন মুন্ডু পরে সাধ মিটেনি ক'মা,
দেখিবে বিশ্ব, ভারতবাসী,,
কেমনটী তোমায় সাজাবো॥[২৬]

এমন কি ১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চ, কালোরাত্রে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী এ-দেশের নিপীড়িত, নির্যাতিত, নিরস্ত্র অসহায় মানুষের উপর গুলী চালালে, ভবাপাগ্লা ভীষণভাবে মর্মাহত হন। কালনা, বর্দ্ধমান-জেলার ভবানী মন্দিরে বসে তখন এদেশের মুক্তিকামী বাঙালীদের উদ্দেশ্যে লেখেন,--

(আজি) পদ্মার জল লাল।
যমুনার জল কালো,
ব্রহ্মপুত্র অতীব ভীষণ, মেঘনা নদী অতি বিশাল॥

শীতলক্ষ্যা মধুমতী, বুড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরী,,
হুরাসাগর, ভৈরবনদ, শতধারা রূপা ঢাকেশ্বরী।
কুমারটুলী বিরাজিছে মাতা, হাতে নিয়ে ঢাল-তরোয়াল॥

Dhaka University Institutional Repository

মহাদেবী প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন ঢাকা শহরে ,,
মহিষাসুর মর্দিনী মা গো, ধ্বংসকর অসুরে ।
দেবতার শ্মশানে, একি গোপনে,
এলো কা'রা ওরে নিষ্ঠুর মাতাল !!

এবে হবে সকলি ঠান্ডা --
সন্তান রয়েছে শত শত সেথা, হাতে লয়ে ন্যায় ডান্ডা ।
খন্ড খন্ড রূপে বাংলার জননী, ফাতেমা ঘিরিছে জাল ।।

ছিন্না ছিন্নমস্তা,
ত্রিধারা , বহিছে , রক্তধারা ।
কে রে করে শিশু হত্যা,
মাভৈঃ রবে গর্জিছে আকাশ, বধিতে কৃষ্ণ-শিশুপাল ।।

ভবাপাগলার এভিমান,
আর কেন দেবী, শোন হে কান্ডারী,
মুজিবরে হও অধিষ্ঠান ।
সুসন্তান তোমার নিয়েছে এ ভার,
(আজি) ধরিতে বাংলার হাল ।।

'মুজিবরে হও অধিষ্ঠান' বিশ্বকান্ডারীর নিকট বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কান্ডারীর জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করছেন ভবাপাগলা ।

বৈষ্ণব ধর্ম মূলতঃ মানবিক ধর্ম । শ্রীচৈতন্য এই মানবিক ধর্মের উদ্গাতা ছিলেন বটে, কিন্তু কবি চন্ডীদাস ছিলেন এর প্রথম প্রবক্তা । কারণ চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের অনেক আগে চন্ডীদাস তাঁর গানে , 'সবার উপরে মানুষ'

Dhaka University Institutional Repository

সত্যের মহিমার কথা শুনিয়েছিলেন । কিন্তু অষ্টাদশ শতকের মাতৃসঙ্গীত গুলির মধ্যে আমরা প্রথম অসাম্প্রদায়িকতার বাণী উচ্চারিত হতে দেখি । শাক্তরা মনে করেন যে, জাতিভেদের চাইতে বড় সত্য,সকলে আমরা একই মায়ের সন্তান । ভবাপাগলার গানে সেই অখন্ড ভ্রাতৃত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায় ,--

মায়ের কাছে সকল সমান,
কি বা হিন্দু, কি বা মুসলমান ।
দেবতা মানুষের বিধান,
ব্যবধানে করে গঠন ।।[২৭]

রাম প্রসাদ তাঁর গানে বুঝাতে চেয়েছিলেন-যিনি মাতৃভাবে কালীকে উপাসনা করেন-কালী তাঁর কাছে করালী নহেন, স্নেহময়ী, আনন্দময়ী জননী । তিনিই প্রথম, "কালীকে বাঙালী ঘরের 'বিগলিত করুণা' জননীতে পরিণত করিয়াছেন । আবার আগমনী ও বিজয়ার গানে, দেখি উমারূপে তিনিই হইয়াছেন আমাদের গৃহের আদরিণী কন্যা ।"[২৮] ভবাপাগলার মানসকালী আরও বেশী স্নেহময়ী, অন্ধ-বাৎসল্য প্রেমে আপ্লুতা । যে মা শুধু সন্তানকে কেবল আদরই দিতে জানে, 'নাই দিয়ে দিয়ে' সমস্ত অন্যায়কে বুকে নিতে পারে ,--

(মাগো) এত আদর, এত স্নেহে সব করিলি মাটি,
চোখ রাঙিয়ে করলে শাসন, হতাম আমি খাঁটী ।।[২৯]

তাই বলে 'এত আদর স্নেহের' পরও কিন্তু ভবাপাগলা নষ্ট হয়ে যাননি । কারণ তিনি জানতেন, তাঁর মা কালী বাইরে যতই শক্তিমতি হন না কেন, আসলে ভিতরে ভিতরে চির দুঃখী । আর ভবাপাগলা সেই দুঃখিনী মায়েরই সন্তান ।

Dhaka University Institutional Repository

আমি দুঃখীর ছেলে , দুঃখিনী আমার মা ।
সারা দিনে নাই মোর কেহ আমি আছি,আমার মা ।।

মাও কাঁদে, আমিও কাঁদি, কারে কেহ ছাড়ি না ।
(যখন) মায়ের কোলে নয়ন মুদি, চেয়ে থাকে আমার মা ।।[৩০]

উদ্ধৃত গানের চরণগুলি থেকে আমরা যে সত্যটি অনুধাবন করতে পারি, তা হল, ভবাপাগলা তাঁর গানে গর্ভধারিণী মা এবং জগৎ জননীকে এক করে ফেলেছেন। যেন কেউ থেকে কাউকে বিচ্ছিন্ন করার উপায়টি নেই । মাতৃসাধক ভবাপাগলার এই যে মাতৃসাধনা, তার উপকরণ ছিল ফুল বা মন্ত্র নয় — গান । তিনি বিশ্বাস করতেন,

গানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা,
লাগে না ফুল চন্দন, মন্ত্র তন্ত্রও লাগে না ।।[৩১]

সহজ কথা, ভবাপাগলা তাঁর জীবনের আনন্দসঙ্গী হিসেবে গানকেই বেছে নিয়েছিলেন । রামপ্রসাদের মত শয়নে গান, জাগরণে গান,চলনে-বলনে গান, গানই ছিল ভবাপাগলার নিত্য দিনের সঙ্গী । কথায় গান, আলাপে গান, খেতে বসে গান, এমন কি জাগতিক কর্মের মধ্যেও তিনি নতুন নতুন 'নামগান' করতেন ।

তথ্য নির্দেশ

১। শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য,কলিকাতা,১২, উপক্রমণিকা -৭

Dhaka University Institutional Repository

২। শ্রীত্র্যম্বককুমার চক্রবর্তী, শাক্ত পদাবলী ও শক্তি সাধনা, কলিকাতা,১৯, অবতরণিকা, পৃ. ১৭

৩। ঐ, পৃ. ১৮

৪। ঐ, পৃ. ১৯

৫। ঐ, পৃ. ২০

৬। ঐ, পৃ. ২৪

৭। ঐ, পৃ. ২৭

৮। ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, পৃ. ১৩১

৯। মধ্যযুগের বাংলা গীতিকবিতা, বংশীমঙ্গল, পদ সংখ্যা-১০০

১০। ঐ, রূপানুরাগ, পদ সংখ্যা -২০

১১। ডঃ সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য, রাম প্রসাদঃ জীবনী ও রচনা সমগ্র,কলিকাতা,১৯, পৃ. ৭০

১২। ঐ, পৃ. ৭১

১৩। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, কলিকাতা,১৯, পৃ. ২৪৮

১৪। ঐ, পৃ. ১৭৫

১৫। শাক্ত পদাবলী, পৃ. ১৫১-১৫২

১৬। মধ্যযুগের বাঙলা গীতিকবিতা, ঢাকা, ১৯,ভূমিকা-৩

১৭। সঙ্গীত সংকলন, গান নং ৬২

১৮। সঙ্গীত সংকলন, গান নং ৫৪

১৯। ডঃ সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, রাম প্রসাদ রচনা সমগ্র,কলিকাতা,১৯, গান নং ৩০৮

Dhaka University Institutional Repository

২০। পরমগুরু ভবাপাগলা, পৃ. ১৪০

২১। শক্তিপদাবলী, পৃ. ২৫

২২। সঙ্গীত সংকলন, গান নং ৪৮

২৩। ঐ, গান নং ৫০

২৪। সঙ্গীত সংকলন, গান নং ৮১

২৫। ভবাপাগলার সাধনা সঙ্গীত সংগ্রহ -১, গান নং ৫৯

২৬। ঐ, গান নং ৪১৩

২৭। সঙ্গীত সংকলন, গান নং ৯৬

২৮। শাক্ত পদাবলী, পৃ. ২৭

২৯। সঙ্গীত সংকলন, গান নং ৪০

৩০। ঐ, গান নং ৪৭

৩১। ঐ, গান নং ১

-------০-----

Dhaka University Institutional Repository

বাউল সঙ্গীত : ভবাপাগলা

"বাউল সাধনা একটি আধ্যাত্ম সাধনা। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ, জাতিধর্ম নির্বিশেষে এই আধ্যাত্ম সাধনাকে জীবন ও জগতের মুক্তির একমাত্র উপায়স্বরূপ বলে ভেবেছে। প্রচলিত ধর্মের আচার অনুষ্ঠানকে পরিহার করে একটি স্বতন্ত্র মতাদর্শের মাধ্যমে পরম সত্যকে খুঁজে পাওয়াই তাদের সাধনার লক্ষ্য।"[১] বাউলেরা মানব জীবন ও মানব দেহকে তাঁদের সাধনার মূল আশ্রয় হিসেবে মনে করেন। তাঁদের কাছে দেবদেবীর অস্তিত্ব নিছক অনুমান মাত্র। মানুষ দেবতার পূজা, ধ্যান-জপাদি দ্বারা যে পুণ্য অর্জন করে- তদ্দ্বারা স্বর্গ লাভ বা পরকালে উত্তম গতি লাভ করবে - এ বাউলদের কাছে অবিশ্বাস্য। বাউলেরা বিশ্বাস করেন মানুষের 'দেহভান্ডই বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের ক্ষুদ্র প্রতীক'। 'মনের মানুষ' বা সাঁই আছেন. দেহের অভ্যন্তরে ঠিক 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখির' মত। কিন্তু ভবাপাগলা হয়তো সেদিক থেকে বাউল ছিলেন না। কারণ তিনি মূলতঃ কালীর উপাসক ছিলেন এবং নানা দেবদেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন। এর প্রমাণ তাঁর গান। তবে জীবন আচরণের দিক বিচার করলে দেখা যায় তিনি ছিলেন সকল বিষয়ে অনাসক্ত; সামাজিক বা জাগতিক কোনদিনই কোন নিয়মের অধীন ছিলেন না। তিনি ছিলেন এক উদাসমনের বাউল, নিরাসক্ত সাধক ও তুলনাহীন প্রেমিক মহাপুরুষ। তিনি মূলতঃ কালীর উপাসক হলেও বাউলদের মত বেদ পুরাণ, উপনিষদ বাইবেল, কোরআন প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ সম্পর্কে যথেষ্ট রূপে জ্ঞাত ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' গ্রন্থে বাউলদের গান বিশ্লেষণ করে বাউল ধর্মের নিম্নলিখিত উপাদানগুলি লক্ষ্য করেন,--

১। বেদ বহির্ভূত ধর্ম,

২। গুরুবাদ,

৩। স্থূল মানবদেহের গৌরব, ভক্তি ও দেহাত্মবাদ ,

৪। মনের মানুষ ,

৫। রূপ-স্বরূপতত্ত্ব ।

তিনি 'বেদ বহির্ভূত ধর্ম' , সম্পর্কে আলোচনা করে বলেন, "বাউলধর্ম যে বেদ বহির্ভূত ধর্ম এবং এই ধর্ম সাধনায় যে,বেদ-বিধি ত্যাগ করিতে হইবে এইরূপ ভাব অনেক গানে ব্যক্ত হইয়াছে । বেদ-বিধি অর্থে বাউলেরা অনেক স্থলে চিরাচরিত আনুষ্ঠানিক ধর্ম বুঝিয়াছে । তাহাদের আচার 'রাগের আচার', 'বেদের আচার নয়'।"[২] যেমন, বাউল সাধক লালন শাহ্ ফকীরের একটি গানে পাই,--

বেদে কি তার মর্ম জানে ।
যেরূপ সাঁইর লীলা খেলা,
আছে এই দেহ ভুবনে ॥

পঞ্চতত্ত্ব বেদের বিচার,
পন্ডিতেরা করেন প্রচার,
মানুষতত্ত্ব ভজনের সার,
বেদ ছাড়া বৈ 'রাগের মানে' ॥[৩]

অর্থাৎ সাঁইর খবর বেদে পাওয়া যাবে না । তাই লালন বাউকে 'বৈদিক ভোলে' না ভুলে 'রাগের ঘরে' বসে মানুষের করণ বা মনের মানুষের সন্ধান জানতে বলছেন,--

Dhaka University Institutional Repository

অনেগে মানুষের করণ ভিন্ন হয় ।
তুনবা মব বৈদিক ভোলে ,
রাগের ঘরে রও ॥[৪]

এমনি ভাবে খোঁজ করলে দেখা যায় অন্য বাউলরাও ঠিক একই সুরের সুর মিলাতে চেষ্টা করে গেছেন । কিন্তু ভবাপাগলার বেদ-জ্ঞান ছিল একটু স্বতন্ত্র । তিনি সরাসরি বেদের সত্যতাকে মেনে নিয়ে বলেছেন ,--

আমি বেদ, আমি বেদান্ত,
আমি অনন্তের অনন্ত,
আমি আদি, আমি প্রেম পরম সিন্ধু ।
আমি কৃষ্ণ আমি কালী,
আমি শিব আমি ব্রহ্মা,
আমি পৃথিবীর চির বন্ধু ॥[৫]

প্রীতিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ভবাপাগলা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, "বেদ বেদান্ত শাস্ত্রাদি তিনি মান্য করেছেন, তবে বলতেন, ও সব তাঁর জন্য নয় ।"[৬] ভবাপাগলার এরূপ 'অহংবোধের' পরিচয় আরও অনেক গানে রয়েছে । যেমন,

আমি সেই, আমি সেই, আমি সেই, আমি সেই ।
আমি সর্ব্বভূতে আমি ব্রহ্মময়ী ॥

দেহটি ভবা সেই বা কেবা,
অন্তরে ভবানী, আমি বিশ্ব জননী শোভা ।

Dhaka University Institutional Repository

আমি সংসারী, আমি সংসার ধরি,
আমি অসম্ভব, আমি সম্ভব, আমি সর্ব্বত্যাগী,
আমি মহাযোগী, আমি সন্ন্যাসী সাজাই ॥[৭]

'দেহটি ভবা সেই বা কেবা' শুধু ইঙ্গিতময়, প্রশ্নে তিনি নিজেকে সবার সম্মুখে উপস্থিত করলেন সংসারী সন্ন্যাসীরূপে ।

বৈদিক ধর্মের সাথে বাউলদের যে বিরোধ তার মূল কারণ মন্ত্র । বৈদিক ধর্ম হচ্ছে মন্ত্র সর্বস্ব ধর্ম । বাউলেরা মন্ত্রকে বিশ্বাস করতেন না । তাঁদের সাধনা ছিল তান্ত্রিক সাধনা । ভবাপাগলার মধ্যে এদু'টি সাধনারই সমন্বয় লক্ষ্য করা যায় । তিনি বৈদিক ধর্মের মত দেবতার বিগ্রহ তৈরী করতেন । আবার তান্ত্রিকদের মত কেবল ভক্তি অর্ঘ দ্বারাই পূজা সম্পন্ন করতেন । কোন প্রকার মন্ত্রের ধার ধারতেন না ।

শ্যামা মায়ের নিত্য করি আরতি,
শঙ্খ ঘন্টা, কাঁসর-চামর লাগে নারে বাইরের বাতি ॥[৮]

এসব বিচারে ভবাপাগলাকে কোনমতেই পূর্ণাঙ্গ বাউল বলা যায় না । তবে 'পূর্ণাঙ্গ বাউল' না হলেও তিনি যে একজন সার্থক বাউল গান রচয়িতা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ।

২। বাউলদের মত তিনিও গুরুবাদের উপর গান লিখেছেন । 'গুরুর গুণগান' করেছেন এবং 'গুরুর কাছে মন্ত্র' নেবার কথা বলেছেন । কেবল বলেই ক্ষান্ত হননি, 'গুরুর বাক্য শিরোধার্য' করে পথ চলার কথাও বলেছেন ।

Dhaka University Institutional Repository

আমরা জানি যে, বাউলেরা গুরুকে তাঁদের সাধনায় সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ভারতীয় গুরুবাদকে ব্যাখ্যা করেন এভাবে, "যাঁহারা ক্রিয়া বা সাধনা করিয়া নিজেদের অভিজ্ঞতার দ্বারা আধ্যাত্মিক সত্য লাভ করিয়াছেন, তাহারাই সেই ধর্মের তত্ত্বজ্ঞ, মর্মজ্ঞ ও ক্রিয়া বিশারদ। ইঁহারাই গুরু, ইঁহারাই অন্যান্যকে তাঁহাদের ধর্মের 'মতে ও পথে' চালিত করিতে পারেন। তাই ভারতীয় ধর্ম সাধনায় গুরুর এত প্রয়োজন, গুরুর এত মাহাত্ম্য। গুরু ব্যতীত ধর্মের মূল রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করা যায় না। বৈদিক যুগ হইতে ভারতের ধর্ম গুরু-শিষ্য পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে।"[১]

বাউলেরা গুরুকে দুইরূপে কল্পনা করতেন। এক, মানব গুরুরূপে; দুই, পরমগুরু বা ভগবান রূপে। মানব গুরু হচ্ছে পরমগুরুর প্রতিনিধি। পরমগুরু বাউলদের লক্ষ্যবস্তু হলেও তাঁকে পেতে হলে মানব গুরুর মাধ্যমে করে পেতে হবে। লালন তাঁর গানে এই পরমগুরুকে 'মুর্শিদ' বলে উল্লেখ করেছেন।

মুরশিদ বিনে কি ধন আর আছে রে এ জগতে।
মুরশিদের চরণ সুধা,
পান করিলে হবে ক্ষুধা,
কোরো না দেলে দ্বিধা,
যেহি মুরশিদ সেহি খোদা,
বোঝ অলিয়ম মুর্শেদা,
আয়েত লেখা কোরাণেতে॥

Dhaka University Institutional Repository

আপনি খোদা আপনি নবী,
আপনি সেই আদম ছবি,
অনন্তরূপ করে ধারণ,
কে বোঝে তার নিরাকরণ,
নিরাকার হাকিম নিরঞ্জন,
মুরশিদ রূপে ভজন পথে ।।

'গুরুকে' নিয়েও লালনের গান আছে । সেখানে ভগবান বা ঈশ্বরকে পরমগুরু বলে চিহ্নিত করা হয়েছে ।

গুরু, তুমি তন্ত্রের তন্ত্রী,
গুরু তুমি মন্ত্রের মন্ত্রী,
গুরু তুমি যন্ত্রের যন্ত্রী,
না বাজাও বাজবে কেনে ।।

আমার জন্ম-অন্ধ-মন-নয়ন,
গুরু, তুমি নিত্য সচেতন,
চরণ দেখব আশায় কয় লালন,
জ্ঞান-অঞ্জন দেও নয়নে ।।[১১]

অর্থাৎ, সে গুরুকে দেখতে হলে জ্ঞান চক্ষুর প্রয়োজন ; সাধারণ বাহ্য চোখে দেখা সম্ভব নয় । তার জন্য গুরু সান্নিধ্যে যাওয়া আবশ্যক । গুরুর কাছে মনস্থির করে বসার জন্য বলছেন উত্তর বঙ্গের একজন বাউল, --

Dhaka University Institutional Repository

বস, রে মন গুরুর কাছে ।
গুরু বিনে ভবে কি ধন আছে ॥
গুরুবস্তুধন, চিনলি নারে মন ।
    অযতনে সে ধন মারা গেছে ।
ও সে অলেক রূপে সাঁই, ভ্রমিছে সদাই ,
    সহজ মানুষ সহজ পথে যায় ।

ও সে গয়া-গঙ্গা-কাশী - তীর্থ বারাণসী,
    সকল তীর্থ গুরুর শ্রীচরণে আছে ॥
যে জন সাধন করেছে গুরু ধরেছে,
    অধর মানুষ ধরে বসে আছে ॥[১২]

গুরুতত্ত্ব সম্পর্কে ভবাপাগলার ধারণা রীতিমত প্রশ্নসূচক । তিনি মনে করেন,--

আমায় কি মন্ত্র দিবেন, গুরু মশাই ।
শুধু বেগার খেটে মলাম,
    পথের সম্বল কিছু নাই ॥

কিছু নাই মোর বিদ্যাবুদ্ধি,
দেহ মনও নাইকো শুদ্ধি ।
ভব ব্যাধির পাইনা বদ্যি,
    বিষম জ্বালায় মরে যাই ॥[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু তাঁর এই ধারণা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়নি । নিজেকে সংশোধন করে নিয়ে পরক্ষণেই তিনি বলেন,--

> মন গুরুর নিকট হতে দীক্ষা নিয়ে যাও ।
> নতুন গঙ্গাজলে তুমি স্নান করিবে যাও ।
> যাও, যাও (ওরে তুমি) স্নান করিবে যাও ॥[১৪]

কেননা, পরমার্থ লাভের জন্য আমাদের গুরুর করুণা লাভের প্রয়োজন । এই দেহতরী বাইতে হলে তাঁকে উপেক্ষা করলে চলবে না । অতএব, তবারাগলা ি গেয়ে শোনান, --

> (ওগো) গুরু আমায় কর করুণা,
> ঝড় তুফানে বেয়ে যাব (গুরু)
> তোমার দেওয়া তরীখানা ॥
>
> ভব নদীর, ভীষণ তুফান,
> কেঁপে,কেঁপে ওঠে পরান ।
> তুমি,গুরু সকল প্রধান,
> মুস্কিলে যেন পড়ি না ॥
>
> গুরু যদি আমার সহায়,
> তবে কেন করব হায় হায় ।
> গুরু তোমার পায়ে সকল উপায়,
> চরণ ছাড়া করনা ॥

Dhaka University Institutional Repository

সকল তীর্থ, সকল কর্ম,
তুমি গুরু, বড় ধর্ম ।
গুরু ছাড়া কে বুঝবে মর্ম,
গুরুই শ্রেষ্ঠ উপাসনা ॥

গুরু অগতির গতি,
(গুরু) একাধারে শিব-পার্বতী,
গুরু কৃষ্ণ, গুরু শ্রীমতী,
গুরুই গঙ্গা যমুনা ॥

ভবার গুরু ত্রিশুজনা,
সে কথা কেউ জানে না ।
যে জানে, সে কথা কয় না,
(সে) জড়িয়ে আছে পা দু'খানা ॥[১৫]

'গুরু অগতির গতি' অত্যন্ত সহজ করে সবাইকে বুঝিয়ে দেন তিনি । আরও জানিয়ে দেন 'ভবার গুরু ত্রিশুজনা' । এই 'ত্রিশুজনা' আর কেউ নন --স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব বা শিব । যিনি অনন্তকাল পর্যন্ত ভবার জন্য কালীর পা'দুখানা আগলিয়ে রাখবেন । গুরুর করুণা পাবার দরকার ভবাপাগলার এই কারণে যে 'গুরু' হচ্ছেন 'ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু' । অর্থাৎ গুরু হলেন পরমার্থ-প্রদাতা । তাঁকে শাস্ত্রগ্রন্থ খুঁজে পাবার যো নেই । তার জন্য চাই পরম ভক্তি, পরম বিশ্বাস।

মন গুরু যে কল্পতরু, গুরুর আসন হৃদে পাতা ।
যা চাইবি তাই পাবি, পরমার্থ(সে) পরমদাতা ॥

যত খুঁজবি, হারিয়ে যাবি, এইখাতো আর চক্ষুদাতা ।
আত্মনির্ভর , এইতো ঈশ্বর খুলে দ্যাখ তোর মনের খাতা ॥

অনন্ত, অনন্তরূপে লুকিয়ে আছেন বিশ্বপিতা ।
কুন্ডলাকার ওঙ্কারে সে নিদ্রিতা নয়, চির জাগ্রত ॥

শিবদুর্গা, কৃষ্ণকালী, গুরুরূপে রামসীতা ।
রাবণবধে, শ্রীগুরু পদে, ভবাভবা অপরাজিতা ॥[১৬]

এতো গেল গুরুর পরিচয় । এবার ভবাপাগলা গুরুকে পাবার সহজ উপায় সম্পর্কে বলে দিচ্ছেন, --

গুরুকে ধরতে হলে, ঠিক কর তোমার মন ।
চঞ্চল হও, ক্ষতি কি, ঠিক থেকো, ডাকবে যখন ॥

একটি ডাকেই পাবে সাড়া,
(যারা) নির্বিকার , জগৎ ছাড়া ।
দেহ, স্মৃতি, মৃত্যু জরা,
(সাবধান) এই লড়াতে কণ্টক ভীষণ ॥

ভয় পাবে না, ডাক ছেড়োনা ।
বিভীষিকার এ আনাগোনা ।
ঐ তো গুরুর ছলনা,
পরীক্ষায় পাশ করিলে, পাবে রে মন পরম রতন ॥

Dhaka University Institutional Repository

গুরু কইবে (যাহা) কানে কানে,
শুনিবে তাহা মনে প্রাণে ।
দেখবে তখন পদ্মাসনে,
গুরু বসবে হৃদি পদ্মে তবার বচন ।।[১৫]

অনেকে 'গুরুর মন্ত্র' নেয়াটাকে নিছক লোক দেখানো মনে করেন । তাঁরা এ বিষয়টাকে রীতিমতো 'কুলে উঠে গেলাম' হিসেবে ধরে নিয়ে থাকেন । ভবাপাগলা তাঁদেরকে সাবধান করে দিয়ে বলেন,--

দীক্ষা নিয়েই মনে ক'রনা কিনে নিলাম গুরুর লোটা ।
গুরু মিলে পথে-ঘাটে, শিষ্যের মত শিষ্য ক'টা ।।

শিষ্য পাওয়া যায় না মোটে,
দেখেছি, মন খুঁজে ঘেঁটে ।
প্রাণ যেতে চায় এক হোঁচটে,
নাকের ডগায় তিলক ফোঁটা ।।

গুরুমন্ত্র কানে নিয়ে,
গুরু ছেড়ে রয় পালিয়ে ।
গেল কিন্তু সব হারিয়ে
যত কিছু বুদ্ধি পাটা ।।

মুখে কেবল কটর কটর,
(যেন) গাছে ফোঁটা বেলি-টগর ।
একটি বেলাই, তাদের ঝগড়,
ছিঁড়ে যখন ফুলের বোঁটা ।।

Dhaka University Institutional Repository

বেশ্যাবাড়ী গুরু গেলে ,
শিষ্যরা সব থু থু ফেলে ।
গুরু ছাড়া অন্ত কালে,
তরে গেল কোন্ বেটা ।।

ভুল ভ্রান্তি মানুষ মাত্রেই,
এই আছি এই নেই ।
ভবা গুরু শিষ্য বেহাই,
বেয়াড়া পথে হাটা ।।

এখানে পার্থিব গুরুর কথা বলেছেন - ভবাপাগলা । কিন্তু আসল গুরুর পরিচয় আমরা পাই - কই ? ভবাপাগলা সে সম্পর্কেও আমাদেরকে গেয়ে শুনিয়েছেন,--

যখন আলোটি নিভিয়া যাবে , আঁধার হইবে বিশ্ব ।
এ ব্রহ্মাণ্ডে, কে কার গুরু, কে কার বল শিষ্য ।।

সবার গুরু সেই ভগবান,
আনে নেয় যে, বিশ্বের পরাণ ।
অনু-পরমাণু, সবাই সমান, দেখিতেছ যত দৃশ্য ।।

দেখ নাই তাঁরে, কি বুঝিবে আর,
ভুলেও ভাব নাই, কেমন আকার ।
(এই) অনন্তরূপের নাই পারাবার, শান্তিমধুর-দাস্য ।।

Dhaka University Institutional Repository

বিরাজে সদা খণ্ডে খণ্ডে, পরম ব্রহ্মা এই ব্রহ্মাণ্ডে ।
পলকে পলকে, দণ্ডে দণ্ডে, মধুর মধুর হাস্য ।।

দিন যায় (মন) ভাব সেই গুরু,
তাঁর এক নাম বাঞ্ছাকল্পতরু ।
ভবা কয়, (মন) কেন এত ভীরু, হও তারমত ভীষ্ম ।।[১৯]

আমাদের 'সবার গুরু সেই ভগবান'— এই কথাটি সব সময় স্মরণ রাখা চাই ।

৩। "বাউলেরা যাকে 'মনের মানুষ' বলেছেন - তা, এক অর্থে পরমতত্ত্ব বা আত্মা। এই আত্মা সমস্ত বিশ্বের শক্তির আধার ।"[২০] কিন্তু আমরা জানি, শক্তির আত্মপ্রকাশের জন্য একটি মাধ্যমের প্রয়োজন । বাউলদের মতে এই শক্তির আশ্রয়স্থল আর কোথাও নয় - মানবদেহ । মানব দেহকে আশ্রয় করেই শক্তি বা পরমতত্ত্ব আত্ম প্রকাশ করে থাকে । তাই মানব জীবন ও মানব দেহকে বাউলেরা পরম সম্পদ বলে মনে করেন । "মানব জীবন তাহাদের কাছে অত্যুচ্চ মূল্য বহন করে । কারণ, এই মানব জীবনে যে দেহ লাভ করা গিয়াছে, তাহাই তাহাদের আধ্যাত্মিক সাধনার কেন্দ্র । এই দেহের মধ্যে তাহারা ব্রহ্মাণ্ডকে কল্পনা করিয়াছে - ইহার মধ্যে আকাশ, সমুদ্র, পর্বত, অরণ্য, নদী প্রভৃতি সবই বর্তমান । এই দেহের মধ্যেই পরম পুরুষ বা তাহাদের 'মনের মানুষ' অবস্থান করিতেছেন । এই দেহই তাহাদের আত্মোপলব্ধির সোপান । নরনারীর গভীর প্রেম-মিলনের মধ্যদিয়াই তাহারা চরম আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে উপনীত হয় ।"[২১]

Dhaka University Institutional Repository

মানব জীবনের গভীর তাৎপর্য সম্বন্ধে লালন বলেন,--

দেবদেবতাগণ,
করে আরাধন,
জন্ম নিতে মানবে ।।

কতো ভাগ্যের ফলে না জানি,
মন রে পেয়েছ এই মানব তরণী ।
বেয়ে যাও ত্বরায় সুধারায়,
যেন ভরা না ডোবে ।।

এই মানুষে হবে মাধুর্য ভজন,
তাইতো মানুষরূপে গঠলে নিরঞ্জন ।।[২২]

ভবাপাগলার গানেও আমরা অনুরূপ পদ - লক্ষ্য করে থাকি,--

এ জীবনের কত দাম দেবতারাও হার মানে,
মানব হইতে সাধ, আসিতে চায় এখানে ।
তুমি মানুষ হলে, এখন মিছে, অকারণে,
চেয়ে থাক দিবানিশি, অনিত্য আশায় ।।[২৩]

অনেকে 'তীর্থ তীর্থ' করে সংসার ছেড়ে অরণ্যে যায়, গয়াকাশী-বৃন্দাবন যায়, এমনকি মুসলমানেরা মক্কামদিনা পর্যন্ত গমন করে । কিন্তু তারা কি জানে, তাদের দেহের মধ্যেই সকল তীর্থ, সকল মক্কা বিরাজ করে । তাই লালন বলছেন,--

Dhaka University Institutional Repository

আছে আদি মক্কা এই মানবদেহে,
দেখনা রে মন ভেয়ে ।
দেশ-দেশান্তর দৌঁড়ে এবার,
মরিস কেন হাঁপায়ে ॥

দশদুয়ারী মানুষ মক্কা,
গুরু পদে ডুবে দেখ গা,
ধাক্কা সামলায়ে ॥
ফকীর লালন বলে সে যে গুপ্ত মক্কা,
আদি ইমাম সেই মিঞে ॥[২৪]

কানুশাহ ফকিরের গানে ঠিক একই কথা ব্যক্ত হতে শুনি,--

আছে আদি মক্কা মানব দেহে,দেখনা মন চেয়ে রে॥

মানবদেহ কি চমৎকার, আজগবি উঠেছে আওয়াজ,
সাত তালা ভেদিয়ে চার মুড়ায় চার নুরের মিম্বর
মধ্যে সাঁইজি বিরাজ করে ॥

মানব দেহ কেছা বাঁকা, গড়েছেন সাঁই আপনে খোদা,
নিজের তবক নিয়ে নয়শো হাজি নামাজ পড়ে,
রাছুল এমামতি করে ॥

কানুশাহ ফকিরে বলে , মককা মককা সবে বলে,
মককা কেবা চিনে আছে, আদি মককা মানবদেহে,
দেখনা দেহের আয়না খুলেরে ॥[২৫]

Dhaka University Institutional Repository

আর ভবাপাগলার গানে শুনি, --

(ও তুই) মক্কা যাইবার করলি নারে নাম ।
(তোর) দেহের মধ্যে আছে মক্কা,
করনারে তারে হাজার সালাম ॥

মন মাদনা চরণ দাড়ি,
হাজিম করলি দুনিয়া ঘুরি,
কয় উত্তম তুই নমাজ পড়ি,
রোজার ঘরে দিলি বিরাম ॥[২৬]

অনুরূপ একটি গান,--

দেহ অট্টালিকাখানি অতি মনোরম, ।
তাহাতে বসতি করে, একটুখানি দম ॥

সতর্ক থাকিও তুমি হুশিয়ার,
প্রহরী ডাক কিন্তু খবরদার খবরদার ।
পাহারা দিও তোমার ঐ নবদ্বার,
চার দস্যু ষোল জনা ঘুরে হরদম ॥

খাতাপত্র ঠিক রাখে, বিবেক বৈরাগ্য,
এদের মহিমা দিয়ো, তোমার সৌভাগ্য ।
অট্টালিকা মজবুত রবে, বাস করিবার যোগ্য ,
কি ক্ষতি করিবে বল, শনি-রবি-সম ॥

Dhaka University Institutional Repository

ভবার অট্টালিকায় একটি বালিকা,
মাভৈঃ মাভৈঃ রবে, ঘুরে একা একা।
পলকে ব্রহ্মাণ্ড দেখে দিয়ে গা-ঢাকা,
সুখে স্বচ্ছন্দে থাকি, নাই(মোর) লজ্জা-শরম ।।[২৭]

ভবাপাগলার 'দেহ অট্টালিকায়' যিনি বাস করেন, তিনি কোন 'মিঞা সাহেব' নয়; খোদা বা ভগবান নন; একটি বালিকা। স্বয়ং মা ব্রহ্মময়ী কালী। অন্যান্য বাউল সাধকদের সাথে ভবাপাগলার সাধনার স্বাতন্ত্র এখানেই।

৪। বাউলেরা তাঁদের গানে মানব দেহস্থিত পরমতত্ত্বকে বা আত্মাকে 'মনের মানুষ' বলেছেন। আত্মাকে 'মানুষ' বলার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লেখেন, "আত্মা মানবদেহকে অবলম্বন করিয়া বাস করিতেছেন ও মানব দেহের সাধনার দ্বারাই তিনি লভ্য এবং এই মানবাকৃতি তাঁহারই রূপ মনে করিয়া বাউল তাঁহাকে 'মানুষ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। এই মানুষ অলক্ষ্য অবস্থায় হৃদয়ে বা মনে অবস্থান করিতেছেন, - বোধহয় এই কল্পনা করিয়া তাহারা তাঁহাকে 'মনের মানুষ' বলিয়াছে।"[২৮] বাউলেরা তাঁদের গানে এই 'মনের মানুষ'কে বিভিন্ন নামে ডাকতে চেয়েছেন। যেমন,- শুধু 'মানুষ' অথবা 'মনের মানুষ', 'সহজ মানুষ', 'অধর মানুষ', 'ভাবের মানুষ', 'অলেখ মানুষ', 'সোনার মানুষ' বা 'সাঁই' প্রভৃতি।

Dhaka University Institutional Repository

বাউল সাধক লালন শাহ ফকীরের গানে এর যথেষ্ট প্রমাণ আমরা পাই,--

এই মানুষে সেই মানুষ আছে
কত মুনি ঋষি চার যুগ ধরে বেড়াচ্ছে খুঁজে ।।
জলে যেমন চাঁদ দেখা যায়,
ধরতে গেলে হাতে না পায়,
তেমনি সে থাকে সদায়,
আলেকে বসে ।।[২৯]

ওরে আলেকের মানুষ আলেকে রয় ।
শুদ্ধ প্রেম রসিক বিনে কে তারে পায় ।।
রস- রতি অনুসারে,
নিগূঢ় ভেদ জানতে পারে,
রতিতে মতি ঝরে,
মূল খণ্ড হয় ।।[৩০]

আমার মনের মানুষের সনে,
মিলন হবে কত দিনে ।।
চাতক প্রায় অহর্নিশি,
চেয়ে আছি কালোশশী,
হবে বলে চরণ দাসী,
তা হয়না কপাল গুণে ।।[৩১]

লালন শাহ্ ফকীরের গান ছাড়া, অন্য যেসব বাউলের সন্ধান পাই, সেই পাঞ্জ শাহ্ ফকীর, রাধাশ্যাম, চণ্ডীদাস গোঁসাই, পদ্মলোচন প্রভৃতি সাধকদের গানেও

Dhaka University Institutional Repository

'মনের মানুষ', 'সহজ মানুষ' সাক্ষাৎ মিলে । যেমন, - চণ্ডীদাস গোঁসাই -এর পদ,--

মনের মানুষ অটলের ঘরে, খুঁজে নাও তারে ।
নিগমেতে আছে মানুষ, যোগেতে বারাম করে ।।[৩২]

পদ্মলোচন সাধুর গান,--

মনের মানুষ হয় রে যে জনা,
(ও সে) দ্বিদলে বিরাজ করে ঐ মানুষে,
তুমি সহজ মানুষ চিনলে না ।।[৩৩]

ভবাপাগলাও তাঁর গানে 'মনের মানুষের' কথা বলেছেন । ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি রন্ধ্রে, রন্ধ্রে মনের মানুষকে খুঁজে বেড়িয়েছেন তিনি ।

আমি মনের মানুষ খুঁজি,
আমি মনের মানুষ খুঁজি ।
আমি মনের মানুষ খুঁজি ।
তেমন মানুষ পেলে আমি, তার চরণে মাথা গুঁজি ।।

মানুষ আছে কোটি কোটি,
তেমন মানুষ আছে ক'টি,
ফুলের মত হাসি লয়ে, নিত্য ওঠে ফুটি ।
কটিতে নাই তার মায়ার শিকল, (হয় না সে) সবার কথায় রাজি।।[৩৪]

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটি মানুষের মধ্যে মানুষ খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছেন- ভবাপাগলা। কিন্তু পেয়েছেন কি? উত্তরটা তাঁর গানেই - রয়েছে।

(আমি) মনের মানুষ পেলাম কৈ,
মন খুলে দু'টো কথা কই,
প্রাণের দু'টো কথা কই।
আশার গাছে তুলে দিয়ে,
কেড়ে নেয় রে বাঁশের মই।[৩৫]

তবে মানুষের মধ্যে মানুষ খুঁজতে যেয়ে প্রচণ্ড এক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলেন, ভবাপাগলা। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথিবীকে, পৃথিবীর মানুষগুলির আচরণ সম্পর্কে একটি সুচ্ছ ধারণা দিয়ে যেতে পেরেছেন, তিনি। অর্থাৎ মানুষ খুঁজতে গিয়ে কতকগুলি মানুষরূপী অমানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন তিনি।

আমি মনের মানুষ নাহি পাই,
তন্ন তন্ন করি, খুঁজিলাম বন্ধু, ব্রহ্মাণ্ডের শত শত ঠাঁই।।

মানুষ দেখি না চোখে, বেহুঁশের দল,
আমিও পাগল, (তাই) এরাও পাগল।
সকলি যে খল (কেহ) নয় যে সরল,
গরল প্রবল দেখি, আমি যে লুকাই।।

ভাল কহিতে গেলে বুঝে না এরা,
কাড়াকাড়ি মারামারি দুনিয়া ভরা।
স্বার্থের পিশাচ, হিংসায় সর্বনাশ,
বিশ্বাস বলিতে কিছু মোটেই নাই।।

Dhaka University Institutional Repository

জানে না কহিতে কথা, কথাটি বলে,
পথের চাইতে ভুল, কু-পথে চলে ।
বাহিরে সাধুর আকার, অন্তরে ভীষণ আঁধার ।
সর্বগ্রাস করে এরা, তবু খাই খাই ।।

ভবাপাগলা তাই গাহিছে ছন্দ,
সবাই জগতে ভাল, আমি যে মন্দ ।
আপনি ভাল, ওরে, জগৎ ভাল ,
ভাল হইতে গেলে তারে ডাক ভাই ।।[৩৬]

'স্বার্থের পিশাচ , হিংসায় সর্বনাশ', আর অবিশ্বাস নিয়েই আমাদের সংসারীরা চিরসুখী । কিন্তু বাউলদের সুখ এখানে নয় । মানুষ খুঁজে পাওয়ার মধ্যেই তাঁদের তৃপ্তি । অবশেষে ভবাপাগলা,'মনের মানুষ'কে আপন মনের মধ্যেই আবিস্কার করতে সক্ষম হন ।

ভবাপাগলা মানুষ খোঁজে,
সদা থাকে চোখটি বুজে,
মনের মানুষ মনেই আছে,
আমার মা সে ব্রহ্মময়ী ।।[৩৭]

ভবাপাগলার মনের মানু. আর কেউ নন-ব্রহ্মময়ী মা কালী । যিনি ভবাপাগলার সঙ্গে আজন্ম মিশে রয়েছেন ।

Dhaka University Institutional Repository

৩। রূপ গুরুপদতত্ত্ব বিষয়ক ভবাপাগলার রচিত তেমন কোন গান আমাদের হাতে আসেনি।

তবে উপরের আলোচনা থেকে আমরা ভবাপাগলার বাউল বিষয়ক গান ও তার বৈচিত্র্য সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা লাভ করতে পারি।

তথ্য নির্দেশ

১। অধ্যাপক আনোয়ারুল করীম, বাউল সাহিত্য ও বাউল গান, কুষ্টিয়া, ১৯৭১, ভূমিকা, পৃ. ১

২। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বাংলার বাউল ও বাউল গান, কলিকাতা ১১, পৃ. [illegible]

৩। বাংলার বাউল, লালনের গান নং ৮৫

৪। ঐ, গান নং ১৪৮

৫। নিজস্ব সংগ্রহ, ভবাপাগলার গান।

৬। প্রীতিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবাপাগলার সাধনা সঙ্গীত সংগ্রহ-১, ভূমিকা অংশ।

৭। নিজস্ব সংগ্রহ, ভবাপাগলার গান,

৮। সঙ্গীত সংকলন, গান নং ১০২

৯। বাংলার বাউল, পৃ. ৩০৩

১০। ঐ, গান নং ৩৭

১১। ঐ, গান নং ৬৯

Dhaka University Institutional Repository

১২। বাংলার বাউল, গান নং ২৪০

১৩। সঙ্গীত সংকলন, গান নং ৭

১৪। ঐ, গান নং ১৪

১৫। ঐ, গান নং ৮

১৬। ভবাপাগলার সাধনা সঙ্গীত সংগ্রহ-১, গান নং ২৩

১৭। সঙ্গীত সংকলন, গান নং ১১

১৮। ঐ, গান নং ১৩

১৯। ঐ, গান নং ১২

২০। অধ্যাপক আনোয়ারুল করীম, বাউল সাহিত্য ও বাউল গান, পৃ. ১৮

২১। বাংলার বাউল, পৃ. ৩২৫

২২। ঐ, গান নং ১

২৩। নামের ফেরিওয়ালা ভবাপাগলা, পৃ. ৩১

২৪। বাংলার বাউল, গান নং ৪৩

২৫। সৈকত আসগর, বাউল সাধক কালুশাহ্, পৃ. ৪৬

২৬। সঙ্গীত সংকলন, গান নং ১৮৭

২৭। ঐ, গান নং ১৩৬

২৮। বাংলার বাউল, পৃ. ৩৪০

২৯। ঐ, গান নং ৫০

৩০। ঐ, গান নং ৪১

৩১। ঐ, গান নং ৫৭

৩২। ঐ, গান নং ৩৬০

৩৩। ঐ, গান নং ৫৫৬

৩৪। সঙ্গীত সংকলন, গান নং ১১২

৩৫। ঐ, গান নং ১৪৯

৩৬। ঐ, গান নং ১২১

৩৭। ঐ, গান নং ১৬৯

----০----

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যমূল্য

ভবাপাগলার গানের তত্ত্বমূল্য যেমন - রয়েছে ; তেমনি রয়েছে তাঁর সাহিত্যমূল্য । জীবনের বিপুল অভিজ্ঞতালব্ধ এবং আধ্যাত্মিক সাধনালব্ধ জ্ঞানকে প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেছেন - তা ছিল অলংকারে বিভূষিত। নিসর্গ, দৈনন্দিন জীবন, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রী ; তেমনি আরও অনেক উপাদানে নির্মাণ করেছেন তাঁর তত্ত্বপ্রধান গানের আঙ্গিক ।

আমরা এখানে ভবাপাগলার গানের আঙ্গিকগত বিশ্লেষণ করে শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের প্রয়োগ নৈপুণ্য এবং তাঁর শব্দশৈলী, এক কথায় তাঁর গানের সাহিত্যমূল্য সম্পর্কে আলোচনা করব ।

অলঙ্কার শাস্ত্রবেত্তাদের মতে অলঙ্কার - দু'প্রকার । শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার । শব্দালঙ্কারগুলির মধ্যে অনুপ্রাস , যমক ও শ্লেষ এ ক'টিই প্রধান । অর্থালঙ্কারকে আবার দু'ভাগে বিভক্ত করে দেখানো হয়েছে । এক, সাদৃশ্যমূলক ; দুই, বৈসাদৃশ্যমূলক । সাদৃশ্যমূলক অর্থালঙ্কারের মধ্যে উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, সমাসোক্তি প্রভৃতির ব্যবহার সচরাচর পরিলক্ষিত হয় । ভবাপাগলার গানে এ সব অলঙ্কারসমূহের ব্যবহার নৈপুণ্য কতখানি - তা বিশ্লেষণ করে দেখা যাক ।

১। অনুপ্রাস: একই বাক্যে অনুবর্তী বিভিন্ন শব্দের একটি বা একাধিক বর্ণের পুনরাবৃত্তি থেকে আমরা যে ধ্বনি সৌন্দর্যকে অনুধাবন করে থাকি - তাকে আমরা বলি অনুপ্রাস । ভবাপাগলার গানে ব্যবহৃত অনুপ্রাসগুলির দু'একটি নমুনা দেখান হল:

ক. ভবার বাক্য সত্য,
কভু খণ্ডু কভু তথ্য । (সঙ্গীত সংকলন, গান নং ২)

Dhaka University Institutional Repository

খ. [illegible], [illegible], [illegible] আদি

[illegible] [illegible] (সঙ্গীত সংকলন, গান নং ৮)

গ. [illegible] [illegible], [illegible] ।

[illegible] . [illegible] , (এখ) একবার [illegible] ।

(সঙ্গীত সংক. , গান নং ২)

২। উপমা: সংক্ষেপে বলা যায়, সমানধর্মবিশিষ্ট দুটি ভিন্ন জাতীয় বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য দেখানোকেই উপমা বলা হয়। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত উপমাবাচক শব্দগুলি হল মত, যেন, ন্যায় প্রভৃতি। ভাওয়াইয়া গানে এরূপ অজস্র উপমার সমাবেশ দেখা যায়। একটি উদাহরণ দেই, -

[illegible] অগ্নিসম প্রজ্বলিত তাপে

ভূমিকম্প [illegible] ভিতর কাঁপে । (সঙ্গীত সংকলন, গান নং ১০৬)

৩। রূপক: উপমেয়কে যখন উপমানের সাথে অভেদ কল্পনা করা হয়, তখন তা হয়ে উঠে রূপক অলঙ্কার। রূপকালঙ্কারে একমাত্র উপমানেরই ধর্মপ্রাধান্য পায়। ভাওয়াইয়া গানে উপমার ন্যায় রূপকাশ্রয়ী, অনেকটি পদ রয়েছে। যেমন,-

[illegible] দুর্বল, তাতে নৌকা [illegible] ।

[illegible] বাইলাম নৌকা না কাটাইলাম জল ॥

(সঙ্গীত সংকলন, গান নং ১৭৫)

Dhaka University Institutional Repository

খ. ওরে কে বসিয়ে ভবনদীর পর পারে ।
খেয়ার মাঝি ডাকিছে ঐ করুণ কন্ঠে-কেমন স্বরে ॥
(সঙ্গীত সংকলন, গান নং ১১২)

'মনমাঝি' এবং 'ভবনদী' প্রভৃতি এখানে রূপক অলংকার । উপমান হচ্ছে মাঝি, নদী এবং উপমেয় মন, ভব । উপমানের অর্থই প্রাধান্য পেয়েছে এখানে ।

৪। সমাসোক্তি : অপ্রাণীবাচক বস্তুকে প্রাণীবাচকরূপে প্রকাশ করলে সমাসোক্তি অলঙ্কার হয় । ভবাপাগলার গানে এরূপ সমাসোক্তির সমাবেশ পরিলক্ষিত হয় । যেমন, -

(আমায়) বিদায় দেবে কবে পৃথিবী ।
(আমি) মনের তুলিতে আঁকিয়া লইলাম,
(ওগো) তোমারই, সুন্দর ছবিটি ॥

এখানে 'পৃথিবী'কে মানুষরূপে কল্পনা করে তার কাছে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, সে তাঁকে কবে বিদায় দেবে ?

ভবাপাগলার গানের আরও একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করে থাকি - তা হল, তিনি তাঁর তত্ত্বচিন্তাকে সাধারণ জীবন চিত্রের মধ্যদিয়ে প্রকাশ করেছেন । আর এখানেই রয়েছে তাঁর সাহিত্যরসের পরিচয় । যেমন, তাঁর প্রকৃতি বিষয়ক একটি গানে,-

ধুলোমাটি সার যার, সমান সমান,
বাহ্যজ্ঞান রহিত, সেই শিশুভগবান ।

Dhaka University Institutional Repository

নাচে সেই শিশুর মত, সেই ভগবান,
জ্ঞানে, দুঃখে, তুচ্ছতায়, সদানন্দে হাসে ।।

(সঙ্গীত সংকলন, গান নং ১০৩)

এখানে শিশুর সাথে ভক্তের জীবন-আচরণ ও বৈশিষ্ট্যের তুলনা করা হয়েছে। তেমনি, সংসারে বাস করে, ভগবানকে যে কত সহজে ডাকা যায় তাও বলে দিয়েছেন—পাগল,-

শিশু যেমন খেলতে থাকে,
খেলতে খেলতে মাকে ডাকে,
সংসারেরই খেলার মাঝে,
তেমনি খেলেই ডাক না ।

(সঙ্গীত সংকলন, গান নং ১৪২)

স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক এভাবে প্রাঞ্জল হয়ে ফুটে উঠেছে তাঁর এ গানে । রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'সহজ কথা যায় না বলা সহজে।' সাধক কবি তবু, কঠিন তত্ত্বের কথাও অতি সহজে বলেছেন । সাধারণ শ্রেণীর ভক্তের কাছে বোধগম্য করে তোলার জন্য তিনি এ-রীতি অনুসরণ করেন ।

এ ছাড়া ভবাপাগলার গানে প্রবাদ-প্রবচনের সমাবেশ, সঙ্গীত মাধুর্যকে আরও বেশী রসোজ্জ্বল করে তুলেছে । যেমন, প্রবাদ,—

ক. বামন হইয়া ধরিতে যাই চাঁদে ।

(সঙ্গীত সংকলন, গান নং ৬১)

খ. ভাত খাও যাঁর ঠাকুর চিন না ।

(সঙ্গীত সংকলন, গান নং ১৮৩)

Dhaka University Institutional Repository

গ. মনের মধ্যেই মানুষ মারে বেশী।

(সঙ্গীত সংকলন, গান নং ১৪৮)

ঘ. রং করো না, ঢং করো না।

(সঙ্গীত সংকলন, গান নং ১৫৩)

ঙ. নিজের বুদ্ধি শুভঙ্করী,
পরের বুদ্ধি গলায় দড়ি।

(সঙ্গীত সংকলন, গান নং ১১১)

— প্রভৃতি।

পাঠক, অবশ্য লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন যে, ভবাপাগলার অধিকাংশ গানই ছিল রাগ-ভিত্তিক। সঙ্গীতে রাগের প্রাধান্য-এটি একটি সঙ্গীতের প্রধান গুণ। পাশাপাশি তাঁর গানে কাব্যগুণও সমৃদ্ধি লাভ করেছে। তাই ভবাপাগলার গানগুলি একাধারে সঙ্গীত ও গীতিকবিতা। কারণ অনেক স্থলে সঙ্গীতময়তার পাশাপাশি তাঁর গানে কাব্যধর্মের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

কবিতা হল শব্দব্রহ্ম। কবিতার শরীর শব্দ দ্বারা তৈরী। কিন্তু শব্দের সুবিন্যস্ত রূপই কবিতাকে রূপময় করে তোলে। একই শব্দ দিয়ে কবিতার শরীর কত বেশী সৌন্দর্য-সুষমায় পরিমণ্ডিত হতে পারে, অর্থ-বৈচিত্র্য আনয়ন করতে পারে, তা আমরা নিম্নের রচনাটিতে উপভোগ করতে পারি,

চাঁদ ঘিরে চাঁদ নাচে রে, চাঁদ ঘিরে চাঁদ হাসে।
চাঁদের মালা চাঁদের গলে, চাঁদ ভাল, তাই বাসে রে,
চাঁদ ভাল তাই বাসে॥

Dhaka University Institutional Repository

চাঁদের মেলা, চাঁদের মেলা, চাঁদের দোলা আকাশে,,
তাই হল চাঁদ, পূর্ণিমার চাঁদ, রাহুতে চাঁদ গ্রাসে ।
ভবা তাই, গৌর চাঁদের, রইলো চরণ পাশে রে ।
রইলো চরণ পাশে ।।

(ভবাপাগলার সাধনা সঙ্গীত সংগ্রহ -১, পৃ. ৩২৮)

ভবাপাগলার গানে বেশ কতগুলি সুন্দর চিত্রকল্প বা ছবি আমরা উপভোগ করে থাকি । যেমন,-

এখনও সেই বৃন্দাবনে বাঁশী বাজে রে ।
(যাঁর) বাঁশী শুনে বনে বনে ময়ূর নাচে রে ।।
আছে সেই রাধারাণী ।
বাঁশী শুনে পাগলিনী ।
অষ্টসখী শিরোমণি সব-সাজে রে ।।
আছে সেই গাভীগুলি,
গোচারণে ছড়ায় ধূলি ।
সখাসনে কোলাকুলি রাখাল রাজে রে ।।

(সঙ্গীত সংকলন, গান নং ১৬)

তাঁর ভাটিয়ালী বা অন্য গানেও এইরূপ চিত্রকল্প পরিলক্ষিত হয় ।

বাঁশের মাচা বান্ধ সকালে,
ঐ নাই ভাঙ্গালার তলে রে ।

Dhaka University Institutional Repository

(উঠেছে) চন্দ্রমাতে কত তথা (শেষ)
তত যাই না ভুলে রে ।।

(সঙ্গীত সংকলন, গান নং ১৫৪)

পরিশেষে বলতে হয়, গানের সার্থকতা প্রধানতঃ সুরের ওপর নির্ভরশীল হলেও, তার বাণীর গুরুত্বও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। শৈল্পিক কলাকৌশল বাণী সুরের পাখায় ভর করে শ্রোতার চিত্তে আশ্রয় করে। তাই তাঁর গানগুলির তত্ত্বচিন্তা শৈল্পিক-সুষমার মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়েছে। শব্দের প্রয়োগে, অলঙ্কারের ব্যবহারে তত্ত্বাগ্লামাগ্ গানগুলির তত্ত্বমূলতার পাশাপাশি সাহিত্যমূল্যও রয়েছে। ভাবরস ও সুর-সৌন্দর্য বাংলার সঙ্গীতকলাকে যে স্বতন্ত্র মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য দান করেছে, সাধক কবি তাঁর সঙ্গীতেও তা প্রতিফলিত হয়েছে।

-----0-----

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

সঙ্গীত সংকলন

Dhaka University Institutional Repository

সাধন সঙ্গীত

(১)

গানই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা ।
লাগে না ফুল চন্দন, গন্ধ, তন্ত্রও লাগে না ॥

আকর্ষণ, করে সবার,, মন আর প্রাণ,
গাহরে, মন আমার,, গাহ প্রভুর গান ।
ভুলে যায় মধুর গানে,, (সেই) নিষ্ঠুর ভগবান ,,
না এসে পারে না ॥

সঙ্গীত, সাধনা কর, শক্তি পাবে মনে,
মহাশক্তি, বসিবেন, হৃদয় - আসনে ।
বিষধর, সর্প, ঠাকুর দেবপঞ্চাননে,,
(হরি) নামগানে মত্ত শিব, নেত্র মুদে না ॥

ভবার ভবানী গানের ছন্দগুলি ,,
মহানন্দে, উচ্চসুরে বলে হরি-কালী বাণী ।
শিহরণ জাগরণ - দুলে সদা শ্রোতাগুলি,,
প্রেম পরশেতেই গতি মধু মধু রচনা ॥

Dhaka University Institutional Repository

(২)

দুর্বলতায় হয় না কোনও সাধনা।
জাগাও সবারই প্রাণ, কত প্রতিষ্ঠান,,
তুমিই ভগবান,, সুদৃঢ় এ কল্পনা।।

নির্ভীক হবে তুমি, নাই ভূত, নাই দানব,,
সবাই একই ব্রহ্ম, ব্রহ্মচারী শ্রেষ্ঠ মানব।
স্বর্গ, নরক, এই স্থান,
তুমি যে মায়ের সন্তান।
অমর তুমি হবে, কোন কালেও মরিবে না ।।

ব্রহ্মান্ড জুড়িয়া আছে,, মনে রেখো,, মহা শক্তি ,,
অঘটনে টলিও না, রেখো বিশ্বাস, রেখো ভক্তি ।
ওবার বাক্য সত্য,
কভু প্রভু, কভু ভৃত্য,
অনন্ত কালস্রোতে, এ বিন্দু আনাগোনা ।।

Dhaka University Institutional Repository

ভগবান বিষয়ক গান

(৩)

হাম্বির - রাগ

পাপীর তরে আসেন ভগবান।
ভক্তের তরে নাই প্রয়োজন, শুন, ওগো বিশ্বপ্রাণ ।
এ ব্রহ্মান্ডে, কালে কালে, ভক্তমুখে তাঁর গুণগান ।।

বহু পাপী, এক ভগবান,
যুগে যুগে, হয় অধিষ্ঠান ।
ত্রেতাতে রাম, দ্বাপরে শ্যাম,,
কলিতে ঐ গৌরহরি হরিনামে গলায় পাষাণ ।।

কালী আমার কালহরা,,
মনোমোহিনী ভবদারা ।
ভবার তরে খাঁড়া ধরে, শিবের বুকে দন্ডায়মান ।।

(৪)

কেউ নাই যার, তার আছে ভগবান।
সহিবার ক্ষমতা দিয়েছ বলিয়া, সহি কত আমি ঘোর অপমান।।

সবাই সাধু সবাই ধার্মিক
আমি মহাপাপী, প্রাপ্য মম ঠিক।
সাধুর ভাগ সবাই পাবে যেটুক্ -
"তার চাইতে" - ঢের ঢের বেশী আমার পাপের পরিমাণ ।

Dhaka University Institutional Repository

আমিই তো জগতে জগৎ পিতার,
এক মাত্র পাপের আমি অংশীদার।
সামান্য সাধুতার কি মোর দরকার
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দস্যু বলীয়ান।।

ভবা পাগলার মনের এই উপাসনা,
পতিতপাবন আমায় পায় ঠেলিবে না।
সার্থক জীবন এই তো কামনা,
(আমায়) এক সুরে সবাই হান বাক্যবাণ।।[১]

(৫)

বারোয়া - কাওয়ালী

বদন ভরিয়া তাঁকে ডাক।
কর সংসার এটাও যে তাহার হইও না সন্ন্যাসী, এখানেই থাক।।

১. রাখিও সবার মন, ভাবিও একজন,
দিও না বিসর্জন, (শুধু) মনকে বাঁধিয়া রাখ।
(হবে) সার্থক জীবন তোমার, সে বিনে বন্ধু নাই আর,
(তাই) গোপনে হৃদয়েতে তাঁর ছবি আঁক।।

২. মানব জনম তোমার, কতদিন রবে আর,
এসেছ যাবে আবার, (তাই) মানুষের মত তুমি থাক।
আসা-যাওয়া, এ যে নদীর খেওয়া,,
নিশ্চয়ই যাইতে হবে, ঠিক জেনে রাখ।।

১। ১৩৫৪সন ১৫ই অগ্রহায়ণ, গড়পাড়া(১০টা বেলা)'য় রচিত।

Dhaka University Institutional Repository

৩. অমূল্য সময় গেলে, ভাগ্যে কি আর তাই মিলে,
দিও না তাই পায় ঠেলে, সময় থাকতে তাঁরে ভাব।
পেয়েছ মধুর বদন, কর তাঁর নাম উচ্চারণ,
(সদা) ভকত পদধূলী ভব অঙ্গে মাখ ॥

৪. ওরে পাগলার কথা হবে না বৃথা,
সে যে হৃদয়ে গাঁথা, অযথা কেন মন হাঁক।
সুখ দুঃখের অনুরাগে, যেমনা তুমি চলে,
প্রেমের মধুর কথায় সব কথা ঢাক ॥

(৬)

বন্ধু তোমারই নাম,,
আনিয়াছ তুমি, পালিতেছ তুমি,,
অন্তিমে লইও প্রণাম॥

কোথা তুমি থাক,
কোথা হ'তে মোরে ডাক,,
অন্ধ আমি, বধির আমি,
হইও না কো মোর বাম॥

পতিতের তুমি প্রভু,
"জানি" ফেলিবে না মোরে কভু,,
পতিত আমি, দয়াল তুমি,
পারের কান্ডারী শ্যাম ॥

Dhaka University Institutional Repository

চঞ্চল তুমি অতি,
গম্ভীর তব গতি,,
দানব আমি, দেবতা তুমি,
তবা ভাবে অবিরাম ।।

Dhaka University Institutional Repository

গুরু বিষয়ক গান*

(৭)

আমায় কি মন্ত্র দিবেন, গুরু মশাই।
শুধু বেগার খেটে ম'লাম,
পথের সম্বল কিছু নাই ॥

কিছু নাই মোর বিদ্যাবুদ্ধি,
দেহ মনও নাইক' শুদ্ধি।
ভব ব্যাধির নাইক দাওয়া,
বিষয় জ্বালায় মরে যাই ॥

গুরু, তোমার কাছে নিলে দীক্ষা,
কুসংস্কারের দিব শিক্ষা।
(আমি) মহা মন্ত্রের করব ভিক্ষা,
সন্ধ্যাকালে যা' তাই ॥

দুদিনের এই ভবের হাটে,
বল, দিন মোর কেমনে কাটে।
দিন মজুরী খেটে খেটে,
একটি পয়সাও নাহি পাই ॥

ভবা পাগলার দুঃখের কথা,
সারা বিশ্বে রইলো গাঁথা।
গুরুমন্ত্র যায় না বৃথা,
তত্ত্ব কথা কারে জানাই ॥

---

* [illegible] গুরু বিষয়ক গানগুলি শ্রী [illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(৮)

(ওগো) গুরু আমায় কর করুণা ।
ঝড়-তুফানে বেয়ে যাব (গুরু)
তোমার দেওয়া তরীখানা ।।

ভব নদীর ভীষণ তুফান,
কেঁপে কেঁপে উঠে পরান।
তুমি গুরু সকল আসান,
মুশকিলে যেন পড়ি না ।।

গুরু যদি আমার সহায়,
তবে কেন করব হায় হায় ।
গুরু, তোমার পায়ে সকল উপায়,
চরণ ছাড়া ক'র না।।

সকল তীর্থ, সকল কর্ম,
তুমি গুরু বড় ধর্ম ।
গুরু ছাড়া কে বুঝবে মর্ম,
গুরুই শ্রেষ্ঠ উপাসনা ।।

গুরু অগতির গতি,
(গুরু) একাধারে শিব-পার্বতী ।
গুরু কৃষ্ণ,, গুরু শ্রীমতী,,
গুরুই গঙ্গা, যমুনা ।।

Dhaka University Institutional Repository

ভবার গুরু নিরঞ্জনা,
সেকথা কেউ জানেনা ।
যে জানে, সে কথা কয় না, -
(সে) জড়িয়ে আছে পা দু'খানা ।।[১]

(৯)

গুরু বাক্য শিরোধার্য্য যে জন করিতে পারে ।
গুরু হ'তে শিষ্যের গুণ তিলে তিলে বাড়ে ।।

গুরু শুধু মন্ত্র দেন, দু'টি কর্ণমূলে ,,
শিষ্যের ভক্তি মুক্তা ঝিনুকেতে মিলে ।
সেই ভক্তির মুক্তার মালা(রহে) গুরুর ভান্ডারে।।

গুরু হ'তে শিষ্য বড়, কৃষ্ণ হ'তে গুরু,
মহিমা মাহাত্ম্য ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু ।
নিষ্কাম হরিনাম (জপ) এক'শ আট মন্দিরে ।।

ভবা পাগলার শিব গুরু, গুরু যত্র জীব,
যত্র নারী, তত্র গৌরী, যত্র জীব শিব ।
মহা নিদ্রায়, গুরু মন্ত্র জপে মূলাধারে ।।

১। দ্রষ্টব্য:-ভবা পাগলার সাধনা সঙ্গীত সংগ্রহ-১, পৃ. ২৪

(১০)

গুরু, শিষ্যের অবহেলার গতি, কানে মন্ত্র দেওয়াই সার ।
সারা জীবনেও, আর, দেখাশুনা নাই, -
কোনই নাই, আর দরকার ॥

গুরু বেঁচে আছে, কি মরে গেছে,
সে-সকল বার্তা শুধুই মিছে ।
স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বেড়েই চলেছে,
নিত্য নূতন আবিষ্কার ॥

তবার এসব সত্য কথা, সত্য প্রমাণ,
নিজ নিজ চিত্ত, কর অন্বেষণ,
মিথ্যা নহে অতি প্রধান ॥

সামাল দেওয়া যায় না,
কারুর মানা মানে না,
তবুও বলি, হুঁশিয়ার ॥

(১১)

গুরুকে ধরতে হলে, ঠিক কর তোমার মন।
চঞ্চল হও, ক্ষতি কি, ঠিক থেকো, ডাকবে যখন ॥

একটি ডাকেই পাবে সাড়া,
(যারা) নির্বিকার, জগৎ ছাড়া।
দেহ, স্মৃতি, মৃত্যু, জরা,
(সাবধান) এই লতাতে কন্টক ভীষণ ॥

Dhaka University Institutional Repository

ভয় পাবে না ভাব ছেড়ো না,
বিভীষিকার এ আনা-গোনা ।
ঐ তো গুরুর ছলনা,
পরীক্ষায় পাশ করিবে, পাবেরে মন, পরম রতন ।।

গুরু কইবে (যাহা) কানে কানে,
শুনিবে তাহা, মনে প্রাণে ।
দেখবে তখন, পদ্মাসনে,
গুরু বসবে হৃদিপদ্মে, ভবার বচন ।।[১]

(১২)

গুরুকে ভক্তি করা সহজ কথা নয় ।
গুরু-অবিশ্বাসে, নরক নিশ্চয় ।।

গুরু নিন্দা মহাপাপ, মনে যেন থাকে,
বুঝেসুঝে গুরু ক'র, গুরুপদ রেখে ।
মহা বিপদ যায় চলে, (যদি) গুরু সঙ্গে রয় ।।

যত দেবতা বল, গুরু সবার বড়,
শ্রীরামচন্দ্র গুরু দেবমহেশ্বর ।
ভবার শিব গুরু, মহাদেব হয় ।।

গুরু প্রদত্ত নাম সদা মনে রেখো,
জপ-তপ যত বল, গুরু বলে ডেকো ।
যম-যাতনা দূরে যাবে, ভবা পাগলা কয় ।।

১। দ্রষ্টব্যঃ-ভবা পাগলার সাধনা সঙ্গীত সংগ্রহ-১, পৃ. ২৭

Dhaka University Institutional Repository

(১৩)

দীক্ষা নিয়েই মনে ক'র না, কিনে নিলাম গুরুর লোটা ।
গুরু মিলে পথে-ঘাটে, শিষ্যের মত শিষ্য ক'টা ॥

শিষ্য পাওয়া যায় না মোটে,
দেখেছি মন বহু ঘেঁটে ।
প্রাণ যেতে চায় এক হোঁচটে,
নাকের ডগায় তিলক ফোঁটা ॥

গুরু মন্ত্র কানে নিয়ে,
গুরু ছেড়ে রয় পালিয়ে ।
গেল কিন্তু সব হারিয়ে,
যত কিছু পুঁজি পাটা ॥

মুখে কেবল ফটর ফটর,
(যেন) গাছের ফোঁটা বেলি-টগর ।
একটি বেলাই, তাদের রগড়,
ছিঁড়ে যখন ফুলের বোঁটা ॥

বেশ্যাবাড়ী, গুরু গেলে,
শিষ্যরা সব থুথু ফেলে ।
গুরু ছাড়া অন্ত কালে,
তরে গেল কোন্ বেটা ॥

ভুলভ্রান্তি মানুষ মাত্রেই,
এই আছি, এই নেই ।
ওরা গুরু, শিষ্য বেয়াই,
বেয়াড়া পথে হাঁটা ॥

Dhaka University Institutional Repository

(১৪)

মন-গুরুর নিকট হ'তে দীক্ষা নিয়ে যাও ।
নয়ন গঙ্গাজলে, (তুমি) স্নান করিবে যাও,
যাও, যাও, (শীঘ্র) স্নান করিবে যাও ॥

তাঁর আদেশে, বীর সাহসে সাধন-রণে যাও,
হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, হরে হরে রাম ।
অঙ্কুশ-মুদ্রা অস্ত্রে, (তুমি) উন্মাদকে থামাও ॥

চোর, দস্যু, বহু পশু, লুকিয়ে থাকে যারা,
দেহ বন-জঙ্গলে, বাস করিছে তারা ।
নিঃশ্বাস বিশ্বাসের দমে তাদেরকে তাড়াও ॥

পবিত্র পথের মাঝে নাইরে কোনও কাঁটা,
নির্ভয়ে পথ হেঁটে যাও, লাগিবে না ঝাঁটা ।
ভাল-মন্দ, মন-মুকুন্দ, গুরু-গুণ গাও ॥

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কীট, কুটনীতির দল,
ওরা কহে, খুব সাবধান, এরাও করে ছল ।
গুরুর নাম ভরসা, প্রেম-বরষা, তাদেরকে হটাও ॥

Dhaka University Institutional Repository

(১৫)

যখন আলোটি নিভিয়া যাবে, আঁধার হইবে বিশ্ব-
এ ব্রহ্মান্ডে, কে কার গুরু, কে কার, বল শিষ্য ।।

সবার গুরু সেই ভগবান,
আনে-নেয়, যে বিশ্বের পরাণ ।
অনু, পরমাণু সবাই সমান, দেখিতেছ যত দৃশ্য ।।

দেখ নাই তারে, কি বুঝিবে আর,
ভুলেও ভাব নাই, কেমন আকার ।
(এই)অনন্ত রূপের নাই পারাবার, শান্ত-মধুর-দাস্য ।।

বিহরে সদা খন্ডে খন্ডে, পরম ব্রহ্ম এই ব্রহ্মান্ডে ।
পলকে পলকে, দন্ডে দন্ডে, মধুর মধুর হাস্য ।।

দিন যায় (মন) ভাব সেই গুরু,
তাঁর এক নাম বাঞ্ছা কল্পতরু ।
ভবা কয়, (মন) কেন এত ভীরু, হও তাঁর মত তীক্ষ্ম ।।

Dhaka University Institutional Repository

কৃষ্ণ বিষয়ক গান

(১৬)

এখনও সেই বৃন্দাবনে বাঁশী বাজে রে ।
(যাঁর) বাঁশী শুনে বনে বনে ময়ূর নাচে রে ॥

আছে সেই রাধারাণী,
বাঁশী শুনে পাগলিনী ।
অষ্ট সখীর শিরোমণি, নব সাজেরে ॥

আছে সেই গাভীগুলি,
গোচারণে ছড়ায় ধূলি ।
সখা সনে কোলাকুলি রাখাল রাজে রে ॥

এখনও সেই যমুনা,
জল ভরিতে যায় ললনা ।
কদমতলা সেই ছলনা কৃষ্ণ আছে রে ॥

এখনও সেই ব্রজবালা,
বাঁশী শুনে হয় উতলা ।
গাঁথে বন ফুল মালা বন মাঝে রে ॥

আশা ছিল মনে মনে,
যাব আমি বৃন্দাবনে ।
ভবা পাগলা, রয় বাঁধনে, মায়ার কাছে রে ॥[১]

১। গায়ক: চুনীলাল ঘোষ, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, নিজস্ব সংগ্রহ

Dhaka University Institutional Repository

(১৭)

ওহে বংশী বাহারি, রাধা প্যারী
গোয়ালা, গোপবালা মনহারি ।
তোম্ আঁখির ঠারে, মিঠুয়া সুরে
মনটি লহ চুরি করি ।।

চুপি চুপি তোম্ চতুর চাতক নব ঘনশ্যাম
বৃন্দাবন, কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমর গুঞ্জন অবিরাম ।
কেইস্যা কুটির মে, রহিন ছুপিয়ে (প্রভু)
কহিয়া দু'টি পায়ে পড়ি ।।

হায় হ্যায় রাধারাণী রাজকুমারী যুবতী
তোম্ কৃষ্ণজী, একেলা হামার নহ
(তোম্) বিশ্বপতি ।।

ভবা কহত সদা, সদানন্দে,
তোম্ বহুৎ চালাক্ আদমী
ধন্য ধন্য বলিহারি ।।

(১৮)

কাহাঁ মেরা রাই, ঘুঁড়কে কানাই, পাগল হইয়া বনে বনে ।
রাখাল সনে, বৃন্দাবনে, গোচারণে, ফিরে হরি গোধূলি লগনে

মধুবন, কুঞ্জবন, উপবন আদি,
প্রেম-পরশনে যমুনা নদী,
বিহঙ্গম শুক-সারী, কহ কাঁদি কাঁদি,
বাঁশীটি বাজাও ধীরে মধুর বদনে ।।

Dhaka University Institutional Repository

রাইকে আনিয়া দিব তোমারি পাশে,
তুমি ভালবাস রাই, রাইও ভালবাসে ।
ভবা পাগলা তাই আনন্দে ভাসে,
মহানন্দ, পরমানন্দ যুগল মিলনে ॥

(১২)

কৃষ্ণ আমার প্রাণের ঠাকুর, দেহরূপী কালী পূজা করে ।
কেউ কি দেখেছ তারা, প্রতিটি জীবের অন্তরে ।

আগমে, নিগমে ধায়, বৃন্দাবন আর ঐ মথুরায় ।
পারাপারে নীল যমুনায়, বাঁশীটি বাজায় রাধা-সুরে ॥

কালী, কৃষ্ণ, নাই ভেদাভেদ,
ভাগবত, গীতা, চন্ডী-বেদ।
ভবা পাগলার অন্তু অভেদ,
ভিন্ন অভিন্ন নাই হরিহরে ॥

(১৩)

কৃষ্ণ বলে কাঁদে কাঞ্চনা ।
পাগলিনী রাধা কাঁদে, আর কাঁদে যমুনা ॥

(কৃষ্ণের) বাঁশী বাজতে থাকে,
নীল যমুনার বাঁকে বাঁকে,
রাধে তখন বাঁশী কাঁখে, কি করবে সে জানে না ॥

Dhaka University Institutional Repository

নীল বসনে পা দেয় ঢাকা,
আর কি ঘরে যায় রে থাকা ।
কৈ কৈ মোর কৃষ্ণ বাঁকা, মন ছুটে তো পা চলে না ॥

রাধরাণীর শরণ নিলে,
তবেই কৃষ্ণের দেখা মিলে ।
রাধে তুমি কোথা গেলে, কৃষ্ণ প্রেমের গিনি সোনা ॥

সে রাধার প্রেম পাবে কোথা,
নাইকো কারো তেমন বাধা ।
বাধা থাকলে, মিলতো আধা, নাই যা পেলে ষোল আনা ॥

যমুনা আর রাধারাণী,
আমায় কৃপা করবে জানি ।
দুই অঙ্গো এক অঙ্গখানি, গৌর কাঁদে, কৃষ্ণ কাঁদে না ॥

কৃষ্ণ কেবল বাজায় বাঁশী,
তাই তো কৃষ্ণ ভালবাসি ।
ভবা তাই কইছে হাসি, কান্নাকাটির ধারধারিনা ॥

(২১)

বাঁশীর সুরে মাতিয়ে দিলো, আমার ঠাকুর শ্রী শ্রী গোবিন্দ ।
কি আনন্দ, কি আনন্দ, এ যে মহা পরমানন্দ ॥

Dhaka University Institutional Repository

একা একা বাজায় বাঁশী,
কিবা দিবা কিবা নিশি ।
পূর্ণিমার চাঁদ কৃষ্ণ শশী,
মা যশোদা, পিতা নন্দ ।।

এদের পালন ছন্দে,
সখা সখী ভক্ত বৃন্দে ।
নীল যমুনার স্রোত বন্দে,
প্রেম পবন ঢেউ মন্দ মন্দ ।।

ভবার শ্রীকৃষ্ণ দর্শন,
ভুবন ভরিয়া আছে ভুবনমোহন ।
ভবার ছন্দে বন্দে শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ,
সর্বজন প্রিয় কত না আনন্দ ।।

(২২)

ব্যথার বাঁশীটি, বাজায় করুণ সুরে,
যমুনারই তীরে আমারই প্রাণ গোবিন্দ ।
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই, শুধু রাই রাই,
সে যে পরমানন্দ ।।

রাধে আয়, রাধে আয় বলি,
ডাকিছে বাঁশীতে বনমালী ।
কেন ঘরে বসে, এসো মন পাশে,
কেন একাকিনী কান্দ ।।

Dhaka University Institutional Repository

কহনা কথা, জানি তব ব্যথা,
ব্যথা হারি, হরি, আমি যথা তথা ।
কেন ভয় করো, কাহারে বা ডরো,
সুখ, দুঃখ মাঝে, আমি যে আনন্দ ।।

রাধার নয়নে শত ধারা বয়,
(তাই) শ্রীকৃষ্ণ যমুনা সকল সময় ।
কহে ভবা পাগলা, প্রেমেরই দোলা,
মৃদুল পবনে, বহে মন্দ মন্দ ।।

(২৩)

মধুর মূরতি তব শ্যাম, ওগো শ্যাম ।
মধুর মূরতি তব শ্যাম, ওগো শ্যাম ।।

বাঁশরীর গান, যমুনা উজান,
কেবলি বাঁশীতে গাহে, রাধা-রাধা নাম,,
রাধা-রাধা নাম ।।

বাঁকা দু'টি নয়ন, করে আকর্ষণ,
কৃষ্ণ মনো-চোরা, মদন মোহন ।
ঢুলু ঢুলু অঙ্গ, ওহে ত্রিভঙ্গ,
চরণে নূপুর বাজে, রুমুঝুমু অবিরাম ।।

ভবার ভুবনমোহন, বৃন্দাবনচারী,,
অপরূপ সুন্দর, বংশীধারী ।
যদি বৃন্দাবনে, রহিয়া গোপনে,,
খেলিছ সঙ্গে লয়ে শ্রীদাম-সুদাম ।।[১]

১। মূল পাণ্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত, ১৩৭৩সনে রচিত এ গানটি

Dhaka University Institutional Repository

(২৪)

খাম্বাজ - তেতালা

মন্দিরে মন্দিরে জাগ দেবতা ।
কাল প্রবাহে, হে সুপবিত্র, রাখিতে হইবে মান পুন ধারতা ॥

আদি অনন্ত কাল, সুদর্শন-ধারী,
পার্থ সারথী দেব, বৈকুণ্ঠ বিহারী ।
নেবে[১] এস মর্তে, রহিও না স্বর্গে,
দিখি পুনঃ চঞ্চল ভারতগীতা ॥

যুগ যুগান্তর, অবতীর্ণ কর্ণধার,
আবির্ভাব হও প্রভু লীলা অবতার ।
দলিত জীবগণ, কহদিন অচেতন,
ভবা পাগলা কহে, এস শান্তিদাতা ॥

(২৫)

মোহন বাঁশীটি বাজাইয়া, মনটারে করিল পাগল ।
নূপুরের রিণিঝিনি, শুনি মোর হিয়াখানি,
আনন্দে দুলিছে যেন শতদল ॥

কোন্ সুদূরের নদীর ঘাটে,
কদম্ব মূলে, ঐ বংশী বটে,
মধুর সুরে, টেনে নেয় নিকটে,
যমুনা শুনিয়া বহে কল্-কল্-কল্ ॥

১। নেবে < নাবিয়া < নামিয়া

Dhaka University Institutional Repository

ব্রজবালা সব শুনিয়া বেণু,
আকুলি-বিকুলি মনে, হেরিতে কানু ।
শুনি, ছুটে, যত কামধেনু,
    প্রেম নয়নে ভাসে, ছল্-ছল্-ছল্ ॥

কনকলতা দুলিছে কাননে,
শ্যামেরই বাঁশরীর মধুর তানে ।
বিহগ উড়িছে নীল গগনে,
    ডাকিছে, শুনিতে তারে, আয়রে বাদন ॥

শুনিয়া বাঁশরী, ত্বরা করে যায়,
বাজাবি যদি শ্যাম, আয়-আয়-আয় ।
নিধুবন ক'রে যে, আমার হিয়ায়,
    মধুর সুরে মোরে করে টলমল ॥

(২৬)

হরিগুণ গাহ, হরি-কথা কহ,
হরি, হরি বল, হরি, হরি বল ।

হরি-নাম কীর্তন, হরি নামে নর্তন,
হরি প্রেমে নয়ন, ঢল, ঢল,, ঢল, ঢল ॥

হরিনাম শ্রবণে, হরিনাম বদনে,,
হরি নামামৃত পানে, মগন থাক।
হরিনাম চিন্তা, তা-ধিন্-তা,, ধিন্-তা,,
হরি মৃদঙ্গ বাদে, বাজাও করতাল
    বাজাও করতাল ॥

হরি ভক্তগণ, হরি সর্বজন,,
হরিনাম বিতরণ করিতে থাক।
হরি দীনবন্ধু, হরি ভবসিন্ধু,
ভবার ভাবের তরী বেয়ে চল, বেয়ে চল ॥

Dhaka University Institutional Repository

রাধা বিষয়ক গান

(২৫)

ওগো রাধে, ঐ গো রাধে, এসো গো ত্বরায় -
এই কহিয়া কৃষ্ণ বাঁশীটি বাজায় ।
যমুনা জলে, কদম তলে,
নয়ন জলে কভু মুরছা যায় ॥

বাঁশীটি শুনিয়া, ময়ূর পেখম তুলি,
ডাকিছে রাধে রাধে, আয়রে চলি ।
বাজায় মুরলী, ঐ বনমালী,
কেন, বাধিনী ঘরে, আয় না ত্বরায় ।

কপোত-কপোতী সনে, বাকুম-বাকুম,
রাধে নপুর শোন্, ঐ রুমঝুম্, রুমঝুম্ ।
নপুর ধ্বনি শোন্, হইয়া নিঝুম,
একেলা কলসী-কাঁধে আয় যমুনায় ॥

কোকিল-কোকিলা, কহে কুহু-কুহু,
উড়ে আয় চলে আয়, মেলিয়া বাহু ।
এ পথের কন্টক, ওরে, বহু বহু,
কহিবার নয় রাধে, আয়, আয়, আয় ॥

জটিলা-কুটিলার ভয় করিস না রাধে,
কৃষ্ণ বাঁশীটি যদি 'রাধা' না সাধে ।
তবা পাগলা কহে, কে কারে বাঁধে,
বাধা মানিসনি রাধে, বেলা বয়ে যায় ॥

Dhaka University Institutional Repository

(২৮)

(আমি) কৃষ্ণ-যমুনায় যাব,, সিনান করিতে,, প্রাণ সখি ।
গাগরী সঙ্গে লহ,, কহ কৃষ্ণ কহ,, অহরহ,, সদা যেন, কৃষ্ণ নিরখি ॥

এক তিল না হেরিলে, কৃষ্ণ মনোময়,,
অসু যায় প্রাণবায়ু, যেন মনে হয় ।
কি করিব,,
কা'রে কহিব,,
সহিব কেমনে,, বল আঁখি ॥

আঁখি দু'টী ছুটে যায়, ত্বরিত না চলে মোর দেহ,,
কে আছ আমার বন্ধু,, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ ।
আঁখি দু'টী জলে ভরা,,
কৃষ্ণ লাগি বহে ধারা,,
মন চঞ্চল মোর, হ'ল উড়ো পাখি ॥

নিলাম্বর অম্বর,, শ্যামবরণী হেমকায়,,
দুরন্ত পবনে, উর্ণা উড়িয়া , উড়িয়া যায় ।
কোথা যাব,
কৃষ্ণ পাব ,
লজ্জা ভয়ের খোলস কৃষ্ণ পদে রাখি ॥[১]

১। এই গানটিতে ভবা পাগলার নামের কোন ভণিতা পাওয়া যায়নি।

Dhaka University Institutional Repository

(২৯)

বাঁশীতে দিস না রাধে কান,, (নইলে) থাকবো না তোর কুলমান ।
শক্ত কইরা, পক্ষিণী, গইড়া তোল, তোর সরল প্রাণ ।।

ঐ দেখ, স্থির যমুনা,,
ঐ দেখ নীল যমুনা ।
ভাটি ছাইড়া উজান চলে,
ডাইকা উঠে প্রেমের বান।।

ঐ দেখ, চঞ্চল পবন,,
ঐ দেখ, পাগলা পবন ।
এ-দিক, ও-দিক, যেমন্ দিক চলে,
ঠিক নাই তার কোন স্থান ।।

ঐ যে, কদমতলা,,
সেথায়, বড়ই জ্বালা ।
ফুল, পাতা সব ঝইরা পড়ে,
বইসা আছে কালাচান্ ।।

শোন্ ভবার কথা,
ওর যে, বাঁশী সাধা ।
কেবল তোরই নামে, বাঁশী বাজায়,,
নইলে ভাইঙ্গা দিতাম বাঁশীখান ।।

Dhaka University Institutional Repository

(৩০)

ময়লা রয়েছে তোর গায়,,
ধুয়ে নে,, ওলো সখী,, নীল যমুনায় ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম, - গা'রে সুখে অবিরাম,
প্রণাম কর না দু'টী পায় ।।

চেয়ে দেখরে তুই, কদম তলায়,,
মোহনীয়া ঐ, বাঁশরী বাজায় ।
যাঁহারি ছোঁয়ায়, পাপ চলে যায়,,
পরশিতে তাঁরে, ধরনা রাধায় ।।

বনফুল মালা নয়, মনফুল মালা,,
যত ভাল বাসে ঐ বংশীওয়ালা ।
যত কুলবালা, আর তুই অবলা,,
সিনান করিয়া ওরে, ত্বরা চলি আয় ।।

এখনি আসিবে রাই,, স্নান করিতে,
কৃষ্ণের, মধুর, বাঁশী শুনিতে ।
কলসী কাঁখে, কা'রে যেন ডাকে,
ভবা এই ফাঁকে, চরণে লুকায় ।।[১]

১। গায়ক -স্বর্গীয় রাইচরণ কর্মকার,আমতা,বালিয়াটী, নিজস্ব সংগ্রহ ।

Dhaka University Institutional Repository

(৩১)

যেওনা, যেওনা রাই, ব'স বটতলে ।
ধনি, যেওনা:
আসিতে পেয়েছ ব্যথা, চরণ কমলে ।।
ধনি, যেও না:

মধুর বৃন্দাবনে,
বাঁশী বাজে নিশিদিনে ।
পাগলিনী তুমি শ্যামে,
তুমি কি ঐ নীল যমুনা।। যেও না:

গোকুলের ঐ কালো ছোড়া,
কেমন যেন, পাগলপারা ।
বাজুক, বাজুক তাঁহার বাঁশী,.
তাহা তুমি শুনো না।। যেওনা:

Dhaka University Institutional Repository

গৌরাঙ্গ বিষয়ক গান

(৩২)

আজ কৃষ্ণ হ'ল লাল ,, গৌর হ'ল কালো ,,
বড়ই ভালোরে ,, বড়ই ভালো,, বড়ই ভালো।
বৃন্দাবন আর নবদ্বীপ, এক হয়ে আজ গেল রে ,,
এক হয়ে আজ গেল ॥

পিচকারী হাতে রাই, রঙ খেলিবার লাগি,,
বিষ্ণু-প্রিয়া,, লক্ষ্মীপ্রিয়া কৃষ্ণ ভাজন মাগি ।
দ্বাপর আর কলিযুগে সম্মিলন হ'লরে,, সম্মিলন হ'ল ॥

ভবার লেখনী বাঁকা,, বাঁকা কিছু নয় ,,
বৃন্দাবনে কৃষ্ণবাঁকা ,, (নদীয়ায়) সরল গৌরাঙ্গ রায় ।
তাই ভেবে ভবা পাগল হ'লরে ,, ভবা পাগল হ'ল ॥

(৩৩)

কে রে তোরা ,, আয় যাবি আয়,, হরিলুটের বাজারে ।
আপনি হরি,, করে ধরি,, যে যা চাইছে,, দিচ্ছে তারে ॥

জাত মানে না,, কুল মানে না,, ধরে দিচ্ছে কোল ,,
সোনার মানুষ ,, দেখে ভুলে যাবি ,, (বলে) হরি হরি বোল।
গায়ে নামাবলী ,, মুনি ঋষির মন হরে ॥

Dhaka University Institutional Repository

আজানুলম্বিত ভুজ ,, কাঁপিত পুলকে ,,
সর্ব্ব অঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গ ,, দেখে যারে এসে তাঁকে ।
ললাটে তিলক আঁকা ,, এই দেশেরই প্রেমের রাজা ,,
প্রেম বিলাতে এসেছে রে ॥

ওরা তাঁরে দেখে এসে হয়েছে পাগল ,,
সদাই পাগল ,, পাগল বেশে কাঁদে অবিরল ।
হাসির ছলে কেঁদে ফেলে ,, ঘুরে বেড়ায় দুয়ারে দুয়ারে ॥

(৩৪)

কোথা হ'তে এসেছে - এক নামের ফেরিওয়ালা ।
আর কিছু তাঁর নাই ক' সঙ্গে ,, শুধু হরিনামের ঝোলা ॥

দু'টী চোখে জল ,, কেবল হরি হরি বলে ,,
মালতী ফুলেরি মালা সদা গলে দোলে ।
ভাবে অঙ্গ ঢুলু ঢুলু ,, (বুঝি) কৃষ্ণ গোয়ালা ॥

ভাব ভঙ্গিতে ধরা পড়ে ,, দু'টী নয়ন দেখে,,
পথের ধূলি , পথের কাদা সদা অঙ্গে মাখে ।
সবাইকে সে আপন করে,, প্রেম মাতোয়ালা ॥

Dhaka University Institutional Repository

বেলা গেল,, সন্ধ্যা হ'ল, এসে গেল রাত্রি,,
একা একা কোথা চলছো,, ওগো পথ যাত্রী ।
হরি নামের ভেলা হাবি ,, ডাকে ভবাপাগলা॥

(৩৫)

(আজ) গৌরাঙ্গ লালরে,, আমার গৌরাঙ্গ লাল,,
নিতাই প্রেমে মাতাল রে,, নিতাই প্রেমমাতাল ।
শ্রীঅদ্বৈত, গদাধর, ভকত কাঙ্গাল রে, ভকত কাঙ্গাল ॥

শ্রীবাস অঙ্গনে,,
কীর্তনে কীর্তনে :
ফাগুয়া, আবীর হ'ল লালে ঐ লাল রে, লালে ঐ লাল ॥

নদীয়ার রাঙ্গা মাটি,,
নদীয়ার বসত বাটী ।
কোটি, কোটি জনম, মহাভাগ্য ফল রে, মহাভাগ্য ফল ॥

ভবা ফাগুয়া দিনে,,
নিবেদন,, ঐ শ্রীচরণে।
নদীয়া, শ্রীবৃন্দাবনে,, একই খেয়াল রে, একই খেয়াল॥[১]

১। দ্রষ্টব্যঃ- ভবাপাগলার সাধনা সঙ্গীত সংগ্রহ-১, পৃ. ৩৬৩

Dhaka University Institutional Repository

(৩৬)

ঠাকুর আবার ঠাকুর খোঁজে,,
খুঁজে খুঁজে ঠাকুর হয়রান ,
দেহটি নিয়ে কি, মনকে বাঁধা যায় ,,
মনটাই যে রে ভগবান ॥

ঘরের ঠাকুর ঘরেই থাকে,,
মায়ার পর্দাটুকু খুলে দাও ,,
মোহের তন্দ্রা ঘুচে যাবে ওরে,,
দু'টি চোখ এবার মেলে চাও ।

সম্মুখে তোমার,, কত দেব—দেবী ,,
অনুমান নয় রে , বর্তমান ॥

সর্বজীব মাঝে বিরাজিছে যে রে,,
পারদর্শী হও শিখিতে ,,
কত সাধু, কত দরবেশ,,
ঘুরে গেল যে রে, পৃথিবীতে ।

ভবা তাই যাচে মানুষের কাছে,,
ভাল ক'রে শোন প্রতিটি গান ॥

Dhaka University Institutional Repository

(৩৭)

বন্দে পুরুষোত্তম,, নমঃ নমঃ মহাপ্রভু ।
নদীয়ার চাঁদ,, কাঁদ কাঁদ মুখখানি ,,
প্রেমের খনি তুমি বিভু ।।

সোনালী অঙ্গ, মধুর ত্রিভঙ্গ, শ্যাম লুকান দেহ ,,
দ্বাপরের মানিক,, অতীব ঠিক,, বলিতে বোঝেনা কেহ ।
মুখে হরিনাম ,, এই তব কাম,,আঁখিভরা প্রেম, নিত্ নিত্ ।।

ধুলাতে লুটান স্বভাব,, রাধার বিরহে এমন ,,
ভুলিতে পার নি,, বৃন্দাবন লীলা,, ওহে মদনমোহন ।
ভবার ভাবের, ভাবময়মুরতি, অন্তিমে তুমি দিবু দিবু ।।

(৩৮)

(এবার) মুখে বল , গৌর, গৌর, গৌর, গৌর ।
কোথাও নাই, এমন ঠাকুর ।
রাঙা পায়ে বাজে নূপুর,, অতি মধুর-সুমধুর ,,
যাঁর নাম শুনিলে পালায় অসুর,ভবব্যাধি হয়রে দূর ।।

এমন ভাবের ছবি ,,
সর্ব জাতির সমান দাবী,,
শমনের হাত এড়াবি,, গাইবি মুখে মধুর সুর
পাপের তরী পাড়ে যাবে,, পতিত পাবন আমার, তোর ।।

Dhaka University Institutional Repository

সুরধুনী ,, গঙ্গাতীরে,,
প্রতি জীবের ঘরে ঘরে,
কোল দেয় সে যারে - তারে,, সদা রবি করযোড় ।
অযাচিত প্রেম - বন্যায়, ভাসিয়ে নেয় সে মোহঘোর।।

ভবা কয়,, ভাবতে গেলে,,
নয়ন ভরে প্রেম জলে ।
চরণ তলে,, দিন সকালে,, লুটাবি , মন, জীবনভর ।
ত্রিতাপ জ্বালা - যাবে দূরে, মহানন্দে রইবি বিভোর।।

কৃষ্ণ কালী বিষয়ক গান

(৩৯)

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ, তৃষ্ণা মিটিবার আশে ,,
কালী কালী কহ,, যাহাতে শমন ত্রাসে ।
দু'টি বেলা দু'টী নাম,, হবে ভাল পরিণাম ,,
প্রণাম করিবে অবশেষে ।।

Dhaka University Institutional Repository

ব্রাহ্ম মুহূর্তে কর, ব্রহ্মময়ী কালী নাম,,
ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া যাবে, সুখী হবে আত্মারাম।
অপার দুঃখের মাঝে,, পাবে তুমি শান্তিধাম ,,
অনন্ত আনন্দ রসে ,, রহিবে ভেসে ।।

গোধূলি লগনে জপ,, কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম ,,
অনিত্য সংসার হবে,, বৃন্দাবন ধাম ।
যোগনিদ্রায় যোগমায়া দেখাবে রাধেশ্যাম ।।
স্বপন কুহেলী ছাড়ি,, যাবে তুমি মহাদেশে ।।

সারাদিন ভরে কত সংসার খেলা ,,
ভুলিওনা নাম নিতে দু'টী বেলা।
যত অশান্তি ,, আর যত কিছু জ্বালা ,,
ভবা পাগলা কহে, দু'টী নাম পাশে ।।

Dhaka University Institutional Repository

মাতৃসঙ্গীত

(৪০)

(মাগো) অত আদর অত স্নেহে, সব করিলি মাটী,,
চোখ রাঙিয়ে করলে শাসন, হ'তাম আমি খাঁটী ॥

মিথ্যা কথা নয়,,
ভাঙা গড়া, তোরই হাতে, বেদপুরাণে কয়।
তবে,, কি ক'রে মা ভাল হ'বো,
কোন পথে মা হাটি- ॥

(তোর) ইচ্ছাময়ী নাম,,
খামখেয়ালী, কোন খেয়ালে, হলি আমার বাম।
তাই, মায়ার মাঝে ডুবিয়ে দিলি,,
আর কি পেরে উঠি ॥

বুঝে দ্যাখ মা তুই, -
মায়ের দোষে, ছেলে দোষী, শুন্ গো ব্রহ্মময়ী।
(তাই) ভবা পাগ্‌লা গান্ দিয়ে কয়,-
সর্ব্বনাশীর বেটী ॥[১]

(৪১)

অপমান করবি বলে তাই মানের গোড়ায় দিচ্ছি ছাই।
সর্ব্বজীবে তুই সুজীবে আমি যে মা দেখতে পাই ॥

১। কণ্ঠ : অমৃতসিং অরোরা (রেকর্ডকৃত গান), আকাশবাণী, কলিকাতা।

Dhaka University Institutional Repository

অপমান নাই আমার ভালে ,
তুই মা আর আমি ছেলে,
রয়েছি তোর অভয় কোলে ,কোলছাড়া কভু নাহি বেড়াই ॥

বিপথে মা যবে যাব,
আমি নাকি মারটি খাব ,
পিঠ পেতে মার সবই স'ব, তুই মারবি মা আর কি ডরাই ।

তোরি হাতে খেলে চাটি ,
ভবপার হ'ব হাঁটি ,
ভবের মাঝে যাবে রুটি, ভবা মার খেয়ে সে গেছে বলাই ॥

কোন ভাল না চরণ ভাল ,
ভাবতে ভবার জনম গেল ,
মান অপমান ভুলে গেল, চরণ তলে নিল ঠাঁই ॥

(৪২)

আপন ইচ্ছায় ঢুকেছি মা তোমারই দেওয়া সংসারে ।
স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লয়ে বসে আছি ঘিরে ॥

কি করি মা উপায় ভাবি ,
মায়া পূর্ণ এই পৃথিবী,
পুরাতে সবারই দাবি, হাবুডুবু খাই সাগরে ॥

Dhaka University Institutional Repository

আর পারিনা চাহি ছুটি,
(চাহি) মাহিনা বাবদ চরণ দুটি,
ভবা পাগলা যাচ্ছে রটি,
আর এসোনা - এ দরবারে ॥[১]

(৪৩)

আপন বলিতে আমার কেউ নাই।
মা আমারে পথে রেখে, চলে গেছে একা তাই ॥

বিশ্বে এনেছেন মা বিশ্ব জননী,
একটী দিন অভয় কোলে, উঠি নাই কখনি।
কোন্, অজানা দেশে, মা গেলেন নিরুদ্দেশে,,
পাষাণী মা আমার দয়াটী মোটেই নাই ॥

আপন সাজিয়া এরা, দেখাইছে প্রলোভন,
যাত্রা কালে কালের হাতে, এরাই করে সমর্পন।
জ্বলন্ত অনলে, এরা আপন হলে,
কখনও কি পারিত রে - পুঁড়িয়া করিতে ছাই ॥

মা থাকিতে মাতৃহারা, পথে পথে সারাদিন,
শেষ হইবে কবে, কর্ম্মের কঠিন[২] ঋণ।
মুক্তির রেখাটী, দিলে নাগো দেখাটী,
প্রসন্নময়ী তুমি, ভবা কয় শুনতে পাই ॥[৩]

১। শ্রী গোপাল বেক্টীর সৌজন্যে প্রাপ্ত ভবা পাগলার গানের পান্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত।
২। মূলে ' কঠীন' রয়েছে। ৩। মূল পান্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

(৪৪)

আমার মায়ের পায়ের সোনার নুপুর ঐ বাজিলো।
এলোকেশে ঐ আকাশে আবার ঢাকিলো ॥

ধেই ধেই নাচিছে কেবল,
পদতলে মরিলো পাগল।[১]
পান করে শিব, হলাহল
নাহি মরিলো ॥

অসি মুক্ত ঐ বড় ভয়
চতুর্ভুজা করিছে লয়।
মহা শিবে শিবের প্রলয়,
বুঝি বাধিলো ॥

রক্ত জবা বিল্বপত্র -
শোভে পদে দিবারাত্র।
ভেবে, ভবা পাগলার দু'টি নেত্র,
প্রেমে ভাসিলো ॥[২]

(৪৫)

পাগলাসুর-কাহারবা

আমি কত দিন আর এভাবে মা কান কাটিব।
ছয় দিকে মন ছুটে গেল কেমন করে গুছাইব ॥

১। অবোধ, অর্থে।
২। গায়ক : মুখন মিঞা গান্দার, সাটুরিয়া বাজার, মানিকগঞ্জ। নিজস্ব সংগ্রহ।

Dhaka University Institutional Repository

গণা[১] দিনের তয় দিন বাকী,
দিন ফুরালে সকল ফাঁকী,
যুগযুগান্তর ধরে কি মা, কেবল আসা যাওয়ার খেয়া দিবি ॥

যত বার ভবে আসিস,
এপার এলে ওপার দিস,
তোর খেলা মা বুঝবে কে গো, তোর হাতের মা কৃত[২] জীব ॥

খেলার পুতুলের মত,
গড়িস ভাঙিস শত শত,
আবার কোনও পুতুলকে স্নেহে আশ্রয় দিস্ মা চরণে তব ॥

তোরি রাঙা চরণ লোভে,
নিত্য রাঙা জবা শোভে,[৩]
ভবা বসে সদাই ভাবে, কি ভাবেতে চরণ পাব ॥

(৪৬)

আশোয়ারী-ত্রিতাল

আমি করি মায়ের নাম, কে বলে যেন যাত্রা গান,
সে বড় জ্ঞানবান, যে মনে স্মরে দিল মোরে -শেষের যাত্রা ।।

১। গণনা অর্থে । (২) নির্মিত অর্থে । (৩) শোভা পায় অর্থে ।

Dhaka University Institutional Repository

সেই বড় বন্ধু আমার, লাগিয়ে দিল তাক্ চমৎকার,
বলিহারী যাই তার, বাড়িয়ে দিল মোর জ্ঞানের মাত্রা ॥

সংসার যাত্রা করি আমি, জানিনা মা তুমি আমি,
সকলি মাতুয়া[১] তুমি, আমি জানি মা তুমিই কর্তা ॥

যখন বলেন মা কানে কানে, থাকি তোর হৃদয় কোণে,
এমনি শান্তি পাই প্রাণে, শুনি যখন মায়ের বার্তা ॥

মায়ের ভালবাসার ছেলে, থাকি সদা মায়ের কোলে,
উচিত কথা ভবা বলে, সে কিন্তু বড়ই ফাত্রা[২] ॥

(৪৭)

আমি দুঃখীর ছেলে, দুঃখিনী আমার মা।
সারা বিশ্বে নাই মোর কেহ, আমি আছি, আমার মা ॥

মাও কাঁদে আমিও কাঁদি, কারে কেহ ছাড়ি না।
(যখন) মায়ের কোলে নয়ন মুদি চেয়ে থাকে আমার মা॥

সুখ নাই - স্বর্গ নাই-পাতালে, যত শান্তি মায়ের কোলে।
মায়ের দু'টি নয়ন জলে, পাগল করে আমার মা ॥

১। বিভোর, আত্মহারা
২। বাচাল অর্থে

Dhaka University Institutional Repository

আমার মা নয় পাগলিনী, মৃন্ময় প্রতিমাখানি ।
মা জানে আর আমি জানি, কতখানি আমার মা ।।

মায়ের ছেলে ভবাপাগলা, দুঃখে থাকলেও নাইরে জ্বালা ।
মায়ের সনে করি খেলা, মাটির পুতুল আমার মা ।।[১]

(৪৮)

পঞ্চরা মিশ্র - একতালা

আর তো সহেনা সংসার যাতনা কতদিনে নেবে অভয় কোলে।
কাঁদিতে কাঁদিতে এ পোড়া প্রাণেতে সহিবে কত মা আমি অবোধ ছেলে।।

১. ছেলেকি কাঁদিবে নিরন্তর, তোর না মা গো দয়া এত ।
দেখনা চেয়ে শত শত কাঁদিতেছে কেবল মা মা বলে ।।

২. ছেলে কখনও ভয় পেলে, মা ঢেকে নেয় আঁচল তলে ।
রাখে না সে পথে ফেলে, ছেলের মায়া সকল ভুলে ।।

৩. তোকে আর কত বুঝাব, ছল করে কি মা কথা ক'ব।
কত দিনে সঙ্গে যাব, ভুলাবি আর কত ছলে ।।

৪. বিশ্বমাতা শ্যামাকালী, সকলি কি ভুলে গেলি ।
তোর ইঙ্গিতে সব পাঠালি, এখন কি তুই রাখবি ফেলে ।।

১। গায়ক : চুনীলাল ঘোষ, নিজস্ব সংগ্রহ

Dhaka University Institutional Repository

৫. কাটবে নাকি দুঃখের জীবন, পাব না তোর অভয় চরণ ।
ধরবো কি মা ব্রত অনশন, ভাসতে হবে কি চখের জলে ।।

৬. ছেলে যদি দোষ করে মা, মায়ের রোষ করতে নাই মা।
কু-ছেলে অনেক হয়মা, কু-মাতা কি কেও জগতে বলে।।

৭. স্মরণ যদি লইগ তোমার, কাজ কি মা লুকিয়ে আবার ।
রাখনা কথা, পাগলা ভবার, আয়না মাগো বাইরে চলে ।।

(৪৯)

আয় জবা ফুল, আয় জবা ফুল, মায়ের পায়ে দেবো তোরে ।
চন্দনে লেপিয়া, পরান দিয়া, মম যুগল করে মম অশ্রু নীরে ।।

মায়ের শোভা ওরে জবার মালার,
গন্ধ বিহীন ওরে তবু মা যে চায় ।
নাই তোর স্বার্থ,
কেবল পরমার্থ,
তাই তোর লাল রং অন্তর বাহিরে ।।

আমি যদি হাতে তুলে দেই মায়ের পায়.
জবা তবা শোভা হবে মায়ের সেবায় ।
(হবে) মায়ের যাচন,
দেখিব দুঁহু জন,
চরণে পড়িয়া ঝ'ব' জনম ভরে ।।

Dhaka University Institutional Repository

(৫০)

মূলতান - তেওরা

এই অনিত্য সংসারে ভুলে আছ কারে, একবারও কি তারে ডাকিলিনা অন্ধ ।
সময় থেয়ালী সকল দুরালী ডাক শ্যামাকালী হবে ঘুচিবে দ্বন্দ্ব ।।
বিষয়ের আশে সদা রইলি বসে, দেহ পড়ল খসে দিনের অবশেষে ।
এমন শ্যামা নাম রসে নিলি না মন কসে, তোর কোন দিন যেন শেষ হইবে।।

মায়ারী ঠোসে চোখ রাখলি ঢাকা, তাই দেখলি কেবল আঁধার আর ফাঁকা ।
কোথায় চললি মন তুই একা একা, যাইলি যেথায় কেবল বিষয়ের গন্ধ ।

পুঁজ, রক্তভরা অস্থিচর্ম্মসার, তাই দিয়ে তৈরী এদেহ তোমার ।
তবে কেন মন এত অহঙ্কার কি নিয়ে করবে এতই আনন্দ ।।

যাবি চলে সুখে ডাক আনন্দময়ী, রিপু বশ হবে শমনে হবি জয়ী ।
নেবেন কোলে করি, এসে দয়াময়ী, গালি দেবে রেমন্দ ।।

শ্যামা মায়ের নামে চলেছি ভাসিয়া আসিবনা আর এপারে ফিরিয়া ।
পারি দিব মন শ্যামা নাম ধরিয়া আর কিছু যে চায়না ভবে ব ।।[১]

(৫১)

একটি মেয়ের কথা শুনেছি।
তার রঙটি কালো, নাচে ভালো,
কপালে তার জ্বলে আলো,
শ্বেত পদ্মে নাচে কেবল
তাই হৃদি[২] পদ্ম পেতেছি ।।

১। মূল পান্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত । ৫২) হৃদয় ।

Dhaka University Institutional Repository

লাল্ টক্ টকে চরণ, কেবল নাচন, কেবল নাচন ।
খুলেছে সে, চুলের বাঁধন,
ন্যাংটা বামা [১], ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছি ॥

(আমি) খুঁজি সদা দশদিকে
কে নাচেরে আমার বুকে।
মিলিয়ে যায় সে থেকে থেকে,
ঝড় বিজলী মহাকালী, তার মেঘে ছবি দেখেছি ॥

(মেয়ে) জবা ফুল ভালবাসে
জবা তাই সদাই হাসে ।
সদা মেঘ নীল আকাশে
আমি আকাশ ছোঁব না, পায়ে শোব [২] তাই মহা চিন্তায় পড়েছি ॥

(৫২)

ভৈরবী-মিশ্র

এস কালী, জগৎ পালিনী, জগৎ পালিনী ।
ভব পারের তুই তরণী, ভবতারিণী, ভবতারিণী॥

চিন্তা কি মা, তুই রয়েছিস,
মা ডাকিলে, কাছে আসিস,
ইচ্ছামত সাজা দিস মা , তাতে দুঃখ নাই জননী,
তাতে দুঃখ নাই জননী॥

১। রমণী । (২) শয়ন অর্থে ।

Dhaka University Institutional Repository

ইচ্ছা ছিল বড়ই মনে,,
মার সনে আর শ্যামার সনে ,,
আমার দুখই ভিন্ন জ্ঞানে,, তাই লুকালি গর্ভধারিনী,,
গর্ভধারিনী ।।

তুই বড়ই স্বার্থপর মা,
তুই দুখই তাই বুঝবি মা,
তোর লীলা মা বুঝিয়ে ...-মা, ওগো পাষাণী,,
ওগো পাষাণী।।

আর কত মা করবি চেষ্টা,
বন্ধ করতে তোর প্রতিষ্ঠা,
ভবা যে তোর একনিষ্ঠা, পেয়ে তোর চরণ দু'খানি,,
পেয়ে তোর চরণ দু'খানি ।।[১]

(৫৩)

এস মা আঁধার বরনী-
শূণ্য ভুবনে ব্রহ্মময়ী, আলো কর মা ধরনী ।

আমারি ভাঙ্গা হৃদয়ে রাঙ্গা রাঙ্গা দুটি চরণ দিয়ে,
নাচ মা, নাচ মা শিবেরি বামা - কাল সন্ন্যাসিনী রমনী ।।

চন্দ্র-সূর্য তব ধ্যানে , আরতি করে নিশিদিনে,
পবন ছন্দে কমল গন্ধে - শঙ্খে শঙ্খে[২] উঠুক ধ্বনি ।।

১। গায়ক : চুনীলাল ঘোষ, নিজস্ব সংগ্রহ ।
২। শামুক, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদিতে ফুৎকারদ্বারা বাদিত শঙ্খের খোলা ।

Dhaka University Institutional Repository

অনন্ত যুগেরি পর, ভবা পাগলার ভাঙ্গা ঘর -
ঘোচ অন্ধকার নাশিয়া এবার রহ জাগ্রত রূপের - রূপিনী ।। [১]

(৫৬)

ঝিঁঝিট মিশ্র - কাহারবা

এস মা কালী, শুন মা বলি, আমার প্রাণের বেদনা ।
লাগেনা ভাল, কি যে করি, তুমি আমায় বলনা ।।

ভাবিয়া ভাবিয়া হ'তেছি সারা,
এসো, এসো, এসো মা তারা ।
তুমি বিনে আর, কেউ নাই আমার,
দগ্ধ হৃদয়ে দিতে সান্ত্বনা ।।

শেষের দিন ভবার এলো কাছে -
আর কেন মা রইলি পিছে ।
এসো এসো মা, ত্রিনয়নু প্রতিমা,
আর দূরে তুমি থেকো না, থেকো না ।। [২]

১। গায়ক : চুনীলাল ঘোষ, নিজস্ব সংগ্রহ ।
২। ঐ, নিজস্ব সংগ্রহ ।

Dhaka University Institutional Repository

(৫৫)

ভৈরবী-কাহারবা

ও মন ন্যাংটা এলি ন্যাংটা গেলি নেংটী[1] নাই তোর কোমরে।
এ দুনিয়ায় সবাই ন্যাংটা নেংটী পরে কোন্ ব্যাটারে ।।

১। বিষয় বাতাস লাগলো যে গায়, তোর নেংটীখানা তাই উড়ে যায়।
অহঙ্কার সংযোগে বেড়ায়, শূন্যাকাশে ধরে কে রে ।।

২। কামের বানের জোয়ার ভাটায়,(রইলি) একবার ডাঙ্গায় একবার চড়ায়।
(তোর) নেংটী মাজায়[2] রাখতে যে দেয়, তুই পরে গেলি ত্রেশধের ধারে।।

৩। সাধু-গুরু সুমহাজন, তাদের কাছে চাগে[3] বসন।
(তুই) ন্যাংটা যাবি কিসের কারণ, এ যে মানুষ জন্ম পশু নয় রে।।

৪। জ্ঞান সূতোর ঐ বসন পরে, প্রেম বাজারে আয় না ঘুরে ।
ন্যাংটা নাই কেউ ঐ বাজারে,(সেথায়) ভক্তিং মুক্তেশর নয়ন ঝুরে।।

৫। হাতে পর অনন্ত বালা, অনন্ত রূপ যাঁর,(সেই) ব্রজের কালা ।
ও যে কেলে সোনা হয়না ময়লা,(সে যে) গয়লার ছেলে চিনলি না রে।।

৬। দ্বাদশে দামোদর নদী, বাঁধ ভাঙ্গিত একদিন যদি।
ধ্বংস হ'ত বৃক্ষ আদি, কনকলতা ঐ দ্বাপরে ।।

৭। ন্যাংটা বেটী ছিল সহায়, ভবাপাগলা বলছে ধরায় ।
আমাকেনি তারা তুরায়, নেংটী পরে ভবপারে ।।

১। এক টুকরো কাপড়-যা দিয়ে নিম্নাঙ্গের লজ্জা নিবারণ করা হয়।
২। কোমরে ।
৩। চাগে < চাহগে < চাওয়া অর্থে ।

Dhaka University Institutional Repository

(৫৬)

আশোয়ারী-ঠুংরী

কত দিনে ফুরাইবে আমার ভবে আসা যাওয়া ।
আর তো আমার সহে না মা, এ দুঃখেরী জন্ম নেওয়া ।।

লক্ষ কোটী জন্ম ঘুরে পাব কি মা তোমারে ।
এই ভাবে কি বারে বারে বাইতে হবে ভবের খেওয়া ।।

কেবল চরণ দিলি পেয়ে স্বামী, তোর যে পাগল ছেলে আমি।
কেন ছেলের তরে নিদয় তুমি কৃপণতা চরণ দেওয়া ।।

ছয় রজ্জুতে দিয়ে বাঁধন দিলি মাগো আটন সাটন ।
এত যদি করবি শাসন উচিৎ ছিলনা মা হওয়া ।।

ভবেশের মা শুভংকরীর বাজে যদি মা তোর কোমল হিয়ায় ।
ক্লেশের খুঁটি বাঁধ তোর দু'পায় ঘুচে যাক কৃতান্তের নেওয়া।[১]

(৫৭)

কাল মেয়ে, কাল মেয়ে আমার কাল মেয়েই ভাল রে ।
(যাঁর) রূপের ছটায়, ব্রহ্মান্ডটায় ছড়িয়ে গেল আলো রে ।।

আমার ঐ যে কাল মেয়ে,
শিবের সনে হ'ল বিয়ে ।
কত শিব সে প্রসবিয়ে, (আবার) শিবের বুকেই রইল রে।।

১। মূল পান্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত

Dhaka University Institutional Repository

অভয়া মা মুণ্ড কেশী,
(যাঁর) নখ-পদ্মে রবি-শশী ।
ধ্যান করে যাঁর যোগী-ঋষী, তবু নাহি পেল'রে ॥

আমি কালী তুমি কালী,
ব্রহ্মাণ্ডটা বিরাট কালী ।
আকাশ-বাতাস সবাই কালী, (তাই) কালী কালী বল রে ॥

(যে জন) কালী কালী সদাই ভাবে,
(সে) যাত্রাকালে কালী হবে ।
(সেই) কালী হেরে কাল্ পালাবে, (তাই) ভবা হয়ে গেল রে॥[১]

(৩৮)

কালী বল, কালী বল, মনটা আমার ।
হাসি মাখা বদনে, ছল ছল নয়নে, -
আনন্দ কাননে মন ঘোর অনিবার ॥

কেউ তো কারো নয় — এ কথাটী সত্য,
বুঝেও বুঝনা মন, তুমি যে অনিত্য :
ঐ দেখ শ্মশানে, কিবা নিশি দিনে,,
পুঁড়িতেছে মানবের যত অহঙ্কার ॥

১। মূল পান্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত, গানটি গড়পাড়া নিবাসী সুরশী সাহার বাড়ীতে বসে লেখা ।

Dhaka University Institutional Repository

গতি নাই, গতি নাই কালী নাম ছাড়া,
কণ্ঠ ভরিয়া গাহ, হ'য়ে আত্মহারা ।
ঐ তো তোমার বন্ধু, তরিতে এ ভবসিন্ধু,
এক বিন্দু আশা তুমি করিও না কার।।

কত দিন আর রবে তুমি এই ধরাধামে,
মরণ তোমার যদি, মজ কালী নামে ।
ভবা-পাগলা কহে, প্রাণ থাকিতে দেহে,
কালী নামে ভরে দাও বিষয় সংসার ।।[১]

(৫৯)

ঝিঁঝিট প্রসাদী সুর-খেমটা

কালী বলে ডুব দেখি মন, প্রেম সিন্ধুর অগাধ জলে।
নাইকো সেথা কুমীর হাঙ্গর ছয় রিপু তারা দলে দলে।।

ডুব জানিস্ না ডুববি কিসে,
ডুবতে গেলেও উঠিস ভেসে,
কামিনী-কাঞ্চন বিষয় আশে, মন সদা রাখলি ফেলে ।।

আর কি মন সুযোগ পাবি,
কালী প্রেমে কবে নাবি,[২]
ভাটায় কবে চলে যাবি, মহানিদ্রার অস্তাচলে।।

১। মূল পান্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত
২। স্নান করা অর্থে

Dhaka University Institutional Repository

একবার ডুবলে যায় না উঠা,
ঘুচে যায় তার বিষয় ল্যাঠা,
এমনি আমার কালী মা-টা, বেঁধে রাখে চরণ তলে ॥

ভবেনের এই নিবেদন
ভুলিস নে মা ডুবাটী কখন,
ধরে বুকে রাঙা চরণ, ডুব দিব মা কালী বলে ॥[১]

(৬০)

পাগলা সুর-কাহারবা

কি তুফানে ফেললি কালী ডুববে তরি কি মা বেনা ভাটী।
বেহুশ হয়ে পড়েছি যে মা রক্ষা কর মা আমার সোনা মা-টী ॥

চেয়ে দেখি তোর গলে দুলে,
রক্ত মাখা শির দলে,
দয়াময়ী তোকে কে বলে, ছেলে কাটা ন্যাংটা বেটী ॥

গালি খেয়ে ওমা কালী,
ছেলেকে তুই যাস্‌নি ভুলি,
তোকে কি মা সাধে বলি, গেছে সংহারিনী নাম রটি ॥

তোর ভরসা আশ্রয় করে,
রয়েছি মা মুক্তি করে,
ডুবে যদি তরী চিরতরে, ডুববো নিয়ে তোর চরণ দু'টী ॥

১। মূল পান্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

উজান গাঙ্গে ধরেছি পাড়ি,
ভবেনের এই দেহতরি,
ওপার যেয়ে চমবে পারি, ছেড়ে দিয়ে এই ঘুটিবাটি ।।[১]

(৬১)

কে পরাল মুন্ডমালা আমার শ্যামা মায়ের গলে ।
পারে নাই কি পরাতে সে গেঁথে মালা বনফুলে ।।

একে আমার ক্ষেপা মেয়ে,
নাচে মেয়ে অসি নিয়ে,
কি ভীষণ মুরতি তাহার ,
কপালে সদা আগুন জ্বলে ।।

মা আমার ভবের কারণ,
করেন সে যে শমন[২] দমন,
ভবেনের নাই কোনই ভয়,
থাকে সদা মায়ের কোলে ।।

১।　মূল পান্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত ।
২।　যম,মৃত্যুর দেবতা ।

Dhaka University Institutional Repository

(৬২)

ক্ষ্যাপা বেটী ক্ষ্যাপার বুকে খেলছে কত যুগে-যুগে ।
কত জনা ডাকছে তাঁকে, যার যেমন মনে লাগে ।।

বীরভূম
বামা ক্ষ্যাপার উপাসনায় ।
কুকুর ছানা সঙ্গে খেলায় ।
মরার হাড়ের কুড়েখানায়,,
শ্যামা না কি থাকতো জেগে ।।

হালিসহর
রাম প্রসাদের গানের ছন্দে,
বেটী না কি বেড়া বান্ধে ।
স্নানের ঘাটে বলে আনন্দে,
গান শুনাবি ওরে মেগে ।।

বর্ধমান
কমলাকান্তেরই ভজন,,
শ্যামা মায়ের দু'টি চরণ ।
(একদা) দস্যু পথে করে আক্রমণ,
অবশেষে,,চরণে শরণ মাগে।।

কামারপুকুর
রামকৃষ্ণ পরমহংসে,
শ্যামা সদা থাকতো মিশে ।
ভাগ্নে হৃদের চোখে ভাসে,
(এ'যে,) মামা নয় মোর, শ্যামা আগে।।

Dhaka University Institutional Repository

নাটোর

রাজা রামকৃষ্ণের কথা,
মা ছিল তার হৃদে গাঁথা।
শ্যামা বলতো যথা তথা,,
শুন রামা, তোর দোহাই লাগে ॥

মেহের

সর্বানন্দ অধিকারী, ।
পূনা দা তার সহায়কারী ।
শ্মশানে জাগে শঙ্করী ।
পুনর্জন্ম তাঁর অনুরাগে ॥

পাবনা

কীর্তি খোলার রাজকৃষ্ট-মা,
(মা গো) যে করেছিল তোর ভরসা ।
সুরাপানে, গুরু করে জিজ্ঞাসা „
(তাই) সুধা দেখায় মায়ের ভোগে ॥

কুমিল্লা

মনোমোহন আর আর্তাউদ্দিন,
মাকে ডাকে তারা নিশিদিন ।
লব বাবু মিলনে যে তিন,,
(তাই) ত্রিনয়নী রয় সমান ভাগে ॥

গ্রাম আমতা

ভবাপাগলা গানের ছলে,
ভক্তপাশে যাচ্ছে বলে ।
মা না কি তার মাটি তোলে,
নিশায় নয় রে, দিবা ভাগে ॥

Dhaka University Institutional Repository

(৬৩)

গড়পাড়া নিবাসী মোহিনী ঘোষের মেয়ে।
ব্রহ্মময়ী লুকিয়ে আছে গা-টী ঢাকা দিয়ে ॥
কেহ তাঁরে চিনতে নারে নিকটে পাইয়া ।
কত মুনি ঋষি ধ্যান করে ঐ মেয়ের লাগিয়া ॥
কেহ ডাকে টুনু[১] বলে কেহ বা নয়ন।
সুন্দর প্রতিমা শ্যামা মেঘের বরণ ॥
কেহ কয় ভব-তারিণী, কেহ কয় নিলিমা ।
কে করে সিদ্ধান্ত তাঁর কোথা তার সীমা ॥
ভবা পাগলা পাগল বেশে আসিল যখন ।
কাল মেয়ে কাল মেয়ে গাহিল তখন ॥
সবার নয়নে জল আসিল ভরিয়া ।
কালীর মুখেতে কালীর গানটি শুনিয়া ।
ভবা পাগলা দেখিল তার অপূর্ব জ্যোতি ।
এ যে মানুষ নয় হরের পার্বতী ॥[২]

(৬৪)

ছেলে যদি মরে যায়, মা হয় তার পাগলিনী ।
ছেলে বর্তমানে, মাগো, কেন হলি উন্মাদিনী ॥

১। নীলিমার ছদ্মনাম ।
২। নিজস্ব সংগ্রহঃআমতা মন্দিরের গাত্রফলক ।

Dhaka University Institutional Repository

কতগুলি , দানবের মাথা,
নিয়ে কেন মালা গাঁথা ।
এ আবার কেমন কথা,, রক্তমাখা অঙ্গখানি ।
এ আবার কেমন প্রথা,, কি কারণে উলঙ্গিনী ।।

চুলে কেন ধুলো মাখা,
ধুলো নয় তো ছাইয়ে ঢাকা ।
শ্মশান মাঝে কেন থাকা,, সঙ্গে নিয়ে ডাকিনী ।
শ্মশান মাঝে, কেন একা,, সঙ্গে নিয়ে যোগিনী ।।

সকল দিয়ে জলাঞ্জলি,
শ্মশানে শ্মশান কালী ।
(দিয়ে) জবা ফুল তাই ডালি ডালি,, তবা পূজে পদখানি।।[১]

(৬৫)

তবু তো তোমাকে ডাকি,
দেই না কভু ফাঁকি ।
কর কত ছলনা, কত কর চালাকি ।।

অসংখ্য যন্ত্রণা কত ব্যথা ভরা,
বিষয় কণ্টক সহস্র পাহাড়া,
রেখেছো আমারে এ কারাগারে
নয়নের জলে তব ছবি আঁকি ।।

১। মূল পাণ্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত ।

Dhaka University Institutional Repository

পাগলের বেশে ফিরি দেশে দেশে,
কভু কাঁদি আমি, কভু ফেলি হেসে ।
কাছে টেনে নাও, এবার দেখা দাও,
ভবার ভাগ্যে আর কত বাকি ।।

(৬৬)

তাই সতী নারী পতির বুকে রয় ।
দোষ এ ব্রহ্মাণ্ডে খাকে কাকে, নারী হ'ল সমুদয় ।।

মৃত্যুঞ্জয় শিব উহার নাম,
তাঁর কেন গো এমন কাম ।
সে ছেড়ে দিয়ে কাশীধাম, রাঙ্গা চরণ বুক পেতে লয় ।।

ও নারী যে সর্ব্বোপরি,
ধ্যানে পায় না ব্রহ্মা-হরি ।
(দ্যাখ) শিব যায় পায়ে গড়াগড়ি, ওযে হরির চেনা যেন বিস্ময়।।

মুণ্ডকেশী মায়া মুণ্ড
(বল) না করিলে কে হয় ভণ্ড।
এ যে সব মুণ্ডামুণ্ড, প্রকৃতির আকৃতি যে ময় ।।

যে জন নারীকে না করে ভজন,
তার ভবে আসা অকারণ ।
ভবাপাগলা কইছে বচন, নারী ব্রহ্মময়ী যে হয় ।।

Dhaka University Institutional Repository

(৬৭)

(মা) তুমি আমার মন, মা গো, তুমি আমার ধন।
কৃপা করে তুমি আমায় দেখালে ভুবন।। মা গো:

(মা) তুমি আমার বেদ-বেদান্ত তুমি চণ্ডী-গীতা,
(মা) তুমি আমার লাল জবা নীল অপরাজিতা।
(মা) তুমি আমার রক্ত-চন্দন ভজন-পূজন,
(মা) তুমি আমার মহাভারত, তুমি রামায়ণ।। মা গো:

(মা) তুমি আমার মঙ্গল তীর্থ তুমি বেলপাতা,
(মা) তুমি আমার সুখের সংসার অন্তকালের চিন্তা।
(মা) তুমি আমার ভারতবর্ষ পৃথিবীর জীবন-
তীর্থ হয়, মা, তুমি আমার বাঁচন-মরণ।। মা গো: [১]

(৬৮)

ভৈরবী-কাহারবা

তুমি কারে ভাব আপন ওরে ভোলা মন।
দিন গেল ভাবিলি না শ্যামা মায়ের রাঙাচরণ।।

অস্থি, চর্ম মাংসপেশী,
এদের দেখে হলি খুশী,
দু'দিন পরে দেখাব ওরে সকলি তোর আশার স্বপন।।

কার তরে মন বাঁধ বাসা,
কিসের এত ভালবাসা,
শ্যামামায়ের রাঙা পায় বাঁধ নারে তোর চঞ্চল মন।।

১। গায়ক: চুনীলাল ঘোষ, নিজস্ব সংগ্রহ।

Dhaka University Institutional Repository

হলি তুই রিপুর দাস,
কাটালি না মন মায়ার পাশ,
শ্যামামাকে ভুলে রইলি পেয়ে ওরে কামিনী কাঞ্চন ।।

ভবাপাগলা আছ কি ভুলে,
ঝাঁপিয়ে পড় না শ্যামার কোলে,
দেখনা চেয়ে আসছে ঘিরে কালনাগিনী করতে দংশন ।।

(৬১)

পাগলা সুর-কাহারবা

তুমি গড় তুমি ভাঙ্গ, আমার হৃদের.. কত প্রতিমা
বুঝিতে পারিনা তোমারই কল্পনা, কতদূর মা তোমারই সীমা ।।

বামন হইয়া ধরিতে যাই চাঁদে,
তাইগো মা আমি পড়ি নানা ফাঁদে,
দিস তাই চাপিয়ে আমার ক্ষুদ্র কাঁধে বিষয় বাসনার বোঝাই ধামা ।।

দুরন্ত বেটী তুই এলোকেশী,
আর কত দুঃখ দিবি সর্ব্বনাশী,
সকল পাপতাপ ফেল গো নাশি, আর গালি ওগো দিবনা শ্যামা ।।

খেলার পুতুল পেয়েছিস নাকি,
ভবেনকে কেন তুই মা দিস গো ফাঁকী,
তা হলে মা টানবো বাকী, করবো না আর খাতায় জমা ।।

Dhaka University Institutional Repository

(৭০)

(মা) তোমারে যেন ভুলিনা আমি, যতদিন রাখ সংসারে ।
তুমি থেকো সঙ্গে সঙ্গে, বিষয় তরঙ্গ মাঝারে,
(মাগো) বিষয় তরঙ্গ মাঝারে ॥

যত যা ইচ্ছা, দিও মা সাজা,
তোমারে করেছি দেহেরই রাজা ।
আমি তোমার খাসের[১] প্রজা,
চিন নাকি মা আমারে,
(মাগো) চিন নাকি মা আমারে ॥

তব ইচ্ছা যদি, নরকে ফেলিবে,
বড় শান্তি পাবো, তব আদেশ ভেবে ।
কত কষ্ট দিবে, ওগো মহাদেবে[২],
শান্তিময়ী কয়, তোমারে,
(মাগো) মহামায়া কয় তোমারে ॥

বিষয় কন্টক, বিঁধিলে এ গায়,
তবু যেন মন, থাকে রাঙা পায় ।
ভবাপাগলা তবে, কিছু নাহি চায়,
এইটুকু আশা, অন্তরে,
(মাগো) এইটুকু আশা অন্তরে ॥[৩]

১। মালিকের সরাসরি কর্তৃত্বাধীন জায়গা ।
২। মহাদেবকে ।
৩। গায়কঃ চুনীলাল ঘোষ, নিজস্ব সংগ্রহ ।

Dhaka University Institutional Repository

(৭১)

উপরোধ

'দাঁড়াও পথিক ;
দাকে যাও হেরিয়া,
সংসার কুহকে সদা আছ যে মজিয়া-
বেলা প্রায় অবসান,
কররে পথের সন্ধান ॥[১]

(৭২)

বারোয়া-কাহারবা

দিবানিশি জপরে মন কালী নামের জপমালা ।
জপিলে গো কালী নাম, হবে শান্তি হৃদের জ্বালা ॥

কেন ভুলে আছ রে মন, নষ্ট কর মানব জনম,
কখন এসে ধরবে শমন, ফুরিয়ে যাবে সাধের বেলা ॥

কত দিনে ফুটবে আখি দেখবি মন তুই শ্যামা পাখী,
হৃদ-পিঞ্জরে তারে রাখি হয়ে থাকবি আপন ভোলা ॥

কালী নামে মাতোয়ারা, হবে হরি মন বিষয় ছাড়া,
মুখে বলে তারা-তারা, ভিতর বাহির রাখবি খোলা ॥

১। নিজস্ব সংগ্রহ, আমতা মন্দিরের গাত্রফলক ।

Dhaka University Institutional Repository

সাধুদের মন ছন্দন ছুটি, দিল তোর সকল লুটি,
ভেঙ্গে ফেললো মনের খুটি, খুলে ফেললো দেহের চালা।।

ভবেন কালী মাকে ডাকে, দিল দেহের চালটি ঢেকে,
সে ডরায় না মেঘের ডাকে দিয়ু মেঘের ভীষণ বাদলা ।।

(৭৩)

(মাগো) দোহাই লাগে তব চরণে ।
আমি ভুলিতে পারি, (মাগো) তুমি রেখো স্মরণে ।।

মিথ্যা কথা নয়, এ যে অতি সত্য,
তুমি যে গো মহাজন, আমি তব ভৃত্য ।
কর্তব্য ভুলিয়া যাই, প্রতিদিন নিত্য,
পলকে, পলকে, রেখো শাসনে ।।

তোমায় আড়াল করি, কোথা লুকাবো,
এমন স্নেহের মাতা, কোথা যেয়ে পাবো ।
কেমন করিয়া বলো তোমায় হারাবো,
মরণ সম্মুখে আমার, প্রতি পদে ঐ কোণে ।।

আর কি পাবো দেখা, বেলা ডুবিয়া গেলো,
এ জনমের যত খেলা, এবার মোর সাঙ্গ হলো ।
যাত্রাকালে ভবা-পাগলা তোমার দেখা নাহি পেলো,
ধ্রুবতারা শূন্য পথে, ডাকে নীল গগনে ।।[১]

১। সংগ্রহঃ চুনীলাল ঘোষ, নিজস্ব সংগ্রহ ।

Dhaka University Institutional Repository

৭৪)

পথে পাওয়া ছেলে বটে, প্রাণ জুড়াই মা বটের ছায়ায় ।
সব দুঃখ মোর চলে যায় মা, পবন আমায় গান শুনায় ॥

ব্যথা ভরা জীবনখানি,
মা জানেন আমি জানি ।
ভরসা মায়ের পা দু'খানি,
পার হবো শেষের বেলায় ॥

লিখাতে শিখিয়েছ গান,
শীতল হয় মোর দেহ-প্রাণ ।
আনে কি, বুঝিবে তান্ ,
অনুরাগের ছন্দ দোলায়,
ভবার এই ভাবেরই প্রথা,
যুগ-যুগান্তর রইলো গাঁথা ।
এদের জীবন যায় না বৃথা,
গানটি গেয়ে প্রাণ চলে যায় ॥

(৭৫)

প্রভাতে উঠিয়া কহ কালী, কালী—কালী কালী ।
চিত্ত শুদ্ধ কর জবাফুলি জবাফুলি ॥

আনন্দে আন তুলি বিল্বপত্র,
রক্ত চন্দনে, মন করি মিশ্রিত ।
প্রেম-অনুরাগে, ভরি দু'টী নেত্র,
মায়ের চরণ পূজ ঢুলি-ঢুলি, হেলি-দুলি ॥

Dhaka University Institutional Repository

অলস ত্যজিয়া ওরে ভবকালী নাম,
অন্তিমে মাতৃপদে লভিতে বিশ্রাম ।
ভবাপাগলা কহে শিব শিব, রাম,
অবিদ্যা দূরে যাবে দে রে করতালি,
দে রে করতালি ।।[১]

(৭৬)

বল, বল, বল, শ্যামা দেখা কি দিবে না আমারে ।।
সাধনের ক্রিয়া ফল, সকলি হলো বিফল,
সারা চোখে ভরা জল বহিছে ধাঁরে ।।

স্বর্গের দেবী তুমি স্বর্গেতে ভালবাস,
আসিতে ইতি হেথায়, এস মা হৃদয়ে এস ।
স্নেহেরই সন্তান সকলে তো সমান (জানি),
তব স্নেহ ভেসে উঠে কঠিন পাথরে ।।

মানুষ হইলে কর মানুষের মত,
রিপু[২] সংগ্রামে কর তারে পরাজিত ।
তুমি মাগো মুণ্ডকেশী, মুণ্ড হাতে মুণ্ড অসি,
ভবাপাগলায় ভালবাসি, বিরাজ মা অন্তরে ।।[৩]

১। গায়কঃ চুনীলাল ঘোষ, নিজস্ব সংগ্রহ ।
২। শত্রু ; মানুষের মহত্ত্বের অন্তরায় ছয়টি ইন্দ্রিয়গত প্রবৃত্তি; যথা-কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য ।
৩। গায়কঃ মাখন মিঞা সান্দার, নিজস্ব সংগ্রহ ।

Dhaka University Institutional Repository

(৭৭)

পাগলা সুর-কাহারবা

বনের হরিণ বাঁধতে চাস মা আট গাছা সুতো দিয়ে ।
বনে সদা মুক্ত থাকে বাঁচে শ্যামল ঘাস খেয়ে ॥

শ্যামল ঘাসে পুষ্টি দেহ, তাদের ধরতে পায় না কেহ ।
তাদের পিছে সদাই থাকে, বনের একটি কালো মেয়ে ॥

তারা থাকে বনের ছায়ায়, ঘেঁষতে আসে না দালান কোঠায়।
শ্যামা মায়ের শ্যামল বনে, শিহর থাকে শীতল বায়ে ॥

কি যেন কি কর্ম ফেরে, মা আনলেন তাই শহরে ।
ভবাকে তুই বনে নে মা, বেড়াই সদা গুণ গেয়ে ॥

(৭৮)

পাগলা সুর-কাহারবা

বাপের বাড়ী এলো উমা, পাগলা ভোলা কৈলাস রেখে ।
চুপে চুপে এলো উমা-পতি, সর্বাঙ্গে ভস্ম মেখে ॥

বাপের বাড়ী উমা মেয়ে, থাকে সে যে চুল এলিয়ে ।
পাগলা ভোলা সেই রূপ দেখে, হৃদয় মাঝে নিল এঁকে ॥

এমন রূপ মাতোয়ারা, জ্বলে মুখে তিনটি তারা ।
মাতৃরূপ বিশ্বহারা, চিনবে কে ঐ উমা মাকে ॥

Dhaka University Institutional Repository

তিনদিন থেকে বাপের বাড়ী চললো উমা কৈলাস ফিরি ।
চারিদিক আলো করি, কেবল আঁধার করল জগৎটাকে ॥

কৈলাসপতি কৌতুকবসে, বললেন উমায় হেসে হেসে ।
মান কচু আর কাগ্‌জি রসে[১], ফিরে আসতে কি দিলে মুখে ॥

তচ্ছিং শুনে উমা কানে, চললো মেয়ে অভিমানে ।
মান কচুর ঘোর কাননে, দেহখানা লুকিয়ে রাখে ॥

হর গৌরীর[২] রঙ্গ ঘটা, দেখে বলেন ভবেন ব্যাটা ।
বাজলো আবার কেমন ল্যাঠা[৩] কি বলে বোঝাই কাকে ॥ [৪]

(৭১)

বৃন্দাবনে তুমি যোগমায়া, কালী কালী কালী মহাকালী ।
যেখানে গোবিন্দ করয়ে আনন্দ -
তোমারই কৃপা বিনু পাবে কিসে বনমালী ॥

কাশীতে তুমি মাগো অন্নপূর্ণা হয়ে,
শিবকে নাচায়েছ ভিখারীর ঝুলি দিয়ে ।
কি অভিপ্রায় যাচিতে যে মন চায় -
একটুকু কর কৃপা করুণা বারিধি ঢালি ।

১। কাগজি লেবুর রস । ২। মূলে 'গৌরির' রয়েছে ।
৩। মূলে 'লেঠা' রয়েছে ।
৪। মূল পান্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত ।

Dhaka University Institutional Repository

নীলাচলে তুমি, অচলা বিমলা রূপে,
জগন্নাথে লয়ে দিলে, অন্ন দিতে চুপে চুপে ।
আনন্দ বাজারে তাই, আনন্দের আর সীমা নাই ;
জাতের গরিমা ভাঙ্গি করে সবে কোলাকুলি ।।

দক্ষালয়ে তুমি; শিব নিন্দা, শুনিমাত্র
দিলে প্রাণ বিসর্জন, এ কেমন লীলাক্ষেত্র ।
তোমারও কি প্রাণ যায়, তবা কয় হাসি পায় ,
অনন্ত ব্রহ্মান্ড মাঝে, হাসিতেছে আলো জ্বালি ।।

(৮০)

মিশ্র বেহাগ-কাওয়ালী

ব্যথিতের বেদন বুঝিবে কোন্ জন -
তুই না বুঝিলে মা কালী ।
দিয়ে মায়ার বেড়া[১] একি করিলি তারা -
কিছুই বুঝি না তোর হেয়ালি ।।

আশার ঢেউয়েতে নাচাও ,,
কামনা সাগরে ডুবাও,
বিষয় লালসায় ভুলাও একি খাম খেয়ালী,
আমি কি বুঝিতে পারি তোর মা এই চাতুরী,
বুঝা মাগো কৃপা করি এই খেলা ছেলেখেলি ।।

১। পান্ডুলিপিতে 'বেরা' ব্যবহার করা হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

ভবের ছাড়িয়া মায়া
ডাকে শুধু তারা,
তাই কি মা মহামায়া, সংসার মায়ায় ভুলালি।
তোর করিলে আশা তার কি মা এই দশা,
এই কি মা ভালবাসা মায়ার পাকেতে ফেলি ॥[১]

(৮১)

ভাইয়ে ভাইয়ে কাটাকাটি, মা বেটী কি দেখছিস চেয়ে।
মিছে রইলি, কোন্ আড়ালে, কোলের ছেলে রনে দিয়ে ॥

শুন বলি মা বুড়ো কালী,
কাটাকাটি কি ছেড়ে দিলি।
তবে তুই বৈষ্ণবী হলি, আমি যাবো কৈ লুকায়ে ॥

এত দিন মা অসুর রনে,
ছিলি ব্যস্ত রাত্র দিনে।
যাদু হলি সমর্পনে, ছেলেদল মা তুই খেপিয়ে ॥

১। মূল পাণ্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

রক্ত নদী বইছে কত,
এ ব্রহ্মাণ্ডে হয়নি এত।
বলিদানের ছাগের মত, কাঁপছে সবাই ভয়ে ভয়ে ॥

ভাইয়ে ভাইয়ে কাটাকাটি,
খুন বলি মা হ্যাংটাবেটী।
ভবাপাগলা পায়ে লুটি, বলছে মাগো দে মিটিয়ে ॥[1]

(৮২)

মা, আমার সুখের সীমা নাই।
দুর্দিনে, মা দুরাদৃষ্টে, যা পাওয়া যায়, তাই আমি খাই ॥

কিছু দিন আগের কথা,
ঘুরতাম[2] আমি হেথা হোথা।
এখন ভাবি কেবল বৃথা, তোর মন্দিরেই সুখের ঠাঁই ॥

চার, পাঁচ, ছয় আর সাত,
দেখছি কত দিন আর রাত।
সোনার থালায় খেয়েছি ভাত, কলা পাতেও জুটে না ছাই ॥

১। মূল পাণ্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত, গানটি এদেশে হিন্দু-মুসলমানের রায়টের সময় লেখা।
২। মূলে 'ঘোরতাম' রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

আপন মনে আপনি লিখি,
তুই দেখিস্ আর আমি দেখি।
নিটোল অটল দু'টী আঁখি, রাখি বন্ধন মিলন সদাই ॥

শাক্ ছুটে আর ছুটে টক,
উনোনে ভাত করে টক্‌বক্।
ভবা কয় মন ঠক্ ঠকাঠক্, ছুটেনা আর মন্ডা মিঠাই ॥[১]

(৮৩)

মা তুমি আমার কাছে থেকো (২)
আমি আছি ভুলি তোমায়,
তুমি কিন্তু ভুলো নাকো ॥

যে দিন আমার প্রাণ পাখী,
দেহ খাঁচা শূন্য রাখি।
উড়ে যাবে নীল আকাশে,
তুমি শুধু দেখে রেখো ॥

ভবা পাগলা বলছে খাসা[২]
পাখী কিন্তু তোমার পোষা
তোমার গানই গাইত শুধু
মনে মনে বুঝে দেখো।[৩]

১। মূল পান্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত।
২। চমৎকার, উৎকৃষ্ট অর্থে।
৩। গায়কঃ চুনীলাল ঘোষ, নিজস্ব সংগ্রহ।

Dhaka University Institutional Repository

(৮৪)

পাগলাসুর - কাহারবা

মা তোর গুষ্ঠির[১] খবর কুষ্ঠি[২] দেখে ধরে ফেলেছি ।
ফষ্টি[৩] করলে চলবে না আর তোর গোমর[৪] কথা সব জেনেছি ॥

কৈলাসপুরী তোর বাপের ভিটা,
কেন যে তা এত মিঠা ,
তাও জুটে না ধানের চিটা[৫] খাস্ ভরা কাঁকর পাথি ॥

কথা বললেই মা বাড়ে কথা,
বল ছেলে বলে কি আছে ব্যথা,
ছেলে ফেলে তুই হেথা হোথা, কেন ঘুরে বেড়াস মা মিছামিছি ॥

বসন ভূষণ দেয়নি কি,
তাতে আবার তোর লজ্জা কি,
মিলি ছেলের হাতে কোমর ঢাকি, বাপ ঠাকুরদার নিয়ম বাঁচি ॥

ওরা বাঁধলো ভক্তি ডোরে,
দেখা যাবে মা তাই এবারে,
খেলছিস খেলা জন্ম ভ'রে, কেবল ছেলে বেলার কানামাছি ॥

১। বংশের। ২। জন্ম তিথি, নক্ষত্র প্রভৃতি দর্শন।
৩। লঘু পরিহাস। ৪। মূলতত্ত্ব, মূল রহস্য।
৫। অসারবস্তু।

Dhaka University Institutional Repository

(৮৫)

পূরবী

মা তোর চাকুরী করতে যেয়ে আমার ফকীর সাজতে হলো ।
দিনান্তে না জুটে অন্ন, (তোর) অন্নপূর্ণা নাম ডুবিল ॥

আমি এবে ভিক্ষা করি,
ফিরি কত বাড়ী বাড়ী।
কেহ দেয় মা ঘটার বারি, (কেহ আবার) ফিরে আসতে বললো ॥

যদি কারো পরান পুরে,[১]
ডেকে মাত্র জিজ্ঞেস করে ।
মা থাকিতে ছেলে মরে, ভাবছি আমি তাই কেবল ॥

পরনে মোর নেংটা মাত্র,
রবির তাপে পুড়ে গাত্র ।
জল ভরা দুটি নেত্র, করে সদা ছল ছল ॥

কি অপরাধ করলাম পদে,
তাই ফেললি মা ঘোর বিপদে ।
অন্ন পূর্ণা তুই অন্নদে, ভবা কান্দে দিন যে গেল ॥[২]

১। স্নেহভরা, মায়া ।

২। মূল পান্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত ।

Dhaka University Institutional Repository

(৮৬)

মা, শেষের দিনে তুমি থেকো ।
আপন জন বলে, রাখিও চরণ তলে,
ভুল করিলে ভুলে, তুমি মোরে দেখো ॥

অবাধ্য যদি আমি, তুমি মা কখনো নও,
সময় হইলে এসো, যেখানে সেখানে রও ।
দীন তারিণী তুমি, পতিত পাবনী,
অসুর-প্রকৃতি আমি চোখে চোখে রেখো ।।

দুষ্ট – দলনী তুমি, শিষ্টের পালিনী,
বেদপুরাণে কহে, আমি তাল জানি।
হোক মহিমা বিস্তার, আমারে কর মা সংহার,
সংসার হতে দেহ বিদায়, ভবা নাম ঢেকো।।[১]

(৮৭)

মাকে পরিয়ে দে,
মাকে পরিয়ে দে, পরিয়ে দে রে বসন ভূষণ ।
রাঙ্গা জবায় ঢেকে দেরে, রাঙ্গা রাঙ্গা দু'টি চরণ ॥

১। গায়ক : মাখন মিত্রা সান্যাল, নিজস্ব সংগ্রহ ।

Dhaka University Institutional Repository

মায়ের চুল খুলে গেছে,
বেঁধে দে রে নূতন সাজে।
গায়ের রুধির দে রে মুছে, নাচতে মাকে করবে বারণ ।।

সিঁদুর দে রে মাঝ – কপালে,
সতীর জ্যোতি উঠুক খুলে ।
কাজ নাই শিবকে পায়ে দলে, ন্যাংটা মূর্ত্তী, অতি ভীষণ ।।

(বল) অসি মুক্ত খুলে রাখতে,
(হবে) দয়াময়ী নাম বারাতে ।
কাজ নাই তাঁর আর রণেতে, দিবানিশি পাগল মতন ।।

মা কি পরবে গয়না গাটী,
মস্ত বড় পাগলী – বেটী।
ভবা পাগলা বলছে খাঁটী, ও যে কারণের কারণ ।।[১]

১। মূল পান্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত ।

Dhaka University Institutional Repository

(৮৮)

পাগলাসুর- কাহারবা

মা গো অকূলে পড়িলে আর ডাকিবে গো কে তোমারে।
তোর দয়াময়ী নাম হয়েছে জানা, বুঝেছি[১] মা ব্যবহারে।

ফুলে রেখে গেলি ভুলে,
নিলি না তোর অভয় কোলে,
ছেলে যে তোর ফাঁসে ঝুলে, মায়ার তরুর ঘোর সংসারে।।

মা হয়ে ছেলে মারতে
কেউ দেখে নাই মা পৃথিবীতে,
তোর ইচ্ছা কি মা তাই দেখাতে, সংসারের ঘা দিয়ে মোরে।

কাছে এসে দেখা সবায়,
চরণ তলে রেখে ভোলায়,
ভুলাস যে তোর মায়ার খেলায়, মহামায়া মূর্ত্তী ধরে।।

দেখে বিষয় মায়ার ভীষণ বাতাস
ভবেনের কেবল পায় যে হাস,
কেটে দিস মোর অষ্টপাশ, তোর ভীষণ খাড়ার প্রবল ধারে।।[২]

১। মূলে 'বুজেছি' রয়েছে।
২। মূল পান্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

(৮৯)

মাগো তোকে ধরতে কি কেউ পারে।
তুই বাজীকরের সেয়ানা মেয়ে বেড়াস সবার অন্তরে।।

চুলের বাঁধন দিলি ছেড়ে, ন্যাংটা হলি বসন ছেড়ে।
ভীষণ রূপ তোর অন্ধকারে, কে পারে তা বর্ণিবারে।।

পাছে তোকে ধরে ফেলি, অন্তরে তাই লুকালি।
গুহ্য কথা কারে বলি, বসে কইছ কথা হৃদয় আড়ে।।

স্বামী নাকি তোর ভীষণ পাগল, বেছে নিল তোর পদতল।
তোর সনে সে কি পারবে বল, তাই চুপটি করে সে আছে পড়ে।।

বাপের বাড়ী যাবার তরে, দশরথে[১] দেখালি তোর বাবেরে।
তুই লুকালি দশাকারে, শিবের সাধ্য কি যে তোকে ধরে।।

ব্রহ্মা, বিষ্ণুর তাক্ লেগে যায়, ভুবন উঠাস তোর ইশারায়।
করিস মা তুই ভবার উপায়, যে দিন অন্তর হতে যাবি অন্তরে।।

১। দশ অশ্বের রথ যাহার।

Dhaka University Institutional Repository

(৯০)

পাগলাসুর-কাহারবা

মাগো, তোর নাম জপি বিরলে, তাও করে সবে কানাকানি।
কোথা আর নিভৃত বিজন, একলা সেথা যাই জননী ॥

ক্ষতি নাই কারো ক্ষতি,
তবে কেন মা আমার পর,
তোরই নামে [illegible] সাধি, [illegible] কভু ভাবিনী ॥

মনের দুঃখ মনে রইল,
সাধন ভজন কিছুনা হ'ল,
এ জনম বিফলে গেল, ডাকার মত ডাক একদিন ডাকিনী ॥

দেখলাম মাগো জগৎ মাঝে
তোরই রূপ সবে বিরাজে,
(তবে) কেন দুঃখ মনের মাঝে, তাও খেলা তোর রঙ্গিনী ॥

তোর নামে সদা বেড়াই,
তোরই প্রেমে হিয়া জুড়াই,
তবেন কে মা করছিস বাছাই, তোর এই সংসার চালার ঝেঁকে চালুনী।

Dhaka University Institutional Repository

(১১)

আশোয়ারী

মাগো ভবে আমার কেউ নাই আর, দয়াময়ী তুমি বিনে ।
কেন আমার, আমার, আমার বলে, মিছে ভাবি এ ভুবনে ॥

এতদিন যারে ভেবেছি আপন,
তারা কেবল মায়ার বাঁধন,
কেউ পারে না করতে মোচন, কেবল ডুবায় তারা দিনে দিনে ॥

কাঁচ দেখে মা বলছি হীরা,
তাতেই মাগো গেছি মারা,
ধরাকে মা ভাবছি সরা, তাই কিছুই হলোনা এ জীবনে ॥

ছেলের দুঃখ মা তুমি জান,
মায়া মোহে আছি অজ্ঞান,
জ্ঞান-দায়িনী কর জ্ঞান দান, বাঁচাও শ্যামা এ-অজ্ঞানে ॥

ভুলে, ভুলে, ভুলে, চলি
তাই রইলি মা ছেলে ভুলি,
ভোলার বুকেঃ পদ তুলি দে, তবার বুকে নিজ দয়া গুণে ॥

(১২)

মাগো মুখটা আমার বোবা করেছে, কান দে না মা বধির করে ।
তবেই শ্যামা হবে সামা ভয় কি মা এই সংসারে ॥

Dhaka University Institutional Repository

কথায় কথা বেড়ে চলে,
মন খারাপ মা কানে শুনলে।
উঠে খেপে ছয় সাপে, ফোঁস্ করে তারা দংশিবারে ॥

বিষের দাত আমার দেনা ভেঙ্গে,
কামড়াই যে মা নিজের অঙ্গে ।
বুঝি না মা কাহার সঙ্গে একই অঙ্গ সবাকারে ॥

রিপু রাশি দেনা বধি,
আঁখি মুদি রব নিরবধি।
তোর কাল রূপের নাই অবধি, সেই অসীম নেশার অন্ধকারে ॥

ওদের মত বোকা নাই
কি নিয়ে যে করি বড়াই ,
মাগো অন্তকালে এই চাই, তুই থাকিস মা পারাবারে ॥

৮.

(১৩)

মানুষ নাই তাই বস্ত্র পরি (নইলে) বস্ত্র আমার নিষ্প্রয়োজন।
সংযমী বিশুদ্ধ বস্ত্রে, করি আমি লজ্জা নিবারণ ॥

Dhaka University Institutional Repository

কি হাই মোর সাজ সজ্জা,
দেশা-চলে নাই সে লজ্জা।
মহাতেজ মোর অগ্নিমজ্জা, প্রফুল্ল মোর হাস্য বদন ॥

সাহসে ঘিরে না পাপে,
মায়ের ছেলে সেই প্রতাপে।
সৌভাগ্য পরম রূপে, হার মানে ঐ সূর্য্য কিরণ॥

পাপ পুণ্যের ধার ধারিনা,
ওদের সনে কথা কইনা।
মা আমায় করেছে মানা, মেনেছি মায়েরই শাসন[১]॥

মা আমারে ভাল বাসে,
সর্ব্বনাশী রিপু নাশে,
মা ন্যাংটা তাই ভবা হাসে, খুঁজে দ্যাখ তা কিসের কারণ ॥[২]

(১৪)

মায়ের কাছে সকল সমান,
কি বা হিন্দু, কি বা মুসলমান।
দেবতা মানুষের বিধান,
ব্যবধানে করে গঠন ॥

১। মূলে 'শাসিন' রয়েছে।
২। মূল পাণ্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

ফল ফুলে পূর্ণ ধরা,
কেউ সুখী কেউ কপাল পোড়া
বিধির বিধান এমন গড়া
কেউ সাধু, কেউ চোর মহাজন।।

(১৫)

বারোয়াঁ-খেমটা

যদি কাজ করবি ভাই আয়রে ছুটে শ্যামা মায়ের কারখানায়।
বেকার কেন বসে থাকবি, থাকতে এমনি দয়াময়ী-মায়।।

শ্যামা মায়ের কারখানাতে,
কাজ করতে হয় দিনে-রেতে[১]
বসে থাকলে ধরবে হাতে
দস্যু তারা ছ'জনায়।।

কাজের হিসাব নাইকো শ্যামার,
চুরি করলে নাইকো নিস্তার,
তাতেই বলি হও হুঁশিয়ার,
নইলে পাবি কড়ায় গণ্ডায়।।

কাজ করিস ভাই শ্যামা বলে,
তবেই শ্যামা নেবেন কোলে,
কাজ জানে বেশ এই ছেলে,
তখন বলবে পাগলা ভবায়।।

---

১. রেতে < রাতিয়া < রাতি < রাত

Dhaka University Institutional Repository

(১৬)

মাতৃস্মৃতি

যাঁহার উদরে জনমিয়া
ডাকিতে শিখেছি কালী বলিয়া।
সেই পুণ্যময়ী জননীর কায়া
মহা নিদ্রায় অচেতন ভুলিয়া মায়া।
সবার ঘুমাতে হবে জীবনের শেষে
অহঙ্কারে মাতিও না, দেখে শমন হাসে।
তাই বন্ধু ধরা শুধু মহামায়ার খেলা
ভবা কয় কেউ কারো নয় যখন ডুবে বেলা।।[1]

(১৭)

যে জন বিপদ কালে ডাকে, মা-মা, বলে,
রক্ষা কর তারে রক্ষা কালী।
যে জন শরণাগত[2], তুমি তার অনুগত
সতত অভয় দাও মা-ভৈঃ বলি।।

দেখিয়া ভয় হয় মূর্তি তোমার
মহামায়া নাম তব করুণা অপার।
কালী প্রেম সরোবরে যে দেয় সাঁতার.
আনন্দে ভব পারে যায় গো চলি ।।

১। নিজস্ব সংগ্রহ, [illegible] মন্দিরের গাত্রফলক।
২। আশ্রয় প্রার্থী।

Dhaka University Institutional Repository

সুখের সময় যে জন ভুলিয়া থাকে,
অতঃ ঘুরাও তারে বিষয় পাকে ।
মায়ার প্রভাবে ধরা দাওনা তাকে
কর কুবেরের মত তারে ধনশালী ॥

চতুর্ভুজা দেবী মুক্ত গলে,
স্মরণ যে জন লয় মরণ কালে ।
তার জননী বলিয়া কোলে
সন্তানে রাখ মাতা বক্ষে তুলি ॥

ভবা পাগলার যবে আসিবে মরণ
সবা[1] সনে মিলে যেন পাই শ্রীচরণ ।
প্রাণ খুলে মা তোমারে ডাকিনি কখন
(তাই) শমনের কবলে দিও না ফেলি॥[2]

(১৮)

ভৈরবী

শিবেরে[3] কি শিবে[4] তুমি শিখিবে গো চরণ দিয়ে ।
কি মুস্কিলে পড়েছি গো পাগলী-বেটি তোকে নিয়ে ॥

---

(১) সকল (২) গায়কঃচুনীলাল ঘোষ, নিজস্ব সংগ্রহ।
।(৩) শিবকে, মহাদেবকে ,(৪) শিব জায়া বা দুর্গা ।

Dhaka University Institutional Repository

রাজার বেটির কোমর ন্যাংটা,
এ আবার কেমন ঢংটা,
অন্য হলে পাঠতো ঘন্টা, করতো নিন্দা বিশ্ব ছেয়ে ।।

ছেলের মুন্ড করে ছেদন,
করেছিস তুই গলায় ধারন,
শ্মশানে তোর কেমন ভ্রমণ দিবানিশি চুল এলিয়ে ।।

মা তোর জন্মদাতা কে বটে,
বলবো যেয়ে তার নিকটে,
পায়ের তলে রেখে জটে১, জিভ কেটে সে আছে চেয়ে ।।

ওবার ভ্রান্তি কান্তি হেরে
যায়নি গো একেবারে,
বাপের বেটি হলে পরে, সবার সামনে আয়না যেয়ে ।।

(১১)

শ্মশান বাসী, শ্মশান বাসী মুণ্ড-কেশী মা ।
মুক্তি দিয়ে নে মা কোলে বিশ্ববাসী মা ।।

১। জটাধারী শিব ।

Dhaka University Institutional Repository

সহেনা মা এ দুর্ভিক্ষ
ছেলে মরে লক্ষ লক্ষ।
নেচে ভাঙালি শিবের বক্ষ, দক্ষ নাশী মা ॥

রক্ষা কর মা মুক্ত মালী
ছেলে কে নে মা কোলে তুলি।
কোলে উঠুক সকল ভুলি, দুঃখ রাশি মা॥

কি যেন কি মহাপাপে,
অন্নপূর্ণা উঠলি কেঁপে।
মরে যে সব ক্ষুধার তাপে, উপবাসী মা ॥

অসি ধরে কাট-না-সবে,
তোর অসি মা খুশী হবে।
ভবা পাগলার রক্ত খাবে, শুন রাক্ষসী মা ॥[১]

(১০০)

খাম্বাজ -ত্রিতাল

শ্মশানে শ্মশান কালিকা[২] থাকতে বড় ভালবাসে।
হৃদয় শ্মশান করে নে তোর কামনা বাসনা রিপু নাশে ॥

১। গায়কঃ চুনীলাল ঘোষ, নিজস্ব সংগ্রহ।
২। কালী।

Dhaka University Institutional Repository

যাবে না মা অন্য স্থানে,
থাকবে তোর হৃদ শ্মশানে,
দেখবি তোর শ্যামা এসে, হৃদ শ্মশানে আছেন বসে।।

চিতার আগুন নিভিয়ে কালী,
দিয়ে পঞ্চ অসুর বলি,
রাঙা পায়ে রিপু দলি, এনে দেবে তোমার বশে।।

তখন তুই যেথায় সেথায়
ঘুরে বেড়াস মন বিষয় চিন্তায়,
ধরবে না তোকে কোন ব্যাটায়. পালাবে সব কালীর ত্রাসে।

কালী নামের দীপ শিখায়,
যাকে ধরে মা তাকে পোড়ায়,
ভবাকে এনে মায়, রাখলো সদা তারি পাশে।।

(১০১)

পাগলাসুর-কাহারবা

শ্যামা নাম করিলে নাকি আত্মীয় স্বজন হয় গো পর।
তাই এলোকেশী ভালবাসি শ্মশানে করেছি ঘর।।

Dhaka University Institutional Repository

বাহির শ্মশান নয় রে আমার,
জ্বলছে অনল হৃদয় চিতার,
নিত্য পূজা হয় প্রতিমার ,
থাকি চিন্তানন্দে সদাই বিভোর ॥

কেন রে মন কিসের ভয়,
দু'দিন পরে কেউ কারো নয়,
যে জন সাথী সকল সময়,
তাঁকে ডাকি লও অবসর ॥

করি না মা কারো আশা,
'মা' তুমি আমার সব ভরসা,
দিন ফুরালে সকল ফরসা,
যেমন মেঘ জমা আকাশ ভিতর ॥

চাই না মাগো বন্ধু বান্ধব,
যাবার সময় সকল নীরব,
ভবা করে সদা কালী রব,
তাই আত্মীয় স্বজন গেল রে অন্তর ॥

Dhaka University Institutional Repository

(১০২)

'সন্ধ্যা আরতি-কাওয়ালী

শ্যামা মায়ের নিত্য করি আমি আরতি।
শঙ্খ ঘন্টা কাঁসর চামর লাগে না রে বাইরের বাতি।।

বিশ্বাস ধূপ সদাই জ্বলে
মাথার চুলে চামর ঢুলে,
ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ব্যোমে,
পঞ্চ প্রদীপ জ্বলে দিবস রাতি।।

ব্রহ্ম তালু, ব্রহ্ম রন্ধ্র
বাজে ঘন্টা মন্দ মন্দ,
বুঝবে সে জন প্রেমানন্দ
আনন্দময়ীর ছেলে জাতি[1]।।

শঙ্খ দুটি আছে আমার
সদাই ঝুরে তার প্রেমাধারে,
তাতেই স্নান হয় গো শ্যামার
মনের কাঁসর বাজাই মাতি।।

জন্ম, বিয়ে, মৃত্যু হবে
টিপসন্ধ্যা মোর হয়ে যাবে,
তবাকে মা কোলে নেবে,
জীবন দিবো তাই আহুতি।।[2]

১। এক প্রকার ফুলবিশেষ বা মালতি ফুল বিশেষ।
২। গায়ক : মাখন মিঞা সরকার, নিজস্ব সংগ্রহ।

Dhaka University Institutional Repository

(১০৩)

সবাই মোরে পাগল বলে, মা বলে মোর সোনার ছেলে।
কত জনা গালমন্দ দেয়, মা ভাসে তাই চোখের জলে ।।

কত জনা দেখতে নারে, মায়া-মোহ, এ সংসারে ।
তাই চলেছি ঐ অপারে , দিশেহারা ঐ অকূলে ।।

যখন আমি কেঁদে ফেলি হাসেন তখন মহাকালী ।
কালী দেন করতালি , (তখন) আমি হাসি মা-মা বলে ।।

চলেছি তাই একা একা , এথায় আর যায় না থাকা।
কত ব্যথার ছাপ আঁকা ,কেউ বোঝেনা , মা বোঝালে ।।

যত দুঃখ আমার মনে, সুখ আমার তার শত গুণে ।
মন সদা রয়, মার চরণে, জবা তবা দুটি ফুলে ।।

Dhaka University Institutional Repository

(১০৪)

পাগলাপুর-কাহারবা

সাধে কি বলি মা তোকে, দয়াময়ী নাম হয়নি ভাল।
আঁধারে রাখলি ছেলে ফেলে, দেখালি না তোর জ্ঞানের আলো।।

তোর আদেশে সূর্য্য জ্বলে,
চাঁদের উদয় শিবের ভালে,
তারা মালা সব দলে দলে, ছুটে এসে তোর পায়ে প'লো।।

আমি কি তোর আঁধার ছেলে,
নাই আলো কি মোর কপালে,
আমার হিয়া যে দুঃখে জ্বলে, মা খুঁজতে খুঁজতে সবই গেল ।।

বিন্দু মাত্রও আলোর রেখা,
পেলাম না-মা ভিক্ষুর দেখা,
আমায় দেখালি মা শুধুই ফাঁকা, এই আঁধার ভরা সংসার ধুলো।।

ভবেবের এই সাধের জীবন,
ধন্য হ'ত মা পেলে চরণ,
তখন দয়াময়ী নাম করে স্মরণ আশ্রয় করতাম মা তোর পদতলে।।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতি বিষয়ক গান

(১০৫)

যাহ আধ কথা কয়,, আধ-আধ হাসে ,,
চলিতে ঢলিয়া পড়ে,, মাতৃপদ পাশে।
মাকে না দেখতে পেলে নয়ন জলে ভাসে।।

ধুলোমাটি সার যার,, সমান সমান,,
বাহ্যজ্ঞান রহিত,, সেই শিশু ভগবান।
সাধক সেই শিশুর মত,, সেন জ্ঞানবান,,
জ্ঞান, বুদ্ধি, তুচ্ছ তার,, সদানন্দে হাসে।।

পন্ডিতের যাগযজ্ঞ,, হোম আদি যত,
'মা' ডাকা শিশুর কাছে সব পরাজিত।
সাধক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,, শিশুটির মত ।।
৮০ এক দন্ড মা ছাড়া ,, নাহি ভালবাসে।।

ছোট্ট কথার মাঝে,, বিশাল প্রকান্ড,,
ব্রহ্মময়ী মায়ের কাছে, ডুবিল ব্রহ্মান্ড
ভবাপাগলার মন,, কেন লন্ডভন্ড,,
শিশুর মত ঘুরে বেড়ায় আকাশে বাতাসে ।।

Dhaka University Institutional Repository

(১০৬)

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত।
এ অপরূপ সজ্জা তোমার দিগদিগন্ত॥
অসংখ্য রুদ্ধ নিঃশ্বাস তোমার কালান্তে মিশিয়া যায়,
তোমার এ অনন্ত বেশ ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়ায়।
শক্তির জ্বলন্ত মূর্তি মহাকাল ভয় পায়,
উপায় না জেনে মহেশ পায়ে ধরি হলো শান্ত॥

গ্রীষ্মে অগ্নি সম প্রজ্জ্বলিত তাপে,
তপিকম্প শিহরণ ত্রিভুবন কাঁপে।
শান্ত হও এসো এবার সুন্দর রূপে
বর্ষাতে স্নিগ্ধ ধরায় তাই করে শান্ত॥

শরতে হাসিয়া থাকে নীল গগনের চাঁদ,
হেমন্তে হেমকন্যা পাতিলো মধুর ফাঁদ।
শীতে সরস্বতী বিদ্যার আশীর্বাদ,
বালক সময়ে মাগো হইতে সুশান্ত॥

বসন্তে মৃদুল বায়ু দক্ষিণ সমীরন,
মন প্রবৃত্তি যত করে তাহে নিবারন।
ভবার এ ষড় ছন্দ মাতৃরূপ নিদর্শন,
এ রূপের নাই যে শেষ এ যে অনন্ত॥[১]

১। ভবার অনিন্দ লহরী, পৃ. ১০৫

Dhaka University Institutional Repository

বাউল সঙ্গীত

(১০৭)

আমার এই বাড়ীতে নয়টি নর্দমা[১]।
কী করে মন, বাস করিবে
ভেবে পাইনা সীমা।।

দুটিতেই দুর্গন্ধ, আর দুটিতে পচাগলা,
দুটিতে রয় হাবি-জাবি[২] দুটিতে হয় সকল জমা।
বড়ই মুশকিল, দরজার নাই খিল -
চুরি হল লোহা কাঁসা পিতল তামা।।

সোনাদানা যত ছিল, বিশ্বাসী লোক হরে নিলো,
মাল কুঠুরীর পাহাড়াওয়ালা তাদের সনে ভাগ বসালো।
ধইতে গেলে দেয় রে ছেলে, গুহরাজ শনি মামা।।

বাড়ীতে নাই প্রাচীর ঘেরা, বাড়ী কিন্তু চারতলা,
যারা গড়েছিলো এই মোকাম[৩]টি (দিয়ে) ভাল ভাল মাল মশলা।
আর থাকা যায়না, ধরলো নোনা, বাড়ী ভাড়া একটু কমা।।

একটি নালায় সব বুঝা যায়, ভক্তি বিশ্বাস মধু ঢালা।
উপর চটক[৪] বড়ই কটক[৫] মিছি দুষ্ট বড় শালা,
তাই ভবা পাগলা দিলো তালা, মৌনী মন্ত্রের হরনামা।।

১। পয়নিস্কাশন খাল (২) আবর্জনা, (৩) ব্যবসা বাণিজ্যালয়,
৪। চড়াই পাখি / চাতকিকা, (৫) সৈন্যবাহিনী/পাহাড়া।

Dhaka University Institutional Repository

(১০৮)

আমায় কে গো ডাকিয়া কয় পারে যাবি আয়।
চেয়ে দ্যাখ রবি ডুবে ঐ নীল আকাশ গায় ।।

নীল লাল হয়ে রবি,
হাসি মুখে বিদায় লভি,
পৃথিবীর বক্ষ হতে যেয়ে মিশে মায়ের পায়।।

সন্ধ্যা বলিছে আমায়
এসো ভাই মোর হিয়ায়,
দুজনে ডাকিব মাকে নিশীথ জোছনায়।।

সুবেশে বসন্ত দিদি[১]
নিয়ে এলো মুখে হাসি
কুহুতানে কোকিল ডাকে আয় মা শ্যামা আয় ।।

দিন গেল আয় চলে
থাকি যদি মায়ের কোলে,
একটু দাঁড়াও বন্ধু ফেলিয়া যেও না ত্বরায় ।।

১। চারিদিক ।

Dhaka University Institutional Repository

(১০৯)

আমি তীর্থবাসী হব না মন,
সংসার তীর্থে সকল পাব।

সংসারে যা' আয়োজন,
সন্ন্যাসীরও তাই প্রয়োজন।
তবে বল কিসের কারণ,
সংসার তীর্থ ত্যজিব।।

সংসার মাঝে আছে, গয়া কাশী বৃন্দাবন,
স্থির নিবিষ্ট চিত্তে করিব তার অন্বেষণ।
পরম বন্ধু আমার মন মহাজন,
পথের সন্ধান আমি তার কাছে জেনে নিব।।

আশায় জড়িত এবে সকল সাধ পূর্ণ হলে,
মনোময় ঠাকুর মোর পথের সন্ধান দেবে বলে।
ভবাপাগলা তাই, আনন্দে দোলে,
সংসারে সন্ন্যাসী আমি প্রেমের ধ্বজা উড়াইব।।

(১১০)

৮৮ আমি বহুরূপী,
পাপ করি কত চুপি চুপি।
সাধুর বেশে ভন্ডামী,
এ জগৎটা ও আর আমি তুমি
কোথা থাকেন অন্তর্যামী
ফুলকপি আর বাঁধাকপি।।

Dhaka University Institutional Repository

ভূস্বামীর বিরাট রাজা,
অধঃ গামীর বহু প্রজা ।
খেতে দিয়েছি , মুদির গাজা
(দিয়েছি) মায়া মোহে প্রাণ সঁপি ॥

ভবার দ্বন্দ, বেজায় পাকা,
কু-বুদ্ধি ভর্ত্তি ঝাকা ।
কাঁচায়, পাকায়, সেজে ন্যাকা,
কালী বীজমন্ত্র রূপী ॥

(১১১)

আমি মনের মানুষ নাহি পাই,
তন্ন তন্ন করি, খুঁজিলাম বহু,
ত্রিলোকের কত শত ঠাঁই ॥

মানুষ দেখি না চোখে, বেহুঁশের দল,
আমিও পাগল, (তাই) এরাও পাগল।
সকলি যে খল[1], (কেহ) নয় যে সরল,
গরল প্রবল দেখি, আমি যে লুকাই ॥

ভাল কহিতে গেলে বুঝেনা এরা
কাড়াকাড়ি , মারামারি দুনিয়া ভরা ।
স্বার্থের পিশাচ, হিংসায় সর্বনাশ,
ইন্সান বলিতে কভু, মোটেই যে নাই ॥

১। খল

Dhaka University Institutional Repository

জানে না কহিতে কথা, কথাটি বলে,
পথের চাইতে ভুল, কুপথে চলে।
বাহিরে সাধুর আকার, অন্তরে ভীষণ আঁধার,
সর্বগ্রাস করে এরা, তবু খাই খাই ॥

ভবাপাগলা তাই গাহিছে ছন্দ,
সবাই জগতে ভাল, আমি যে মন্দ।
আপনি ভাল, তবে, জগৎ ভাল।
ভাল হইতে গেলে, তাঁরে ডাক ভাই ॥১

(১১২)

আমি মানুষ খুঁজি,
আমি মানুষ খুঁজি,
আমি মানুষ খুঁজি।
তেমন মানুষ পেলে আমি, তার চরণে মাথা গুঁজি ॥

মানুষ আছে কোটি কোটি,
তেমন মানুষ আছে ক'টি,
ফুলের মত হাসি লয়ে নিত্য ওঠে ফুটি।
কটিতে নাই তার মায়ার শিকল, (হয়না সে) সবার কথায় রাজি॥

১। গায়ক : রুক্মিণী বিশ্বাস, উকিয়ারা, গড়পাড়া, নিজস্ব সংগ্রহ

Dhaka University Institutional Repository

মানুষ কুলে জন্মিয়া মানুষ হলাম না,
পরিচয় ভুল হ'ল গো, কথা শিখলাম না।
হরি কথা, কৃষ্ণ কথা, মুখে আসে না,
মায়ার ছড়া , গল্পগুজব, এই হল মোর পুঁজি।।

ওরা বহু কথা কয়,
পাখীর মত খাঁচায় পোষা এই তো পরিচয়।
মিছরি, চিনি, লাড্ডু, মন্ডা একি খাওয়া হয় ?
ছোলা দানা, খেয়ে খেয়ে ট্যাঁ-ট্যাঁ[১] শব্দ, তোজের বাজি।।

(১১৩)

৬৮ ইচ্ছা করলেই হয়না কিছু,
ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা চাই।
মরণ চাইনা, সুখ চাই,
(আমি) দুঃখ চাইনা অর্থ চাই।।

পরমার্থ কিবা দরকার,
বিষয় বাসনা চাই।
অভাব নাই কিছুই রে ভাই
যা, ইচ্ছা তা করা চাই।
মরে গেলে চুকে গেল তাই
মনে কর না ওপার গেলে পাবে রেহাই।।

১। বিরক্তিকর আওয়াজ।

Dhaka University Institutional Repository

এ পারেই অর্থের দরকার ওপারে পরমার্থ চাই।
এ চিন্তায় কিবা দরকার, এ ভাবিয়া কিছুই নাই।
ভবা তাই হেসেই ফুটপাট[1] (যাওনা) ওপারে যেয়ে খাবে ধোলাই[2]॥

(১১৪)

এক যে ছিল কানা বৈরাগী,
তার কথা জানা ছিলনা।
সদাই একতারা লয়ে গাইতো সদা তা না-না-না
তা না-না-না।
রাত নাই দিন নাই ঝুলি কাঁথা কিছুই নাই,
শুধু মাত্র নেংটি[3] পরা কেমন যেন আনমনা॥

হরি কি কৃষ্ণ বলে,
কেবল ভাসে চোখের জলে।
গলে নামের মালা ঝোলে,
কালী মন্দিরে আনাগোনা॥
কালীর কাছে তার নিবেদন,
(চাহে) রাধা[illegible]র যুগল চরণ।
বুঝি না তার এ কোন কারণ,
কি যে তার উপাসনা॥

১। হেসে আত্মহারা।
২। পিটুনি।
৩। লজ্জাস্থান নিবারণ করে এমন কৌপীন বিশেষ।

Dhaka University Institutional Repository

সেই কানাটিই ভবা বটে,
কালী নামে কমল ফোঁটে।
কৃষ্ণ প্রেমের মধু লুটে,
কালী ভবার দেহখানি
মনটি ভবার কেলে[১] সোনা ।।

(১১৫)

ঐ ডাক পড়েছে শুনরে মন যেতে হবে পারে।
থাকবে নারে মায়ার বাঁধন সকল যাবে ছিড়ে।।

আশা নদী বইছে তোমার, কু-বাসনার লাগল জোয়ার।
তেজো এলে নদীর এ পার সাধ্য কি আর ফিরে।।

এ- থাকার সাথী যত, আসে যায় অবিরত।
তুমি যাবে তোমার মত, সঙ্গে নেবে কারে ।।

আমার ডাক পড়ে নাত, নামায় দিতে ডাকছি কত।
ভবাপাগলার মনের মত, সঙ্গে নিতে পারে ।।[২]

১। কৃষ্ণবর্ণ ।

২। গায়কঃ- চুনিলাল ঘোষ, নিজস্ব সংগ্রহ ।

Dhaka University Institutional Repository

(১১৬)

ও ঠাকুরঝি, যাবার কথা মনে পড়ে কি ?
হেঁসেলে কখন ঢুকলে বড় ঘরে যাবিনি,
কাঠ, কয়লার ধুঁয়ো খেয়ে আশা মেটেনি ??

ঠাকুর ঘরে পূজো বাকি , ফুল তোলা তো হয়নি
দেখনা চেয়ে বেলা পাটে কাৎ হয়েছে ঠাকুরাণী।
শীগ্‌গির যা তুই পূজা করতে সময় পাবিনি ।।

ভাসুর, শ্বশুর ননদিনীর মুখের সদা ঝাঁকুনি,
দিন রজনী, জ্বালান তোরে ,
চোখে ভাসে নোনা পানি ।
ভবার রান্না , বাকি রইল
চিতায় ,ভুলে আগিনী ।।[১]

১। দ্রষ্টব্য : ভবার আনন্দ লহরী, পৃ ১১০ ।

Dhaka University Institutional Repository

(১১৭)

ওরে বিনে মেহনতে হাতী কেনা যায়
(তুই) মেষ কিনিলে ক্যানে ।
দুর্বলতা এই হীনতা বন শূকরের স্বভাব মনে ॥

দেবতার আদেশ নিয়ে
মানবতরী এলি বেয়ে।
শ্রেষ্ঠ কুলে জনম পেয়ে
অধম হলি দিনে দিনে ॥

অধমের পতিত পাবন
কর দেখি মন্ নাম উচ্চারণ ।
তবার সত্য মধুর বচন
স্থান পাবিরে তাঁর চরণে ॥

(১১৮)

(তুমি) কর্ম করিলে ঠন্ঠনাঠন্, ধর্ম করিলে ভুয়া[১],
কর্কশ তোমার মুখের ভাষা, (যেন) চৈত্র মাসের কূয়া[২]।
বিদ্যাবুদ্ধি কাঁচকলা তোমার, (যেন) পাথর কয়লার ধূয়া[৩] ॥

১। মিছেমিছি, ফাঁকী, (২) কূপ, জলাশয়, (৩) অগ্নিমিশ্রিত নির্গতবায়ু ।

Dhaka University Institutional Repository

বাপ মানেনা, মা মানেনা, ইয়ার্কিতে[১] পটু,
ফাঁকা স্থানে, বনে জঙ্গলে, কেবলই টুঁ টুঁ[২]।
বিয়ের ফাঁদে, পড়লে যাদু, (হবে) নেত্তি আর লাট্টু[৩]।
(তখন) দুটি চোখে, সরষে ফুলের গজাবে গুঁয়া[৪]।।

নিজের বাড়ী থাকতে রে মন, মামার বাড়ী যাও,
ভাল-মন্দ কার বাছ, মজা মেরে খাও।
রোজগার পত্রের নাম গন্ধ নাই, আড্ডা মেরে বেড়াও,
বাড়ী ঢুকেই চোখ রাঙানো, পিয়ান-পন্ডিতের হুক্কাহুয়া[৫]।।

ভবার ভাষার ভুল ধর না, ফোঁস-ফোঁসানি থামাও,
কতটুকু গরম রক্ত? নিজেকে সামলাও,
একটুখানি বাতাস তোমার মনকে বুঝাও।
ভবার হাসি সব কিছুতেই দেখছি কত, ভায়া[৬] [৭]।।

১। ঠাট্টা, (২) উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘোরা
৩। সূতা জড়ানো লাটিম বিশেষ।
৪। বীজের অঙ্কুরোদগম, পোহান অর্থে।
৫। চেঁচামেচি।
৬। ভাই।
৭। গায়কঃ ফাল্গুনী বিশ্বাস, নিজস্ব সংগ্রহ

Dhaka University Institutional Repository

(১১৯)

কারুর প্রাণে আঘাত হেনোনা
অসংখ্য অসংখ্য পাপ, (কভু) কুড়িয়ে এনোনা।
এ কুল, ও কুল এই দুইটি কুলের
কোনও কুল কিন্তু পারে না ॥

সাবধান করিলে কেহ মানিয়া লইও,
নিজের বিবেককে তুমি জিজ্ঞাসিও ।
ভালমন্দের কাছে তুমি নিজে হারিও,
সর্বনাশের মুল দুইটির সঙ্গ নিওনা॥

বিবেক শূন্য ভবা আবোল তাবোল বলে,
শালা ছাড়া কহিনা কথা যা থাকে কপালে।
মরণ তো হবেই জানি (পরিব) না কালের কবলে ,
আঘাত পাওয়া জীবন যদি -
আঘাতেই বাড়ছে উপাসনা ॥

(১২০)

কারে তাল-বাঁধিয়া , চলেছে মন ভাসিয়া
সুখনদী নাই পারাবার।
কিছু নয়, কিছু নয়, অভিনয় , অভিনয়,
আলোটি নিভিলে অন্ধকার ॥

Dhaka University Institutional Repository

যে দিন আসিয়া তুমি, দেখিলে সুন্দর,
ভাব নাই তারে ফিরে, অতি ভয়ঙ্কর ।
এ-কূল ওকূল সব হলো ভুল,
গ্রাসিল তোমারে সংসার ॥

কেউ তো কারো নয় জানে সর্বজন,
(তবু) মোহ মদিরা পানে, রইলে মগন ।
আমার আমার, কতদিন আর,
এপার হইতে হবে পার ॥

কিসের এ ভালবাসা দুদিনের খেলা,
দেখিতে দেখিতে ঐ ডুবিল বেলা ।
ভবা কয়, ভবা কয় কেউ তো কারো নয়,
কালী বলে দাওনা সাঁতার ॥

(১২৯)

কৃষ্ণ হতে গুরু বড় জানেন যে জনা,
প্রেমিক বটে সেই মহাজন, (তাঁর) জানেন ঠিকানা।
রাধা প্রেমে কৃষ্ণ বাঁধা, সত্য নিশানা ॥

Dhaka University Institutional Repository

রামীর সঙ্গে চন্ডীর মিলন, বাবুছে এর আসনা ..
কেবা গুরু , কেবা শিষ্য, বৃথা আলোচনা।
বাঁশুলী কালী,
পূজার ডালি, বহে দু'জনা।।

মীরার সনে, রণ ছোড়জীর রাজ-পুতনা,
সংসারে দু'হে, লীলা করেন, রাছেন ঘোষণা ।।

গানের ছন্দে ,
শ্রী-গোবিন্দ, করে ছিলেন উপসনা ।।

তবার সনে ভবানী রয়, আমতা গ্রামখানা .
ভ্রমণ যাত্রী সর্বস্থানে এলাম কালনা ।
উপদ্রবের মহোৎসব,
করে এলাম্ সকল নীরব, (পেলাম) বড়ই যন্ত্রণা ।।[১]

(১২২)

গু, মাখলে কি যমে ছাড়েরে,
যম ধায় পিছু খুধুর মতো।
কি ভাবনায় দিন কাটাচ্ছ (তাই)
কেবল দেখছি অবিরত।।

১। শ্রী সনৎকুমার চৌধুরীর সৌজন্যে প্রাপ্ত ।

Dhaka University Institutional Repository

৮.

আমিও ছাড়বোনা তুমিও ছেড়োনা
সমান সমান থেকো।
তার কপালে কি আছে মন ভাল করে দেখো ।
শেষ পরিণাম কালী কালী নাম,
সময় থাকিতে লহ তো ।।

অট্টালিকা আর ভাঙ্গা কুঁড়ে,
তাই বলে কি যমে ছাড়ে।
যমের লাথি প্রতি ঘাড়ে,
পড়বেই মন মনোনীতে।।

চালাকি আর বোকামী,
বাবু হও আর কর গোলামী,
দিয়েছ কি তাঁর সেলামী,
যে দেখছে সব দেখার মত।।

ভবার হাসি ভবার খুশি,
ঘসখুশি আর মিলামিশি।
কি ভাবছো মন পিসো-পিসি,
মেশামেশায় মেশার মত ।।

(১২৩)

ঘরে বসেই তাঁরে পাওয়া যায়, বৃথা কেন বনে গমন।
চুপটি করে ঘরের কোণে, মুদে দ্যাখ তোর দুটি নয়ন।।

Dhaka University Institutional Repository

ছেড়ে দে, ভুবে প্রসাদ
কলিতে নাই সে সব আস্বাদ।
ঘরে বসে খেয়ে প্রসাদ , একটু তারে করিস স্মরণ।।

ধর্ম করিস, কর্ম করে,
পাবিরে সুখ, এই সংসারে
মনটি রাখিস, কষে ধরে,
বনে গেলেও সব প্রয়োজন।।

আনন্দেতে করবে সংসার,
সঙ না সেজে , নাম করিস সার।
বেঁচে রইবি , কত দিন আর,
অতি শীঘ্র এলো মরণ ।।

সংসার ছেড়ে বনে যাবি,
ভাত না খাস, ফলতো খাবি।
মুখ বদলালে, ফল কি পাবি,
ভবাপাগলার এই তো ভজন।।[১]

১। দ্রষ্টব্যঃ- 'ভবামৃত', পৌষ মাঘ সংখ্যা, ১৩৯৬ সন ।

Dhaka University Institutional Repository

(১২৪)

চতুর তুমি হইওরে মন চতুর হইওনা,
ফকির তুমি হতে পার এর বেশী আর না।
তাঁহার হাতে সব সমর্পিয় কর্ম ছেড়ো না॥

তুমি তাঁকে রেখো বুকে, মুখে লহ ও নাম,
এথায় আশা সার্থক হবে (হবে) ভাল পরিণাম।
নাম রসে ডুবে থাকো, সাঁতার কেটো না॥

আসা কালে যতু কষ্ট যাবার কালেও তাই,
তাইতো ভবা মগ্ন রহে, গান লিখি গান গায়।
সার্থক হলো জন্ম নেওয়া, আর আসিব না॥

(১২৫)

দেশমিশ্র - তেতালা।

চরণে স্মরণ যেন থাকে, ভোলা মনটা আমার
অকুল পাথারে ভয় কি তোমার, প্রাণ সঁপিয়া দাও তাঁকে॥

Dhaka University Institutional Repository

পাপের সাগরে যদী ডুবিয়া মর,
কান্ডারী রয়েছে পিছে কাহারে ডর।
কর তাঁর গুণ গান - শীতল হইবে প্রাণ,,
হাসিতে হাসিতে যাবে পুলকে গোলকে।।

আমার আমার বুলি কহিওনা আর,
নয়ন মুদিয়া দেখ সব অন্ধকার।
আনন্দ কর মন, আছ তুমি যতক্ষণ,
ভবা কয় চলিছ যে মরণের দিকে ।।[১]

(১২৬)

চোর ঢুকেছে ঘরে।
পাহারাদার ঘুমিয়ে পড়লো ধরবে কেমন করে।।

ঘুমান যিনি জাগান তিনি,
কি মুস্কিল ছিঁমিঁমিঁনি।
ফিস্‌ফিস্‌ আর কানাকানি,
সব মিল ঘন স্বরে ।।

বিবেক বস্তি, দস্যু-ঝস্তি,
পালোয়ানের বেজায় কুস্তি।
ডাঙ্গায় বাঘ, জলে হস্তী,
মস্তিষ্কের মগজ ধরে ।।

১। মূল পান্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত ।

Dhaka University Institutional Repository

৮.

ঘরের মালিক পাগলা ঠাকুর,
পুষেছিল দুটি কুকুর।
অচৈতন্য ঘুমে বিভোর,
শ্রীচৈতন্য পড়লো ফেরে।।

ভবাপাগলা চোর ধরতে,
জেগে থাকে দিনেরাতে।
জেগে দেখি রোজ প্রভাতে,
কিছু নাই ভান্ডারে।।[১]

(১২৭)

জীর্ণ ঘরটি[২] ভেঙ্গে দিলে, পশ্চিমের ঐ পাগলা ঝড়ে।
নাই সামর্থ, নাই কো অর্থ, (হ'লাম) সর্ব্বশান্ত ভেঙ্গে চুরে।।

একা ঘরে[৩] একা মালিক,
ভাঙ্গালে কেন নীলমানিক।
সূর্য-চন্দ্র সব রেখে ঠিক, গরীব কেবল ফেললে মেরে।।

আমি যে রে বড়ই গরীব,
আঁধার ঘরে নাই যে প্রদীপ।
নিঝুম বিন্দু এই মোর দীলিপ, জ্বলে উঠ অন্ধকারে।

তুমি এমন বন্ধু থেকে,
থাক কেন মেঘে ঢেকে।
গরীব রেখে বুকে বুকে, আশার আলো দাওনা ছেড়ে।।

১। দ্রষ্টব্যঃ- নামের ফেরিওয়ালা ভবাপাগলা, পৃ. ২১৮
২। মূলে 'ঘড়টী' রয়েছে। ৩। মূলে 'ঘড়ে' রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এত চঞ্চল এত অস্থির,
ভাঙ্গলে কেন জীর্ণ কুটির।
ভবা কয় বড় হও শানুধীর, বীর কইবে যে সব তোমারে।।[১]

(১২৮)

টক্ মিষ্টি তেঁতো পোড়া ছেকরা আর নুন ঝাল,
কোন্ ব্রহ্মাণ্ডের আবিষ্কারক কোন মদিরার ঘোর মাতাল।
কেউ বা লোভী কেউ বা কামুক কেউবা প্রেমিক,
কেউ বা মায়াবাদী কেউ বা নদীতে ফেলছে জাল।।

এ যে গোল পাকানো তাল পাকানো,
(এ নহে) কৃষ্ণ অষ্টমীর গোলা তাল।
তাল বেতালের গোলক ধাঁ ধাঁ,
মহাকালের মহাকাল।।

কেউ হাল ছেড়ো না ভবার মানা,
(এ যে) বিধির নীতি চিরকাল।
যে কয়টা দিন বেঁচে থাকবে নিজের মনে নিজে রাখবে,
(তবে হবে) সূর্য্যের মত টক্টকে লাল।।

(১২৯)

টাকা কিন্তু অনেক বড়, মন কিন্তু অনেক ছোট,
যার হয় অনেক টাকা, সে হয় কৃপণ।
অর্থ হয় অনর্থের মূল, টাকা ছাড়া সকল ফাঁকা,
কলিযুগে হয় না সাধন ভজন।।

১। মূল পাণ্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

কবে আমি টাকা পাবো -
ভগবানকে ভুলে যাবো   পায়ের উপর পা নাচাবো
হবো বড় মহাজন।
একেবারেই যাব গোল্লায়, পাবো কলি রাজার সিংহাসন।।

টাকা ছাড়া চলবে না
ভবার সত্য ভাবনা   মা ভবানী উপায় কর,
এইটি ভবার সাধনা।
মা তো ভবার হৃদয় মাঝে, কর্ম করি অনুক্ষণ।

(১৩০)

টাকা গড়্ গড়্ গড়্ গড়্ গড়্ কইর‍্যা চলে।
হুঁক্কা টানা, বুইড়ার[১] মত দুই দিকে কথা বলে।।

টাকায় বৌ ঘরে আনে, সজ্ঞা আনে শাও,
বৌ ছাইড়া শালী ধরে, আর কি মজা চাও,
দিন দুপুরে তারা দেইখ্যা, ঝাঁপ দেয় কূপের জলে।।

টাকা যদি হাতে পায়,
পায়ের উপর পা নাচায়।
তারে পায় কোন শালায়,
কাঠের ঘোড়া হুকুমে চলে।।

১।   বৃদ্ধের মত।

Dhaka University Institutional Repository

টাকা ভরা নারে চারে,
কারুর ঘাড়ে নাহি চড়ে।
টাকা তুইল্লা আছাড় মারে
(তবুও) লক্ষ্মী-ঠাকরুন রাখে কোলে।।

(১৩১)

টাকারে তোর, বেজায় বড়, বড় সম্মান।
স্বর্গের যত ঠাকুর-ঠুকুর হার মানিল ভগবান।।

চোর ডাকাতের হানা কত
টাকার লোভে মানুষ হত।
টাকায় হারায় বুদ্ধি যত,
কারুর রাখে না কুলমান।।

সাধু, গুরু বৈষ্ণব আদি -
টাকার বশ ঐ অনাদি।
মরা গাঙ্গের ক্ষীণ নদী
টাকায় বাঁধে তাকে বান্।।

ভবাপাগলা টাকার তরে,
ভিক্ষা করে প্রতি দ্বারে।
মাতৃনাম গানের সুরে
শীতল করে সবার প্রাণ।।

Dhaka University Institutional Repository

(১৩২)

আশোয়ারী-ত্রিতাল

তুমি ভাবছ কি বসে দিন কি তোমার এমনি ভাবে যাবে।
সকলই তোর পড়ে রবে, শেষে শেয়াল কুকুরে খাবে ॥

হাম্বিদাম্বি কার উপর
সকলই তো দেহের গৌরব,
বিষয় নিয়ে সদাই বিভোর বুঝবে শমন আসবে যবে ॥

চিন্তরে মন শিবরাণী,
ধ্যানে কাটা দিন যামিনী,
সেই মা যে দয়ারখনি তাঁরি কাছে কত স্নেহ পাবে ॥

অসার-বাসা ছেড়ে খাসা,
উড়ে যেয়ে কর না বাসা,
কতই তার ভালবাসা কাছে গেলে বুঝবি তবে॥

ভবা কেবল বসে ভাবে,
কি ভাবেতে সেই দেশে যাবে,
কবে শ্যামা মায়ের চরণ পাবে তবেই শান্তি হবে॥[১]

(১৩৩)

তোমারই জীবনে ঠকে গেলে তুমি,
পাবেকি আর ফিরে এমন জীবন।
কত অপরাধ, কত অপমান,
করিয়াছ প্রতিদিন ভীষণ, ভীষণ ॥

১। মূল পান্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

হাসিয়া হাসিয়া কত করিয়াছ পাপ,
কাঁদিলেও ফুরাবেনা সে অনুতাপ।
কুড়িয়েছ শত শত, কত অভিশাপ,
কত জনার প্রাণে ব্যথা দিলে অকারণ ॥

৩:
ভবা কয় কেন এলে মানুষের ঘরে,[১]
নিশ্চয় ছিল কিছু, সেই ভাগ্যজোরে।
কেন, মন গেলে তুমি, এত ছাড়খারে,
এখনও চাহ ক্ষমা, আছ যতক্ষণ ॥[২]

(১৩৪)

তোমার সঙ্গের সাথী কেউ হবে না, শেষের দিন অন্তকালে।
স্ত্রী পুত্র জ্ঞাতি সূত্র সবাই তখন দেবে ঠেলে ॥

আপন ভেবনা কারে,
এই অকূল সংসারে,
কেউ সঙ্গে যাবে না রে যখন তোমায় নেবে কালে ॥

ভোলামন ভুলে পড়লি,
বিষয় ডালে বসে রইলি,
নীচের দিকে না তাকালি, বেঁধে মারলো নয় নালে ॥

১। মূলে 'ঘড়ে' রয়েছে।
২। গায়কঃ স্বর্গীয় রায়চরণ কর্মকার, নিজস্ব সংগ্রহ।

Dhaka University Institutional Repository

শ্যামা মাতার পাতার আড়ে,
থাকলে প্রকৃতি না ফেরে,
বিফলে জীবন যেত না রে, ভবপারে যাবার কালে।।

শ্যামা মন্ত্র হৃদে গাঁথি,
তবেন করলো সজ্ঞার সাথী,
সে যাবে না কালের নাথি, শহান পেল শ্যামার পদতলে ।।[১]

(১৩৫)

দূর করে দে মনের ময়লা, (ওরে) ঠাকুর পূজো কর।
ঠাকুর রয়রে ভাতের হাড়ি, মন্দির রয়রে রান্না ঘর ।।

আচারে দেখি বিচার নাই,
ব্রহ্মান্ডে কই শুনতে পাই,
জাত্ গেল, জাত্ গেল তাই, আপন মানুষ হ'লো পর ।।

মন্ত্র তুই বেশ শিখেছিস্ ,
ছুঁবি ছুঁবি বোল ধরেছিস ।
জলে গেলে করিস ইস্ ইস্, ধ্যান হলো তোর ছুয়ার উপর।।

ছেড়ে[২] দে তোর ছুঁয়া-ছানি,
পেতে দে তোর হিয়াখানি।
নাচবে দিয়ে পা দু'খানি, প্রেমের ঠাকুর যুগ্ যুগান্তর ।।

১। গায়ক: রুক্মিণী বিশ্বাস, নিজস্ব সংগ্রহ ।
২। মূলে 'ছেরে' রয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

এই তো এদের ধরম-করম,
তবা কয় তাই হয়ে নরম,
ঠাকুরের দল পেয়ে শরম[১] লুকিয়ে গেল চুলোর ভিতর।।[২]

(১৩৬)

দেহ অট্টালিকাখানি অতি মনোরম ।
তাহাতে বসতি করে, একটুখানি দম ।।

সতর্ক থাকিও তুমি খুব হুঁশিয়ার,
রক্ষক তক্ক 'কনু, খবরদার, খবরদার ।
পাহারা দিও তোমার ঐ নব-দ্বার,
চোর-দস্যু ষোল জনা, ঘুরে হরদম ।।

খাতা পত্র ঠিক রাখে, বিবেক, বৈরাগ্য,
এদের মাহিনা দিয়ো, তোমার সৌভাগ্য ।
অট্টালিকা মজবুত রবে, বাস করিবার যোগ্য,
কি ক্ষতি করিবে বল, শনি-রাবি-সম ।।

ভবার অট্টালিকায়, একটি বালিকা,
মাভৈঃ মাভৈঃ রবে, ঘুরে একা একা ।
পলকে ব্রহ্মাণ্ড দেখে দিয়ে গা-ঢাকা,
সুখে স্বচ্ছন্দে থাকি, নাই (মোর) লজ্জা শরম।।

১। মূলে 'সরম' রয়েছে ।
২। মূল পান্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত ।

Dhaka University Institutional Repository

(১৩৭)

পারণাম চিন্তা করিও না মন,
(তুমি) নামই তোমার আদি-অন্ত ।
তোমার যত কিছু তিনিই করিবেন,
ভাবিও না কিছু মন ভ্রান্ত ।
দিগ-দিগন্ত ব্যাপিয়া যিনি,
করিতেছেন কত খেলা
কত কিছু কাজে ব্যস্ত সদা তিনি,
কত সুন্দর তাঁর লীলা !
অনুভব করিতে শিখরে এবার
ওহে বুদ্ধিমন্ত ॥

অনন্ত অনন্ত, অনন্তকাল হতে
চলিতেছে এমন বিধান,
কি তব রূপ ওগো অপরূপ
প্রকৃতিই কি তুমি ভগবান ।
তবার বুঝিবার কি আছে প্রভু,
তুমি যে আমার দিগ-দিগন্ত ॥

(১৩৮)

পরের দোষটি ধরতে যেও না ভাই,
নিজে কেমন আগে এইটা, কর রে যাচাই ।
দেখবে তখন, তোমার মনটি, বাবলা গাছের ছাই ॥

Dhaka University Institutional Repository

দোষীর মখোশ দেখতে পাবে , তোমার আপন জন,
জ্বলবে তখন মন আগুনে, দগ্ধ-হুতাশন।
সেইটা হবে মহাশাস্তি (আর) ক্ষমার উপায় নাই॥

নিজের দোষের সীমা ছাড়া দেখতে পাওয়া ভার,
এইতো মজা, পারে সাজা, বিচার বিধাতার
ন্যায় দন্ড দন্ডায়মান, ঘুরছে যে সদাই ॥

ভবা এলো মরতে ভবে, ধরে পরের দোষ,
নিজের বেলায় ঠাকুরগিরি , নিজের বাইরে হুঁশ।
আর হুঁশিয়ার হবে কবে বেলা যে আর নাই ॥

(১৩৯)

পিরিত করা জানে ক'জনা।
পিরীতির রীতি-নীতি,
কাম রতির এক রতি না॥

শ্যাম পিরিত , আর কৃষ্ণ পিরিত,
(যেমন) মেঘে মেঘে খেলে তড়িৎ।
সেই মত প্রেম, হ'লে সুসৎ,
সে পিরিত আর ভাঙে না ॥

পিরীতির জ্বললে আগুন
তাহে পোড়াও দেহের ত্রিগুণ।
ত্রিসীমানায় উড়লে শকুন
তাহে শকুন বসে না॥

Dhaka University Institutional Repository

পিরিত কর তাহার সনে
(যেমন) চুম্বকে লোহা টানে।
জড়িয়ে থাকে প্রাণে প্রাণে,
কেউ ছাড়াতে পারে না ॥

পিরীতির দু'টি নয়ন,
একটি রাধা একটি মোহন।
(যদি হয়) একটি রতি, একটি মদন
(তবে) ভবার বাবা ছাড়বে না ॥

(১৪০)

বনের পাখী মনে এসে গান করে।
ঘুরে ঘুরে হৃদ মাঝারে ,উড়ে যায় আবার কোন সুদূরে॥

কত খেলা খেলতে জানে,
বাল্য হতে শেষ জীবনে।
পৃথিবীর ঐ নীল গগনে,
মেঘের আঁড়ে কোন নিবিড়ে॥

কত ভালবাসা-বাসি,
নাইকো জানা কোন বিদেশী।
কেন যেন সেই উদাসী,
মায়া জালে আটক পরে ॥

Dhaka University Institutional Repository

ভবার পাখী হৃদ মন্দিরে,
গান করে আর পূজোর তরে।
পূজো সাঙ্গ হলো পরে
বিদায় লবে চিরতরে॥

(১৪১)

বারে বারে আর আসা হবে না,,
মানব জনম তো আর পাবে না।
ভেবেছ মনে, এই ভুবনে,,
তুমি যাহা করে গেলে, কেউ জানে না॥

তুমি যাহা করে গেলে, পাশিয়া হেথা,,
চিত্র গুপ্ত[১] লিখে ভরিল খাতা।
বিচার করিবেন, ওই বিধাতা,,
ফাঁকি ঝুঁকি তাঁর কাছে কিছু চলে না॥

তুমি যাহা বদনে কর না প্রকাশ,,
অপ্রকাশ তাঁর কাছে কী সর্বনাশ।
জুড়িয়া আছেন বসে, হৃদয় আকাশ,
মানুষের কুলে, কালি দিয়ো না॥

সাবধানে চল মন, হও হুঁশিয়ার,,
বেলা তো ডুবিয়া যায়, আসে অন্ধকার।
মানুষই দেবতা হয়, হয় অবতার,,
ভবা কয় চোখ মেলে চেয়ে দেখনা॥[২]

১। সর্বজীবের পাপ, পুণ্য, আয়ু ইত্যাদির হিসাব রক্ষক। ইনি যম রাজের অধীন কর্মচারী।
২। দ্রষ্টব্য - ভবার পাগলার নির্বাচিত সঙ্গীত সংগ্রহ-১, পৃ. ৩০।

Dhaka University Institutional Repository

(১৪২)

ভজন সাধন কেন হবে না ?
খেল্‌তে খেল্‌তে ভেঙ্গে ফেল মায়ামোহ খেলনা ।।

শতং করি বুকের-পাটা ,
হাট পথে বাড়াও পা'টা,
কুন্ডলিনীর মূলের খোঁটা ,
অমূল্য এই সাধনা।।

টলবে নারে অটল মন্‌
ঠিক হবে তোর সাধন ভজন।
হবি রে তুই মায়ের রতন
কোল ছাড়া মা করবে না ।।

শিশু যেমন খেলতে থাকে
খেলতে খেলতে মাকে ডাকে ।
সংসারেরই গোলক ধাঁকে
(তেমনি) করেই ডাক্‌না।।

বিষয় নিয়েই খেলতে হয়,
(হবে) সাধন পথের শক্তি সঞ্চয় ।
ভবার কথা মিথ্যা নয় -
অভিনয়েই যায় রে চেনা ।।

Dhaka University Institutional Repository

(১৪৩)

ভাত খাও তাঁর ঠাকুর চিন না,
নিজের বেলা বুঝ ষোল আনা,
(কেবল) তাঁরই বেলায় কর তা না না না ।।

তিনি তোমায় না চালালে,
তিনি তোমায় না খাওয়ালে।।
তিনি তোমায় না দেওয়ালে,
কানা কড়ি মিলবে না ।।

তিনি একা কর্তা জগৎ মাঝে
(তাই) কারো হাত নাই কোনো কাজে।
(সেই) কর্তার উপর কর্তা সেজে,
মিছে কেন পাও যাতনা।।

ছাড়রে মন আপন বড়াই
(যেমন) হাতা বাউলি[১] লোহার কড়াই।
এক কড়া যার ভরসা নাই -
সেই দেনে-আলা জোটায় দানা ।।

ভবাপাগলা চিনে তাঁরে
ভাত খাওয়ায় যে ভাতারে।
সব শিখেছে তারে যে রে,
ভাতের ভাবনা সে ভাবেনা ।।[২]

১। উনোন থেকে তপ্তকোন পাত্র বা দ্রব্য নামানোর লোহার নির্মিত যন্ত্র বিশেষ। ('আঞ্চলিক শব্দ')।

২। গায়ক- রুক্মিণী বিশ্বাস, নিজস্ব সংগ্রহ ।

Dhaka University Institutional Repository

(১৪৪)

ভোলা মনটি আমার , চরণে স্মরণ যেন থাকে।
অকূল সাগরে ভয় কি তোমার প্রাণটি সোপিয়া দেহ তাকে।।

আমার আমার বলি কহিও না আর,
নয়ন মুদিয়া দেখ সব অন্ধকার ।
আনন্দ কর মন, আছ তুমি যতক্ষণ,
ভবা কয়, চলেছ যে মরণের দিকে।।

পাপ সাগরে যদি ডুবিয়া মর,
কান্ডারী রয়েছে পিছে কাহারে ডরো।
কর তার গুণ-গান , শীতল হইবে প্রাণ,
হাসিতে হাসিতে যাবে, পুলকে গোলকে।। [১]

(১৪৫)

মন তুমি অনেক কিছুই তো শিখেছ,
শিখছ কি, সবাইকে ভালবাসিতে ?
(নইলে) তোমার বৃথা হলো সকলি,
এসে এমন ভুবন-মোহন পৃথিবীতে ।।

১। গায়কঃ মাহন মিঞা সাদ্দার, নিজস্ব সংগ্রহ

Dhaka University Institutional Repository

(এথায়) সুন্দর নীল আকাশ।
(এথায়) স্নিগ্ধ মধুর বাতাস,
অনুভবে বোঝ একটুকু খেয়ালের আভাস,
দিনটি কাটলো বটে মসগুল বসে,
(আছ) কোন বা স্ফূর্তিতে॥

ভবের হাটের জীবন সন্ধ্যা বেলা,
ফিরবে যে দিন তুমি একেলা।
আশার বাসা ভাঙ্গবে তোমার,
ভাঙ্গবে খেলা-ধুলা॥

তাহাও তুমি বুঝবে নারে যাচ্ছ পারে,
ঘুমিয়ে ছিলে যে মোহের গদীতে।
(পরেছ) কুটিল কাল চক্রে,
সবাইকে হারাতে যাও, যুক্তি, বুদ্ধি-তর্কে।
নিজে হারলে কতখানি স্বর্গ আর-মর্ত্যে,
নিজে খাচ্ছ হাবুডুবু শুনছো বাবু,
ভবার দিন যায় ভাবিতে ॥

(১৪৬)

মনকে সাধু করতে পার, ধর সাধুর বেশ।
(নইলে) দেখার মতো দেখবেন তিনি।
ধরবেন মাথার কেশ ॥

Dhaka University Institutional Repository

সাধু নয়রে দুখের কথা
(সবার) যার চরনে নোয়ায় মাথা।
নেমে আসে সব দেবতা, ছেড়ে স্বর্গ-দেশ ।।

সাধু সেজে সবার চোখে দিচ্ছ ধূলো,
মরবে নিশ্চয় (জেনো) মরণ এলো।
মাঁড়াখরা কালী কাল, করবে কিন্তু শেষ।।

মনকে দিচ্ছি গালাগালি,
সাধু হতে কত বলি।
ভবাপাগলা ঘুরছে খালি, সাধুতার নাই লেশ ।।

(১৪৭)

মনের কথা কইতে যেয়ে হয়ে গেছি বোকা,
গোপন ছিল হিয়ার মাঝে, চুপি, চুপি একা ।।

যখন আমার ছিল গোপন,
দেখতাম কত মধুর স্বপন ।
প্রকাশ করে সব বিসর্জন,
দিয়েছি হে সখা ।।

ছড়িয়ে গিয়েছে পড়ে,
কত দেশ দেশান্তরে ।
চলে গেছে নাই অন্তরে
হয়েছি যে ফাঁকা ।।

Dhaka University Institutional Repository

শূন্য গগন, শূন্য ভুবন,
উড়ছে পড়ছে যখন যেমন ।
জল, স্থল, গহন, কানন,
কভু সোজা কভু বাঁকা ।।

চারি ভাগে ভাসছো তুমি,
দেখতে পাই তোমায় আমি ।
ভবা কয় অন্তর্যামী,
(আছ) আঁখি কোলে আঁকা।।

(১৪৮)

মনের বাঘেই মানুষ মারে বেশী ।
বনের বাঘ তো প্রতিবেশী নয়, সে যে বনবাসী ।।

হিংসায় ভরা মন যে গড়া, কেবল রেষারেষি,
রাত নাই দিন নাই জ্বালায় দিবানিশি ।
কইতে গেলে উচিত কথা, গলায় দেয়রে ফাঁসি ।।

ভগবানের বিচিত্র চরিত্র,
মানুষ গড়ে সে ভুল করেছে ভাবে দিবারাত ।
ধ্বংস করাও সম্ভব নয় এ যে, লীলা ক্ষেত্র ।
চক্রপাণি[১৮] ত্রিশূল ছেড়ে ধরেছে বাঁশী।।

১৮· বিষ্ণু ।

Dhaka University Institutional Repository

ভবাপাগলা মানুষ ভাল-বাসে,
কত মানুষ দেখলাম বটে, মানুষ কোন্ দেশে ?
মানুষ কোথা, খুঁজে বেড়াই, থেকে রঙ্গারসে ,
এক পলকেই বুঝিয়ে দেন, মা যে এলোকেশী ॥

(১৪৯)

(আমি) মনের মানুষ পেলাম কৈ ,
মন খুলে দু'টো কথা কই,
প্রাণের দু'টো কথা কই ।
আশার গাছে তুলে দিয়ে,
কেড়ে নেয় রে বাঁশের মই ॥

আমি যারে ভালবাসি,
সে আমায় বানায় দোষী ।
(হয়) মনে মনে কষাকষি,
থাকে না সে দু'দিন বৈ ॥

ভরসা করে ফরসা হলাম,
ছিলাম রাজা হলাম গোলাম ।
স্বর্গ হতে মর্ত্যে এলাম,
মানুষ কোথা পেলাম সই ॥

Dhaka University Institutional Repository

দেবতারাও বাঞ্ছা করে
মানুষ জনম নেবার তরে ;
(জপি) হরে কৃষ্ণ হরে হরে,
(খেলাম) চিনি পাতা চুনের দই ।।

ওরা-পাগলা মানুষ খোঁজে,
সদা থাকে চোখটি বুজে ।
মনের মানুষ মনেই আছে
আমার মা সে ব্রহ্মময়ী ।।[১]

(১৫০)

মরণ কারো কথা শুনে না
যখন-তখন, যেথায়-সেথায়, দিতে পারে সদাই হানা।

জাল পেতে ঐ মরণ ছলে,
মহামায়া নেয় যে কোলে ।
কথায় কথায় মানুষ বলে,
আমার বলতে কেউ রইলো না।।

বেঁচে আছ এই আশ্চর্য্য,
নাই ক' কার' ব্রহ্মচর্য্য,[২]
থাকতে যদি একটু ধৈর্য্য
ঐশ্বর্য্য আর গায়ে ধরতো না।।

১। গায়কঃ রুক্মিণী বিশ্বাস, নিজস্ব সংগ্রহ ।
২। বেদাদি শাস্ত্রানুশীলন এবং মৈথুন ও অন্যান্য ভোগবাসনাবর্জিত পবিত্র সংযম জীবন যাপন ।

Dhaka University Institutional Repository

মরবে বলে , মনে রেখো,
বেশী দিন বাঁচবে দেখো ।
কথার মত কথা শেখ,
মরণের দিন যাবে জানা ॥

নিজের হাতে বাঁচন্‌মরণ,
ভবাপাগলার সত্য বচন ।
তাঁরে বলে রাখলে শরণ
অকালে মরণ হত না ॥[১]

(১৫১)

মা, তুমি ধর বাঁশী আর (আর) কৃষ্ণ ধরুক অসি,
দেখবো আমি, কেমন লাগে,থেকে পাশাপাশি ।
এ যে মধুর তত্ত্ব,ভাবের তত্ত্ব(তাইতো) পরাণ ভরে হাসি ॥

যে যা ইচ্ছা বলুক,ভাল মন্দ দুন্দু সমান,
অভিন্ন এ ভাবের মূর্তি, ভক্ত যেমন সাজান।
কালীর অসি, কৃষ্ণের বাঁশী,ব্রজবাসী আর শ্মশানবাসী ॥

ভবার কথা রাখতেই হবে, শোন কৃষ্ণ-কালী ,
কালী গো, তোমায় জবা দেবো, কৃষ্ণ, তুলসী অঞ্জলি ।
দেখবে তখন , মদন মোহন, কালী হবে কালশশী ॥

১। গায়কঃ রুক্মিণী বিশ্বাস, নিজস্ব সংগ্রহ

Dhaka University Institutional Repository

(১৫২)

(তুমি) যাও যত পাপ করিও ভাই,
হবে না রে অনুতাপ ।
কেন নিজের কপাল নিজে খাবে ,
কুড়াবে সবার অভিশাপ ।।

সব কাজেরই মাত্রা রেখে,
দেখে যাও সব দু'টি চোখে ।
কইও না কিছু তোমার মুখে,
লুকিয়ে থাক চুপ চাপ ।।

মাথার উপর আছে একজন,
ভুলো না তাঁরে কখন ।
তিনি নিতু করবে ওজন,
শোন আমার বুড়ো বাপ ।।

লুকিয়ে কিছু করতে গেলে,
তিনি যে সব ধরে ফেলে,
চুপ করে রয় হৃদ কমলে,
নইলে কেন উঠে কাঁপ ।।

ঘোর কলিকাল, বলে বলে,
গেল যে সব রসাতলে ।
(তাই) ভবাপাগলা নয়ন জলে,
ভিজিয়ে দিল সিঁড়ির ধাপ ।।

Dhaka University Institutional Repository

(১৫৩)

রং করো না ঢং করো না
সং সেজো না সংসারে ।
কর তুমি সাধু সঙ্গ, উছলিবে প্রেম তরঙ্গ,
জল-তরঙ্গ শুনতে পাবে ঢেউ দোলন ঐ সরোবরে ॥

মৃদুল পবন বইবে ধীরে
প্রাণ জুড়াবে গানের সুরে ।
এ পারের প্রতিধ্বনি শুনতে পাবে ঐ পারে ॥

ভাসবে জলে নীল কমল
আঁখি হেরে হবে শীতল ।
কল্ কল্ কল্ স্রোতেরই জল,
(কইবে) হরে কৃষ্ণ হরে হরে ॥

ভবার হাসি মুখটি ভরা
মধুর মধুর গানের ছড়া ।
বসুন্ধরা পাগল পাড়া,
আত্মহারা কে করে রে ॥

(১৫৪)

রাত দুপুরে ডাকাত ঢুকলো বাড়িতে ।
ঘুম কি আর ভাঙ্গো ওরে ,
এ ঘোর কলির রাত্রিতে ॥

Dhaka University Institutional Repository

পেয়ে শ্রী গৌরাঙ্গের হরি-নাম
ভেবে ছিলাম করবো বিশ্রাম ।
বদ হজমের বদনাম
দেয় যন্ত্রণা ছয় রিপুতে ।।

পাড়া পড়শী, বিবেক যারা,
নয় দরজায় দেয় পাহারা।
অবোধ দস্যুর পেয়ে তাড়া,
পালালো কোন্ জগতে ।।

হোঁদলা[1] এক তোতলা বামুন,
বুদ্ধিনাশা, চঞ্চল মন ।
ভবা বল্লে, শোন, শোন্ শোন,
ধরলো পথ্য ভূতেতে ।।

(১৫৫)

সজনী গো, রজনী কেন হলো গো ভোর ?
লীলা কেলী খেলা খেলিতে ছিলাম,
সঙ্গে ছিল ননী চোর ।।

১। হোঁদলা / হোঁদল,
ভুঁড়িওয়ালা, পেটমোটা ।

Dhaka University Institutional Repository

ননী চোর নয় মন চুরি করি
বসিয়া কদম ডালে,
পাগল কৃষ্ণ বাঁশরীর সুরে,
ডাকে শুধু রাধা বলে।
আনে তা বোঝে না, শ্রীকৃষ্ণ ছলনা,
বিশ্ব-পিতা তিনি নহে শুধু একা মোর।।

নিশার চাঁদিমা[১] চন্দ্রমা[২] বশারি
ঢাকিয়া কৃষ্ণ বনে,
ভবার ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ রাধা
বসে আছে হৃদি পদ্মাসনে।
হৃদয় কমল যুগল কমল,
প্রেম সরোবরে তরঙ্গে বিভোর ।।

(১৫৬)

সবুরে মেওয়া ফলে কোন ফুলের সে ফল ।
ভেবে পাইনা কুল কিনারা, কোথা যাবো বল্ ।।

সইতে হবে আর কতকাল,
কালের স্রোতে ভাসি,
কূল পাইনা, কিনারা নাই শুকনো মুখের হাসি ।
দিবা নিশি ভাবি কেবল কবে হবো তল্ ।।
৮২
কত সহ্য আছে আর,
হার মেনেছে সে,
কোথা যাবো, কূল পাবো, রইবো না এ দেশে ।
ভবাকে সদা শূন্যাকাশে ডাকে মেঘের দল ।।

১। জ্যোৎস্না ২। চাঁদ ।

Dhaka University Institutional Repository

(১৫৭)

(ওরে ভাই) সত্য পথে হাঁটা হ'ল দায় ।
হিংসার কাঁটা রাস্তা ঘাটে, কাঁটা ফুটে পায় ॥

কারোর ভাল কেউ দেখতে নারে,
এতে পরান . আর বাঁচে নারে।
কত শত . অনাহারে..
কেউ পেটটা ভরে কত খায়॥

মিথ্যার কাজ. মিথ্যা আলাপ..
এ যেন সব. ভূতের . প্রলাপ।
কী রৌদ্রের তাপ. বাপরে বাপ..
হিংসার শিং মাথায় গজায় ॥

হাঁটবো না আর . বসবো ঘরে..
যেন ভিটায় ঘুঘু নাহি চরে।
সত্য পথটি ছাড়বো না রে,.
এতে প্রাণ , থাকে আর যায় ॥

সত্য পথটি পাওয়া ভার,
কু-আশায় . পথ অন্ধকার।
ভবা কয়. মন. ভব পার,
কবে উঠবো খেয়া নায় ॥

Dhaka University Institutional Repository

(১৫৮)

সংসারেতে থাকা নিষেধ, সাধু সন্ন্যাসীর।
সদা থাকে ধ্যানে মগ্ন, ভালবাসে না এমন অস্থির ।।

নিরজনে তাঁর স্মরণে, রাখে সদা মন,
নাইকো তাঁদের এমন বালাই.আবাহন আর বিসর্জন।
হৃদি - মন্দিরে তাঁদের প্রভু. চঞ্চল নহে অতি ধীর ।।

ভবার গতি কি হবে গো. ভেবেই ভবা সারা।
মহানন্দে দিন কাটে মোর. এইটি ভবার সেবা।
সংসারে সন্ন্যাসী ভবা. সর্বশ্রেষ্ঠ বীরা[১]।।

(১৫৯)

পাগলা সুর-কাহারবা

স্বভাব দোষে হইগো মোরা এমনি ভাবে লক্ষ্মী-ছাড়া।
সময় থাকতে বুঝি নাকো এই দোষেতে যাইগো মারা ।।

দিন থাকিতে শ্যামা ভুলে , মজলি না মন রইলি ভুলে ।
বাসনাময় পূতিগন্ধে[২] প্রাণ ঢেলে মন হইগো সারা ।।

জ্ঞান - অঙ্কুশে ফেরা না মন. যায় কেন মন বিষয় কানন ।
শ্যামার পায়ে ঢেলে দিয়ে. ভাঙ্গা প্রাণ করবে জোড়ে ।।

১। পতি-পুত্রবতী নারী. বীর্যবতী ।
২। দুর্গন্ধ ।

Dhaka University Institutional Repository

যাদের নিয়ে সদাই মগন, ফেলে দিলি তোর সর্ব্বস্ব ধন।
শেষের দিন সব পালাবে, বন্ধু-বান্ধব ভাই যারা ॥

আর কত দিন এই তো এলো, কাল কৃতান্তের রোষানল।
পুড়ে তোকে মারবে যখন, কেউ যাবে না সঙ্গে তারা ॥

অভাবে মহাপ্রভাব ভবার, রাখলি ঠিক মা কৃপা তোমার।
তুই থাকিলে কিসের অভাব, তুই যে মা আমার ভাবের তারা ॥

(১৬০)

হাতে পায়ে বেড়ি তোর পড়লো রে, (আর) খুলবি কেমন করে।
মুক্ত মানুষ জন্ম নিয়েই, ডুবে গেলি সংসারে ॥

সংসারেও ডুবে গেলে,
বহু বহু রত্ন মিলে।
পায়ের বেড়ি আপনি খোলে,
কারো কারো ভাগ্যের জোরে॥

ধ্রুব প্রহ্লাদ ছিল যেমন,
জন্ম নিয়েই করলো ভজন।
পরীক্ষা দিল কেমন,
অত্যাচারীর অত্যাচারে ॥

হাতে পায়ে বেড়ি পরা,
ভবাপাগলা পড়লো ধরা।
খুলে দে ভক্ত যাঁরা,
ডুবে যাই প্রেম সাগরে ॥

Dhaka University Institutional Repository

ভাটিয়ালী

(১৬১)

আমার কিছু হইল না রে, কেউ কং কইল না রে,
ঘরের কোনায় একা বইস্যা কান্দি ।
কাইন্দা আমি আন্ধা[১] হইলাম, চখে পরল ছানি[২] রে ।।

যখন আমার ছিল যৌবন ।
কত আমি দেখতাম স্বপন। রে --
(এখন আমি) সবার কাছে হইলাম দোষমন ,
(ই-দুঃখে) কি কইর‍্যা বুক বান্দি রে ।।

চলুম[৩] আমি কোন্ বা পথে,
বেথিত[৪] আমার কেউ নাই সাথে । রে --
হাটুম[৫] আমি যে দুই রথে[৬], (হইল) তাও পরের বাদি রে ।।

যত দেখলাম এ সংসারে,
কেউ না কারো গোমর ছাড়ে । রে --
একবারও না ডাকে তাঁরে,(কেবল) মন আটে ফান্দিরে।।

মনের সনে কইর‍্যা যুদ্ধ,
ভবাপাগলা হইল বুদ্ধ। রে--
পাহানে[৭] তার ফুটে পদ্ম (তখন) সবাই করে সন্দি রে ।।[৮]

১। কানা ২। ছানি ৩। চলব ৪। ব্যথিত ৫। হাটব
৬। দু'পায়ে ৭। পাষাণে
৮। মূল পান্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত ।

Dhaka University Institutional Repository

(১৬২)

[illegible] বিচ্ছেদ-ভাটিয়ালী

আমি কি ভুলায় যে পইরাছি নদী ভাঙা পারে ঘর[1] বাইন্ধা ।
(রইচে) এক সাপের উপরে ঘর,(ভয়ে) আমার পরান উঠে কাইন্দা
আমার পরান উঠে কাইন্দা ॥

ঝড় উঠেরে যখন তখন,
আইলো কাইল্যা বয়রে পবন । মন --
(আমি) কোন্ ভাবে বা সামলাই জীবন, যখন ঝাপটা আসে কাইন্দা,
যখন ঝাপটা আসে কাইন্দা ॥

নদীর জলের ঢেউ আইসা,
পারের মাটি যায় যে ধইসা । মন --
(আমি) লাগাই নাই মন কাচা কাইসা,(তবে) তারা উঠতো কাইন্দা,
(তবে) তারা উঠতো কাইন্দা ॥

নলখাগরের আলগা বেড়া,
কপাটের নাই খিলের জোড়া[2] । মন--
(রইচে) খুটী খুইল্যা নড়া-চড়া,(ঘরের)বাইরে বাইন্ধা,
ঘরের বাইরে বাইন্ধা ॥

নিজের কপাল নিজে খাইলাম,
ভাইনা-খুইনা ঘর বানাইলাম । রে--
ভবা কয় মন সব হারাইলাম,(তবে) কারে বা করি নিন্দা,
(তবে) কারে বা করি নিন্দা ॥[3]

১। মূলে 'ঘড়' রয়েছে, ২। মূলে 'জোরা' রয়েছে,
৩। মূল পাণ্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত ।

Dhaka University Institutional Repository

(১৬৩)

উলটো নদীর উলটো ধারে, পড়ে গেল নাও ।
খুব হুঁশিয়ার, ও মাঝি ভাই, ঠিক ভাবেতে বাও ।।

পিছন থেকে ঝড় এলো,
দেখতে পাও কি ভীষণ কালো ।
একটু ভাই সমঝে[১] চলো,
থাম খেয়ালী থামাও ।।

তরঙ্গেরই ওলট পালট,
বোঝ না তো কতখানি চোট ।
কিনারায় লাগলে হোঁচট,
কাঁদবে হাউ-মাউ ।।

ভবা পাগলা খুব হুঁশিয়ার,
যেতে হবে নদীর ওপার ।
খরস্রোতা নদীর ধার,
মনে মনে বুঝে নাও ।।[২]

১। বুঝে বা সতর্ক হওয়া ।(হিন্দি - সমঝ)
২। দ্রষ্টব্যঃ- নামের ফেরিওয়ালা ভবাপাগলা, পৃ. ২৩০,

Dhaka University Institutional Repository

(১৬৪)

ঐ শুন পুরুষ পুরুষ দেওয়ায় ডাক দিতে ।
(তর) থাকবার হুকুম নাই তার যাওয়ার তলপ আইসা গেছে ।
হাবিস, বাও বাতাসে নাও যায় মারা,(তর) সে খবরানি জানা আছে ॥

আগোর[1] দাড়ি গেছে ছিঁড়া,
(মস্তুল) ঘুনে খাইয়া করছে সারা । রে--
(গেছে) বাদাম[2] তা আগুনে পুইরা,(আবার) ভাঙ্গা নায়ে জল চুয়াইছে ॥

(হইছে) গলই দুইডা নরবরা,[3]
(দিচে[4]) মাথা কাটে যাইন ছাইরা । রে--
(যাইবার নইচে) পাতাম খুইল্যা পইরা পইরা, ই-দুঃখু আর কমু কার কাছে ॥

মাকলা[6] বাঁশের চাক বানাইয়া,
(দিছিলাম) হুগা[7] দিয়া ছইয়া ছাইয়া । রে--
(তো) হুগা[8] করছে উয়ে[9] খাইয়া,(কেবল) মাঝে মাঝে রইয়া গেছে ॥

ভরসা আছে গুরা বাঁকা,
হেয়তে[10] জল হেচি[11] একা । রে--
ভবাপাগলার হইল ভাবা, ঢেউ আইল রে পিছে পিছে ॥[12]

১। পালি তোলার রাশ, ২। পাল অর্থে, ৩। নড়ে চড়ে, আলগা অর্থে।
৪। দিয়েছে, ৫। যাচ্ছে বা যেতেছে, ৬। বাঁশের শ্রেণী বিশেষ ৭। ছই দেবার উপকরণ, ৮। ছিদ্র বিশেষ, ৯। উঁইপোকা ১০। সেউত্ব, জল সেচার পাত্র বিশেষ, ১১। সেচা অর্থে
১২। মূল পান্ডুলিপি থেকে গৃহীত ।

Dhaka University Institutional Repository

(৬৩)

ওরে ভাই বর্ষা আইল ডেঙ্গা[1] চিনচনি[2] ।
জোয়ারের রাগ বেজায় বেশী (এবারনাকি) ঘরের ভিতর যাইব[3] পানি।।

দড়ি কাছির রাইখ জোগার,
(জাইন)[4] জল বাতাসের ঘর দুয়ার। ভাই --
ইদিক-উদিক[5] হইলে দোহার, (কোন) সবুর নাই তা বুঝছনি।।

(ভাই) কামলা[6] খাটাও কয়ডা ভাও[7],
কি বাঁশ দিয়া ছইয়া[8] ছাও । ভাই -
কোন্ দাওয়েতে[9] ব্যাত[10] তোলাও[11], (আবার) ব্যাত, তোলাইবার জু[12] জাননি।।

বাঁশের বুকা পিঠা[13] ঠিক রাইখ্যা,
ছইয়া ছাইও দেইখ্যা, দেইখ্যা । ভাই --
তুমি হইয়া থাইক চাইর[14] চইখ্যা, তুইল না তাই মূল গাঁথনি।।

বাদাম্ টানবার না পাই কণা,[15]
বাইরে আমার নায় গেরাপী । ভাই --
তবা কয় মুই মহাপাপী, (হইবনি) মালিকের মেহেরবানী।।[16]

১। ডিঙ্গি ২। চিনেছ কি? ৩। মুখে আইব রয়েছে ৪। জানিও ৫। এদিক ওদিক,
৬। দিন মজুর ৭। ধরে, ৮। চালা, ৯। দা-দিয়ে, ১০। বেত
১১। তৈরী করা ১২। জোড়া দেবার পদ্ধতি, ১৩। বুক পিঠ, ১৪। চার
১৫। পাল তোলার রশি, ১৬। মূল পান্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত ।

Dhaka University Institutional Repository

(১৬৬)

কালা মেঘে আকাশ গেল ছাইয়া,
মুড়ে নাও ধরবো পাড়ছাইয়া। রেঃ
তুমি ভয় পাও ক্যানে, ওরে মাঝি,
তুমি কেমন ধারা নাইয়া ॥

এই নদীতে কত জনা,
তুফান দেইখা ভয় করেনা ।রেঃ
এত তুমি হাইনা হইনা,
তোমার মুখ গেল শুকাইয়া । রেঃ

তারা পাড়ি দিল যে কৌশলে,
তুমি নাও চালাইও সেই কাইলে[১]।রেঃ
কভু যাইও না ভাই, ছইয়ের তলে,
থাইকো, গলইর দিকে চাইয়া । রেঃ

গলই থান ছুইয়া দিও,
পাঁচ-পীরের নাম লইয়া ।রেঃ
সদা কইবো, হিও, হিও,
সাহস বুকে লইয়া । রেঃ

কইছে ভাইকা ভবাপাগলা,
কইবো না ভাই, নাও পাথাইলা[২]।রেঃ
নাও- বাইচা বাইচা যাইবো চইলা,
ঢেউয়ের মাথা খাইয়া ॥ রেঃ[৩]

১। একত্রীকরণ , অনুরূপভাবে ।
২। আড়াআড়িভাবে ।
৩। সুত্রঃ নামের কেরিওয়ালা ভবাপাগলা, পৃ. ২০৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

(১৬৭)

ঢুকে ঢুকে জল উঠে নায়, (যেমন) জলের পক্ষী পান-কৌড়ি।
ডুইব্যা ডুইব্যা পানি যায়।।

(ঠিক) আমার দশা তেমন হইল,
পাড় দিতে হাল ভাঙ্গিল।
নদীর ঢেউ নায়ে উঠলো,
এখন কি করি উপায়।।

স্রোতের মাঝে পাইড়্যা রে নাও,
নাও বলে রে, আমায় বাঁচাও
নাওয়ের কান্দন দেইখ্যা, কোথায় পলাও,
এই অকূল দরিয়ায়।।

ঢেউয়ের মাঝে উথাল পাতাল
(এখন) কই পলাইবা চান্দু[1] গোপাল।
ভাঙলো এবার ভবার কপাল,
জলে গিললা খায়।।[2]

(১৬৮)

তরী খানি লাগাও কিনারায়,
এ পারে মনটি যে মোর থাকিতে না চায়।
যারা সঙ্গী ছিল, গেছে ওপারে -
তারা ডাকিছে আমায়।।

১। চন্দ্রের বিকৃত কথ্যরূপ।
২। দ্রষ্টব্য: নামের ফেরিওয়ালা ভবাপাগলা, পৃ. ২০৫

Dhaka University Institutional Repository

কতই না খেলনা দিয়ে, খেলেছি সংসারে,
ভেঙেচুরে চুরমার সর্বহারা যে-রে ।
এসো নাবিক মন, এসো এবারে,
তুমি তো দীনবন্ধু সাধুভবা সোনায় ॥

কত বেলা ডুবে গেল কত সন্ধ্যা এলো,
ভাল লাগে না ঠাকুর পারে নিয়ে চলো ।
তোমার আঁধার হৃদয়, করিতে আলো,
জ্যোতির্ময় মূর্তিমান, এসো ভাঙা নায় ॥[1]

(১৬৯)

(আমি) তাকাইয়া রইলাম পথের পানে রে, চাহিয়া রইলাম উদাস প্রাণে ।
আমার পরান জানি কেমন করে, (তাঁহার) বাঁশি শুইনা কানে রে,
(তাঁর) হাসি দেইখা বদনে ॥

(তাঁর) বাঁকা আঁখি, বাঁকা নূপুর,
(বাজে) রাঙা পায় রুনু-ঝুনুরা রে -
(সে) বাঁকা নিঠুর বড়ই চতুর, (সে) কি মোহিনী জানে রে,
(তাঁর) কি চাহনি নয়নে ॥

১। তুলনীয়: বাংলার কবিওয়ালা: ভবাপাগলা, পৃ. ২৩২

Dhaka University Institutional Repository

বাঁশের বাঁশি কেন বাজাইল,
প্রাণটা মোর কাড়িয়া নিল । রে-
(আমার) জাতিকুল আর না রাখিল,(তাঁহার) মধুর গানে রে,
(তা) বুঝব কি আর আনে রে ॥

(আমার) নাম ধইরা বাজাইয়া বাঁশী,
(করল) ঘর ছাড়াইয়া বনবাসী । রে-
(আমার) পোহাইয়া যায় সুখের নিশি, (কালিয়া) রইল কোন বনে রে,,
(নিশি) গেল বৃথা জাগরণে ॥

চাইয়া রইল ভবাপাগলা,
(দেখি) এই পথে কি আসে কালা। রে -
পাইলে তাঁরে আমি একেলা (কমু) মনের কথা গোপনে , রে ,
(আমায়) নিবেদন চরণে রে ॥[১]

(১৭০)

দিনের আলো নিভে এলো,
ও মাঝি ভাই বেয়ে চলো।
ধীরে ধীরে অতি ধীরে
এখন ওরে চলো বল ॥

১। মূল পাণ্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত ।

Dhaka University Institutional Repository

পারবে না পার, সন্ধ্যা হলে,
ঢেউয়ের মাঝে, নৌকা এলে।
কাল তুফানের ভীষণ জলে,
কত জনা সব খোয়ালো ॥

এই তো সময় এই বেলাতে,
পাড়ি জমাও, ঐ পারেতে।
সময় গেলে সময় দিতে,
কে দিবে মন, তুমিই বল ॥

মেঘ জমালো ছুটিল বাতাস,
ঝড় পাছে এই আকাশে,
বিশ্বাস কিরে এখন নিঃশ্বাস
ভবা তাই ভেবে ম'ল[1] ॥[2]

(১৭১)

নদীর জল ধীরে ধীরে বহে।
ঢেউ কি উঠে আপনি রে মন, যদি কেউ না কিছু কহে ॥

উল্টা দিকের বাতাস যদি বয়,
চলতি পথে, বাধা পড়লেই নদী তখন কয় -
আমার স্রোত থামাবার কে রে তুই, ফণা তুলে রয়।
সরল মানুষও এমনই বটে, প্রতিরোধ তার নহে ॥

১। মরল ২। দ্রষ্টব্যঃ নামের ফেরিওয়ালা ভবাপাগলা, পৃ. ২৩১

Dhaka University Institutional Repository

সত্য যুগের মানুষ যাঁরা , তাহারাও নয় কম,
গদা যুদ্ধ , অগ্নিবাণ দক্ষ হাতে যম ।
দেবতারাও সইতো না রে যতক্ষণ কইতো দম,
মিথ্যার শাস্তি দিতে তাঁরা, প্রস্তুত সদা রহে ॥

কত প্রলয় , কত ঝড় , অবিরত চলে,
কি করে আর বাঁচাতে পারি, ভবাপাগলা বলে ।
কইবার ভাষা ফুরিয়ে গেছে, স্বর্গ রসাতলে,
গোক্ষুরা সাপের চাইতেও বিষ , কেমনে ভবা সহে ॥

ফোঁস-ফোঁসানি , এই টুকুই সার, ছোবল নাহি মারি,
ভবার রাগ, জলের দাগ, হুমড়ি খেয়ে পড়ি ।
মাতৃ স্নেহের গড়া অন্তর, ভবা নাহি কিছু করি,
মহা শক্তির অমূল্য দান, পবিত্র মায়া মোহে ॥১

(১৭২)

রাগ-খেমটা

নাও বাইও, নাও বাইও মাঝি , নদীর আইলো বান ।
সাবধান মাঝি, হও সাবধান, বৈঠা শক্ত মার টান ॥

মাঝি ভাই, বদর কইয়া . ধইরো পাড়ি,
কইবো না আর, দুড়-দুড়ি রে ।
ভাইবো না , যাহাই মুশকিল , তাহাই আসান ।

১। দ্রষ্টব্যঃ- রসের ফেরিওয়ালা ভবাপাগলা, পৃ. ২২৬

Dhaka University Institutional Repository

ঢেউয়ের চালে , যদি যাইন্যা যায়
তখন নাই রে উপায়, কেবল করবা রে হায়-হায় ।
ডুবাইবো না ভাঙ্গা নৌকায়, (তখন) হইব লীলা অবসান ॥

চাচরা[1] ধারে যদি পড়ে নাও,
নাও বাঁচাইবার লাইগ্যা তোমার, গাইড়া[2] পড়বো পাও,
তোমার উইলটা যাইবো নাও।
(মাঝি ভাই) ঠিক ভাবেতে নাও বাইয়া যাও,
উড়াইয়া প্রেমের নিশান ॥

নাও বাইবার, পারলো না-রে-ভবা,
তার হারাইছে রে তবা, সে হইয়া গেছে হাবা।
(ভাবি, আমার মাঝি ভাই) নাও বাইয়া না দিলো কে বা,
তার পাই না-রে সন্ধান ॥[3]

(১৫৩)

(ওরে মন) পদ্মা নদীর পারে মোর বাসা ।
যমুনাতে স্নান করি মুই , কৃষ্ণ পাবার আশা ॥

মেঘনা নদী নটী আমার, বিশাল বিশাল ঢেউ,
কৃষ্ণ লাগি কাঁদে পরান, বোঝে না যে কেউ,
(ও সই) বোঝে না যে কেউ ।

অগো কৃষ্ণ সাগর হল কপিল মুনির দশা ॥

১। ছুঁচিৎ , এখানে ঘূর্ণায়মান নীচু পাড় নির্দেশ করা হয়েছে।
২। গেড়ে বা গেড়ো অর্থে   ৩। গায়ক চুনীলাল ঘোষ, নিজস্ব সংগ্রহ ।

Dhaka University Institutional Repository

জটিলা কুটিলা জট পাকালো, আয়ান করে তাড়া,
মনোপুরা থৈ থৈ মোর, বংশাই নদীর ধারা
(ও সই) বংশাই নদীর ধারা,
হাড় কাটা গলির মাঝে করলো বারুদ ঠাসা ॥

ব্রহ্মপুত্র নহি আমি, ব্রহ্মময়ীর ছেলে,
কৃষ্ণ তারে পাবার লাগি, থাকি চরণ তলে,
(মায়ের) থাকি চরণ তলে ।
ভবাপাগলার সাধন ধন্য রাধাপ্রেমে ভাসা ॥[1]

(১৭৪)

বাঁশের মাচা বান্ধ সকালে, ঐ লাই-জাঙ্গালার[2] তলে রে ।
(উঠছে) ফনফনিয়ে কচিডুগা (দেখ) কত লাই বা ঝুলেরে ॥

লাইয়ের ভারে ডুগা নুইল্যা,
গুঁড়া কেদায়[3] গেল গইল্যা । রে--
পাতা নুইল্যা, উঠছে ফুইল্যা, (কেবল) বাতাসে একটু দুলেরে ॥

ঝইরা বাতাস যদি[4] ছাড়ে,
(তখন) পাতা থাকবো কাহার জোরে । রে --
(আবার) বেড়া দেও নাই চারিধারে, (লাই গাছ) খাইব যে ছাগলেরে ॥

১। দ্রষ্টব্যঃ- নামের ফেরিওয়ালা ভবাপাগলা, পৃ. ২৩১,
২। লাউয়ের মাচা ৩। কাদা, কদমাক্ত। ৪। মূলে 'যদী' রয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

মাটীর পাইলা কালী মাইখ্যা,
(বাই) গায়ের উপর দেও না রাইখ্যা। মন --
(ভয়ে) সুদমন যাইব [১] তাহাই দেইখ্যা, ভাইসা [২] নয়ন জলে রে।।

নাই তো দেখি হুমরা-চুমরা,
ঘরে তো নাই, নাই-রে ভুমরা [৩]। রে--
তা হইলে তাই দফা সারা, কইছে তবাপাগলে।। [৪]

(১৭৫)

মন মাঝি দুর্বল, তাতে নৌকা হয় রে তল।
জনম ভইর‍্যা বাইলাম নৌকা না ফালাইলাম জল।।

দাঁড়ার গুণ নড়াচড়া, তাজাল গুইর‍্যা তওপর জোড়া।
কেমনে তুই পারি দিবি বল।।

অকূলে তরী পইর‍্যাছে, বায়ুকোণে মেঘ উইঠ্যাছে।
উথলিছে পাড় কাটালের জল।।

ধনরত্ন বোঝাই দিয়া, বাইচ খেলাইলাম কাম-সাগর দিয়া।
(তাতে) হারাইলাম মালিকের নদুল।। [৫]

(--অসমাপ্ত--)

১। মূলে 'আইব' রয়েছে, ২। ভেসে যাওয়া অর্থে, ৩। এক প্রকার কীট-পতঙ্গ
৪। মূল পাণ্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত,
৫। গায়ক: জাহ্নবী দাস, নিজস্ব সংগ্রহ।

Dhaka University Institutional Repository

(১৭৬)

মাঝি নাও তো ছাইড়া দিলা, হাইল[১] তারে কি বান্‌ছ[২] কইসা,
না রইছে[৩] তোমার ঢিলা।
বেশী দিশা দ্বারা নাই কইল তোমার,(মনে পরে মাঝি),
কতবার না নাও ডুবাইলা ।।

(মাঝি) তোমার মাল্লা গুইলা বেজায় পাজি,
(তোমার) কোন কথাই হয় না রাজি । রে--
মন মতলবি সব মাঝি,(তারা নাও চালায় না),
কারো সাথে মিলা।।

(বৈঠা) যার যার দিকে টান মারে,
(নাওডা) চাকের মত সদাই ঘুরে । মাঝি --
কেমনে তুমি যাইবা পারে, (হারে মাঝি) ইয়া গো,
কেন নায় চড়াইলা ।।

কত ছিল ভাল মাল্লা,
তাদের সঙ্গে কে দেয় পাল্লা । মন--
(এ দুনিয়ায়) তারাই মারে সকল কেল্লা,(মাঝি) তাদের কি,
একদিন খোঁজ করছিলা।।

ব্যাংকুস লইয়া মারলাম নৌকা,
সোজা না মিক নেইক না বেকা ।[৪] মন--
(যদি) হাইল ছইরা দেয় একটা ধাকা, মায়েরে ডাইকা ভবাপাগলা ।।[৫]

১। 'হাল' অর্থে । ২। বেঁধেছ, ৩। 'রয়েছে' অর্থে,
৪। মানিকগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষা, অর্থঃযেদিকে ঘুরাও সেদিকে যাও ।
৫। মূল পান্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত ।

Dhaka University Institutional Repository

(১৫৭)

মাঝি বাও না তোমার নাও ।
এমন সুন্দর বৈঠা পাইয়া,
কেন বইসা দিন কাটাও ॥

বিবেক কাঠের বৈঠা নিয়া,
যাও না মাঝি, ত্বরায় বাইয়া । রে--
সুখে তুমি সারি গাইয়া, পাড়িটি জমাও ॥

কুম্ভীর আছে এই নদীতে,
পইড়ো না ভাই বাইতে বাইতে । রেঃ
কত জনা ওপার যাইতে, নিঃশেষে রে যাও ॥

এই বাতাসের করে করে,
বৈঠা মার জোরে জোরে । রেঃ
দুখের বাতাস উঠলে পরে, হারাইবা এ দাও ॥

ভবাপাগলার ভাঙা তরী,
গাইনি[১] দিবার না পাই দড়ি । রেঃ
জল চুইমা[২] যায় গুড়াতেরি[৩], কেমনে সেঁচে যাও ॥[৪]

১। গাইনী=নৌকার তলদেশের ছিদ্র বন্ধ করার জন্য আঞ্চলিক শব্দ।
২। চুইমা/চুষিয়া
৩। গুড়াতেরি=নৌকার পার্শ্বদেশে উপবেশনের (তক্তা) কাষ্ঠবিশেষ(দেশীশব্দ)।
৪। দ্রষ্টব্যঃ- বাদের কোরিওয়ালা ভবাপাগলা, পৃ. ২৩৮,

(১৭৮)

ভাটিয়ালী - কাহারবা

(ওগো) শুনহ নায়ের মাঝি, (কাল) মেঘ এলো যে সাজি,
অবেলাতে এই নদীতে কেন ধরলে পাড়ি ।
(মাঝি তোমার) একূল ওকূল দু'কূল গেল তুফান উঠলো ভারি ॥

একে তোমার ভাঙা নৌকা,
তাতে তুমি একা একা ।
মুরছে[1] নদীর ঢেউয়ের চাকা, ডুবাতে ঐ তরী ॥

কাল মেঘে ঢাকলো[2] গগন,
মহা বেগে ছুটলো পবন
শুকাইল তারা বদন, আতঙ্কে শিহরী ॥

ব্যোম্ পথে ঐ থাকি থাকি,
(কাল) মেঘ কাইছে ডাকি ডাকি।
এত সাহস দিলে কাকে, ভাঙা নায়ে চড়ি ॥

নদীতে নাও বাইতে হলে,
নাও ছাড়িও সাঝ সকালে ।
ভবাপাগলা ডেকে বলে গহীন জলে পড়ি॥[3]

১। মোচড় দেওয়া অর্থে ।
২। মূলে 'ডাকলো' রয়েছে ।
৩। মূল পাণ্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত

Dhaka University Institutional Repository

(১৭৯)

শেওলা ভরা নদীর মাঝে, সাঁতার দিলি কি কারণ।
স্রোতও নাই, জীবনও নাই, মিছে রে তোর জল-ভ্রমণ ॥

এখনও খাল উঠ্ কিনারায়, কত সাধু ডুবে যায়,
সন্ধ্যা হলে নাইরে উপায়, অন্ধ হবে দু'নয়ন।
অন্ধকারে,(ওরে) পাবি কারে, হারাবি রে মন-রতন ॥

বদ্ধ নদীর নাইরে স্রোত, মরা গাঙ্গে, পঞ্চভূত,[1]
কার তোরে অনুরোধ, কি কারণে, অকারণ।
ভবা কয়, মন, মন-নদীতে, সাঁতারে হয় উপার্জন ॥[2]

(১৮০)

(ত্রি;) সম্মুখে কালো মেঘ করে খেলা,
তরণী বেয়ে চল, নাহি বেলা।
ডুবে যায়, ডুবে যায়, দেখিতে হায়, দেখিতে হায়,
তোমারই এ ভানু সূর্য্য করিয়া হেলা ॥

সুন্দর দিনগুলি, কোথায় গেলো,
তেমন দিনটি আর ফিরে না এলো।
যাত্রা কালে একবার কালী বল,
মিটবে, মিটিবে তোমার ভবেরি জ্বালা ॥

১। পঞ্চভূত=ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম।
২। গুলটিবাং-বাদের কেরিওয়ালা ভবাপাগলা, পৃ. ২২৫,

Dhaka University Institutional Repository

এতদিন ছিলে তুমি মায়েরই কোলে,
খেলিয়াছ কত খেলা তাহারই তুলে।
কত আয়োজন, যাহা নিষ্প্রয়োজন,
ভবাপাগলা তাই কহে রে ভোলা ॥[১]

(১৮১)

সাবধানে চালাও ভাঙ্গা নাও।
কোন্ সাহসে অসময়ে পাড়ি দিবার চাও ॥

সূর্য্যডারে ঢাকলো মেঘে,
বাওডা কিছু কিছু জাগে।
বাতাস আবার আইল রাগে, (আর) কিসের লাইগা যাও॥

ঢেউ উইঠাছে চালি বাইন্যা,
জাহাজ যাইব[২] কাইন্দা কাইন্দা।
সময় থাকতে ধর পাড়িন্যা, সন্ধ্যার আগে পারে ভিড়াও ॥

কোন সাহসে দিলা ছাইড়া,
নাও যে যাইব ভাইঙ্গা-চুইরা[৩]।
ঢেউ উঠছে রে নদী জুইড়া, নাওডারে বা কোনসুম[৪] ডুবাও॥

ভাঙ্গা নাও ঢেউয়ে নাচায়,
ভবাপাগলা নাহি ডরায়।
কভু নিয়া চরায় ঠেকায়, জোর কইরা তার ধরছি পাও ॥[৫]

১: দ্রষ্টব্য:- বাদের কেরিওয়ালা ভবাপাগলা, পৃ. ২২৯
২। মূলে 'যাহানি চাইব' রয়েছে, ৩। 'ভেঙ্গেচুরে' অর্থে,
৪। 'কেমন' অর্থে (মানিকগঞ্জ অঞ্চলের প্রচলিত শব্দ)
৫। মূল পাণ্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

(১৮২)

(আগে) সাঁতার শিখরে জলে, তবে নাইতে নামিস জলে ।
ভাসতে পারবি ডুবতে পারবি, কেউ খাবে না গিলে ।।

ভাল মানুষ, হয়রে বেকুব, মানুষ খায় রে চিলে,[1]
তাঁহারই হয় সৎ-গুরু, এমন নাইরে ভূ-মণ্ডলে।
মুক্ত দ্বার তোর হৃৎ-কমলে, দেহের কয়েদ মিলে,
(সে-যে) শুদ্ধচৈতন্য, বিচারশূন্য নির্বিকার রয় নাভিমূলে ।।

এই ঘাঁটি পারিপাট, গঙ্গা মায়ের চরণ তলে,
জ্ঞান বুঝাবি, মন আলেখী, বাঁধের দুটি নলে,
ঘরের বুনছে রে জাল, বহুৎ হাজার কলে।
হয় পা' হল নাবালিকা সুতোর বাঁধন খুলে ।
তয় ফিরে মন ভবাপাগলা থাকবে শূন্যে ঝুলে ।[2]

(১৮৩)

সোনার মায়ে , সোনার মানুষ, সোনার গানটী গায় ।
সোনার জলে, সোনার নদী, সাগর পানে ধায় ।।

সোনার মানুষ বুঝবে কথা,
আপন মনে চলছে কোথা ।
কইব কিছু মনের ব্যথা,[3] বুঝবে তোমার নায় ।।

১। উচ্চ ও তীক্ষ্ণ রব-কারী হিংস্র ও মাংসাশী পাখি বিশেষ,
২। দ্রষ্টব্যঃ- নামেঃ ফেরিওয়ালা ভবাপাগলা, পৃ. ২২৫,
৩। মূলে 'বাথা' রয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

যা, দেখি তাই আমায় ফেলে,
ফিরাবো মোর নয়ন জলে ।
সংসারী সব ঐ চরণে, রেখো রাঙা পায় ।।

সোনার মত প্রাণটী পেলে,
অমনি তারে নায়ে তুলে।
কোলে করে কেবল বলে, যেয়'না কোথায় ।।

আমায় যদী ফেলে যাবে,
(বল) এমন দুঃখী কোথা পাবে ।
(তবে) খেয়াল নামটী ডুবে যাবে, কে যাবে হে তোমার খেয়ায়।।

সবই তোমার সোনা দেখি,
ঝলসে যায় মোর দু'টি আঁখি ।
তোমায় কোথা লুকিয়ে রাখি, ভবা কয় তোমায় ।।[১]

১। মূল পান্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত ।

Dhaka University Institutional Repository

পল্লীগীতি

(১৮৪)

কালা নাম আর মুখে আইনো না,
(ওরে কৃষ্ণ নাম আর মুখে কইও না)

সর্বনাশা বাঁশের বাঁশী, পাগল কৈন[১] ব্রজবাসী ।
সে যে গৃহীও নয়, নয় সন্ন্যাসী, বুঝি না তাঁর সীমানা।।

জল আনতে ঘাটে গেলে,
অমনি ওঠে কদম ডালে ।
(ও সে) বাঁশী বাজায় হেলে দুলে, উজান চলে যমুনা ।।

কখনো যায় গোচারণে, রাখাল সাইজ্যা[২] রাখাল সনে ।
সে যে বৃন্দাবনের কুঞ্জবনে, ব্যবসা খুলছে মন্দ না ।।

ছোট বেলার কথা বলি,
ওই যে ছোড়া বনমালী,
হইল আয়ান ভয়ে কৃষ্ণ-কালী, রাধারাণীর মন্ত্রণা ।।

ভবাপাগলার জপমালা,
উপর কালী ভিতর কালা,
(আর) কী যে আমার ভীষণ জ্বালা, মুখে প্রকাশ করতে পারি না।।[৩]

১। কৈল < করিল, ২। সাজিয়া > সাইজ্যা,
৩। সংগীত.- নামের ফেরিওয়ালা সংকলনা, পৃ. ২৪০

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ভাবধারার গান

(১৮৫)

এখন তুই নমাজ পড়, এখন খোলা আছে মসজিদ ঘর ।
কোন্ সময়ে বন্ধ হইব, সময় থাকতে ঢুইক্যা পড় ।
তাড়াতাড়ি গোছল কর ॥

(ফজর) শীত উঠলে তুই নমাজ পইড়্যা,
দিলি যে রে নমাজ ছাইড়া ।
বাকী উক্ত রইল পইড়্যা ভুলডা করলি তুই যে জবর ॥

(জহর) এক নমাজ আর দিগুণ নমাজ,
কোনডার না করলি গমাজ ।
করলি কত ধান্দা-ফন্দি, আসল কাজের নাইরে খবর ॥

(আছর) বিশ্বাসে ধইরা বলরে আল্লা,
নমাজের তর বারবো জেল্লা ।
তুই দুনিয়ার মারবি কেল্লা, দোয়া করবো সেই পয়গম্বর ॥

(মোগরব) মক্কা যাইয়া কেবা পানি,
পানি কলস ধর তা তো জানি ।
এ দুনিয়ার আদম যিনি, পয়দা করে সব পানির ভিতর ॥

Dhaka University Institutional Repository

(এবা) শুন্ বলি ভাই, ও মুসলমান,
পড়গা যাইয়া কেতাব কোরাণ,
ভবাপাগলার এমন জবান, জান গেলেই না দিব কবর ।।[১]

(১৮৬)

খোদার কদমে দেখেছি দুনিয়া, খোদার বাদটা লও ।
এ হেন সুপন ভাঙিলে যখন, খোদার কথাটা কও ।।

সৃষ্টির আদি খোদার জমি,
দুনিয়ার মত তুমি আর আমি ।
হিন্দু মুসলমান সবারই প্রাণ - যতটুকু পার সও[৩] ।।

ভবা পাগলা কয় কোথা আছে খোদা,
সাদা প্রাণে সবার লেগেছে যে কাদা ।
তব প্রেমজল,
দিয়ে অবিরল
তুমিই শতত[৪] রও।।[৫]

১। মূল পান্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত,
২। মূলে 'আদী' ব্যবহার করা হয়েছে ।
৩। সহ্য করা অর্থে ।
৪। মূলে 'সতত' রয়েছে ।
৫। মূল পান্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত, নিজস্ব সংগ্রহ ।

Dhaka University Institutional Repository

(১৮৭)

(ও তুই) মক্কা যাইবার করলি না রে নাম।
(তোর) দেহের মধ্যে আছে মক্কা, করনারে তারে হাজার সালাম ।।

নব মদিনা চরণ দাড়ি,
হাজম করলি দুনিয়া ঘুরি।
কয় উঠ তুই নামাজ পড়ি,
রোজার ধরে দিলি বিরাম ।।

দিনু করছি সিরিসুরে,
ফিরিসুরে ইবুর ধরে।
কুরবানী কর শয়তানে রে -
তা না কইর‍্যা করলি হারাম ।।

কসম কইর‍্যা খোদার কাছে,
(তাই) রোসনাই দেখলি দুনিয়া মাঝে।
(এখন) বেগম পাইয়া আসমান নাচে,
(তাই) ভুইলা গেলি আসল মোকাম ।।

ভবাপাগলা সাজল মোল্লা,
আলি কালী বিস্‌মিল্লা,
সঙ্গের সাথী ছেঁড়া-ঝোল্লা,
গোরস্থানই হক্‌ পরিণাম ।।[১]

১। গায়কঃ চুনীলাল ঘোষ, নিজস্ব সংগ্রহ।

Dhaka University Institutional Repository

(৬৮)

(মন) মসজিদ ঘরে বইসা রে তুই ফাঁকি দিয়া গেলি ।
কত ওনার ওয়াক্‌ নমাজ নিজে নমাজ না পড়লি ॥

লিখলি কত ভালমন্দ,
নিজে কিন্তু রইলি অন্ধ ।
কবে, জান্‌ তোর হইব বন্ধ, মসজিদ ঘরের কপাটগুলি ॥

এক কানা আর অন্য কানায়,
কেমন কইরা পথ রে দেখায় ।
নিজেই গেলি কোন্‌ বা গোল্লায়, আল্লার দোষটি দিবি খালি ॥

কতগুলি মিস্ত্রী খাইটা,
মসজিদ ঘর তোর তুলছে আইটা ।
তুই এমন রে নিম্‌-নমুইটা, মসজিদ ঘর তুই নষ্ট করলি ॥

তবাপাগলা কয়ে সেলাম,
হরদম যে কয় আল্লারই নাম ।
আর যে সব ছুঁই সেলাম, সেলাম, বর্তরফা ফুলের ঝুলি ॥[১]

১। মূল পাণ্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত ।

Dhaka University Institutional Repository

(১৮২)

শুন ভাই মুসলমান, আহমকে-নি খোঁজলা কোনদিন ।
যেদিন তুমি পয়দা হইলা কোথায় ছিল শালাউদ্দিন ।।

কাওয়াৎ খেলে মসিনউল্লা,
জিয়াৎ-মিন্দা হইত মিল্লা ।
আসমান-জমিন তফাৎ দিল্লা চিহ্নিম করলা মক্কা-মদিন ।।

আণ্ডিয়র মধ্যে আসমান নড়ে,[১]
এই মুল্লুকে কত যে রে ।
খোদারে কি নেহার করে, হরদম হারাম চৌ'পুর দিন ।।

হযরতের[২] কিবা রহম,
হইল না ভাই হাজির করম ।
তবুও একটু হয় না সরম, কি কইবা ভাই নিকাশের দিন ।।

ভবাপাগলা খোঁজ করে,
বইসা এই খোদার ঘরে[৩]।
খোদা যাহা হুকুম করে, তামিল করি পেয়দা মিচকিন ।।[৪]

১। মূলে 'নরে' রয়েছে ।
২। মূলে 'হজরত' রয়েছে ।
৩। মূলে 'ঘড়ে' রয়েছে ।
৪। মূল পান্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত ।

Dhaka University Institutional Repository

বিবিধ গান

(১১৩)

(শুন) আমার বাংলাদেশের কথা ।

(এমন) খোলা মাঠ, খোলা প্রাণ, অন্য নাই আর কোথা ।।

১. নাই কো কোন হিংসাগন্ধ ,

স্নেহ-ময় মধুর সম্বন্ধ[১]।

নাই কো অলস বৃথা দ্বন্দ্ব[২], (সবাই) স্নেহের ডোরে গাঁথা ।।

২. নিত্য নূতন খেলামাঠে,

কত গন্ধ পুষ্প ফুটে ।

হু হু করে পবন ছোটে, মানে না কোন বাঁধা ।।

৩. (সবাই) আপন কাজে ব্যস্ত থাকে,

ভগবানকে সবাই ডাকে ।

বিশ্বাসে প্রাণ সঁপে তাঁকে, নিঃশ্বাস ফেলে সেথা ।।

৪. এমন স্থানে জন্ম আমার

আপন পর নাইকো বিচার ।

হাসিমাখা কথা সবার, ঠান্ডা থাকে মাথা ।।

৫. (সেথায়) মেজাজ গরম নাই কো কারো,

(এথায়) যাকে তাকে ধরে মার ।

ভবা কয় মন সরে পর "ভাব" ইতিহাসের কথা ।।[৩]

১। মূলে 'সমন্ধ' রয়েছে । ২। মূলে 'দন্দ' রয়েছে ।

৩। মূল পাণ্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত, (মুর্শিদাবাদ ৩০শে ভাদ্র, সোমবার ১৩৫২, সন্ধ্যা ৬টা ৩০মিঃ রচিত এ গানটি।)

Dhaka University Institutional Repository

(ধুয়া) আমার বাংলা দেশের কথা।
(এমন) খোলা মাঠ, খোলা প্রাণ, অন্য নাই আর কোথা ॥

১. নাইকো কোন হিংসা দ্বন্দ্ব,
সেই সব মধুর সম্বন্ধ।
নাইকো অলস বৃথা দ্বন্দ্ব, (সবাই) স্নেহের ডোরে বাঁধা।

২. নিত্য নূতন খোলা মাঠে,
কত মনের দুঃখ কাটে।
হু হু করে পবন ছোটে, মানে না কোন বাধা ॥

(সবাই) আপন মনে, কাজে থাকে,
ভগবান কে সবাই ডাকে।
বিশ্বাসে প্রাণ সঁপে তাঁকে, নিশ্বাস ফেলে সোজা ॥

৪ এমন স্থানে জন্ম আমার,
তাদের পর নাইকো কিছু।
তাই সাদা কথা সবার, সঙ্গে থাকে বাংলা ॥

(শেষ) সেথায় মরণ নাইকো জেনো,
সেথায় যারে তাকে বেঁধে রাই।

[illegible]
[illegible]
[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(১২১)

আমি যাহা করি, তাহা কেহ করিও না,
আমি যাহা কহি, তাহাই তোমরা করিও।
এমন বিদ্যা যদি কাহারো ঘাড়ে চড়ে,
পড়, পড়, গড়, ঘড়, মাষ্টারের ঘাড়ে চড়,
তবে সৎ মানুষটি হইও ॥

ভালমন্দ বিচার যখন নাই,
(তবে) কারে বা বুঝাই।
নিজের বুদ্ধি শুভঙ্করী,
পরের বুদ্ধি গলায় দড়ি,
(তবে) ঘরে বসি কৃষ্ণ নাম মায়েরে শুনাইও ॥

এ যুগটি বড়ই ভাল, যাগ-যজ্ঞ লাগে না,
ভাত খেয়ে কর্ম্ম নিয়ে, একবার হরি বলো না।
ফল পাবে সুখী হবে,
মানুষ হবে সহায় রবে,
সবার সঙ্গে মিশে থাকিও ॥

গুরু বোলে, কর্তা বোলে, মানতে কই না,
নিজের মান নিজে রেখো, সম্মান হারিও না।
মানবে সবাই শুনছো তো ভাই,
ওবার সঙ্গে না মিশিও ॥

Dhaka University Institutional Repository

(১৯২)

ভৈরবী

আয় রে মাঝিরে তব নদীর পরপারে ।
খেয়ার মাঝি ডাকিছে ঐ করুণ কণ্ঠে, কেমন করে ।

শান্তিময় সুখের আলয়,
ধীরে মৃদু পবন যে বয় ।
তাঁরে নিবে সকল সময়, বনবন গাহে মধুর সুরে ।।

দুঃখ বলে নাইকে সেথায়,
আনন্দ লহরী খেলায় ।
বিরহে ঐ মিলন দোলায়, বনফুলের মালা পরে ।।

বনফুলের মধুর গন্ধে,
মন মাতে রে প্রেমানন্দে ।
পদ চলে নৃত্য ছন্দে, স্পন্দন এলি অভিসারে ।।

ভবাপাগলা যাবি নাকি,
খেয়ার মাঝি কইছে ডাকি ।
মন নাচে তাই থাকি থাকি, ডাক্ শুনি তাঁর বারে বারে ।[1]

১। মূল পান্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত ।

Dhaka University Institutional Repository

(১২৩)

'ওংদিন'

খাঁচা ছেড়ে পাখী কিন্তু পালিয়ে যাবে ।

নয় দরজা ঘরটিই খোলা ফাঁক্ পেলেই সে উধাও হবে ।।

শিখালি না কোনওবুলি,

কেন রে তুই রইলি ভুলি ।

শিখারে তুই কালী কলো, কালের যদি হাত এড়াবে ।।

পৃথিবীর মালিক যিনি,

সুন্দর খাঁচা তার জানি ।

[illegible] করিতে দিন রজনী, গড়েছিলেন ভেবে ভেবে ।।

ভবা কয় মন শুন রে পাখী,

(আয়) পরাণ ভ'রে মাকে ডাকি ।

আর কত কাল দিবি ফাঁকি, চালাকি আর ক'দিন খাটবে ।।

(১২৪)

কইতে শিখ সত্য কথা ।

এতে যদি হয় তোর মরণ,

অমর কুলে রইবি গাঁথা ।।

সত্যের জয় চিরকাল -

ঝড় তুফানে ভাঙে না হাল ।

চুষন খেয়েও বাঁচে তারা,

তাদের জীবন যায় না বৃথা ।।

Dhaka University Institutional Repository

মিথ্যা কথা কইতে কইতে,
আর ধরে না পৃথিবীতে ।
আপন মনে বুঝে দেখ,
গোপনে পাও কত ব্যথা ॥

সত্য মিথ্যা তাঁরই সৃজন,
(ঠিক) বোঝ যদি বোঝার মতন ।
(তুমি) ডঙ্কা মেরে চলে যাবে,
(তবে) ভয়া কয়, ভয় কিসের হেথা ॥

(১১৫)

খাবেন কি, বাবু গরম জিলিপি ।
মধু প্যাঁচে জড়ান, মায়া রসে ডুবন,
একি পাপী না মহাপাপী ॥

গরমা-গরম টাটকা যৌবন, জিভে জল আসে,
টপ করে, খেতে গেলেই তালু ঠেসে বসে ।
লুকিয়ে থাকে, কোন গভীরে ফুঁস করা সাপুরের ঝাঁপি ॥

ডালা খুললেই ফোঁস করে সে, বিস্তার করে বিষের ফণা ।
মনে হয় তাহার কাছে (আর) লাগে কোন্ জনা ।
গাছের শিকর দেখলেই কিন্তু থাকে না আর লাফালাফি ॥

Dhaka University Institutional Repository

তলি মুখের পান চশমা নাসিকাতে পরা,
তার দিকে তাকিয়ে থাকে, সহজে যায় না ধরা ।
একটু একটু মুচকি-হাসি রাধারাণীর পায়ে পরা, কৃষ্ণ বহুরূপী ।।

প্যাঁচের পাল্লায় পরেছো বাপু শেষ গুটানোই সার ।
ঘাড়ে জোয়াল পড়লেই সোনা দেখবে অন্ধকার ।
ঝিলিমিলি এই মায়ার সংসার, ভবার কেবল দাপাদাপি ।।[১]

(১২৩)

(আমি) চিরতরে কবে বিদায় লইয়া চলে যাব পরপারে ।
কত কথা ছিল কহিবার মত, হলোনা কওয়া এবারে ।।

মনে থাকে যদি এপারের কথা,
ব্যথার ছড়া বেদনায় গাঁথা ।
পাই যদি সেই নিঠুর দেবতা,,
আপনি কাঁদিয়া কাঁদাব তাঁহারে ।।

হেসে চলে যাব, কাঁদিবে এরা,
সে কাঁদবে আর, দেখো নাকো যারা ।
মুক্ত হ'বো আমি, ছাড়ি বসুন্ধরা,,
কি যে বাঁধনে রয়েছি সংসারে ।।

(প্রভু) তোমারই মহিমা গাহিতে গান,
(তাই) পৃথিবীর বুকে দিয়েছিলে স্থান ।
(আমি) তোমারেই ক'রেছি কত অপমান,,
ক্ষমা কর প্রভু পাগলা ভবারে ।।[২]

১। শ্রী গোপাল ক্ষেত্রীর সৌজন্যে প্রাপ্ত, ভবার গানের পাণ্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত ।
২। মূল পাণ্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত ।

Dhaka University Institutional Repository

(১২৭)

জীবনের শেষ দিনের কথাটি মনে পড়ে যায় ।
ছিলাম কোথায়, যাবো কোথায়,
কে যেন হাসায়, কে যেন কাঁদায় ।।

কত প্রেম, কত প্রীতি, কত ভালবাসা,
আশায় আশায় মেতে ছিলাম, কেন এমন আশা ।
কাহার ইঙ্গিতে কার এমন ভাষা,
বড়ই নিঠুর বাণী, সে বা কোথায় ।।

যবে এসেছিলাম জীবনেরই ছন্দে ।
ভেবে ছিলাম দিন কাটিবে আনন্দে ।
মায়া মোহের যত চক্রান্তে চূড়ান্তে,
জড়িয়ে পড়েছি এদের কথায় ।।

যত কিছু ভেবেছি, যত কিছু করেছি,
ফুরিয়ে গেল সব পৃথিবীর ছলনায় ।
এবার আসিল সময়, ফুরিয়েছে এ অভিনয়,
এ জনমের কবিতা, রহিল খাতায় ।।

Dhaka University Institutional Repository

(১১৮)

দুঃখ ভরা জীবন যার, তার সুখের নাই প্রয়োজন ।
তার খোবার ভাবনা কিসের, সঙ্গে রয়ে মদন-মোহন ॥

সদানন্দে দিন কেটে যায়,
দিন আসে আর দিন চলে যায় ।
বসে থাকি দিনের আশায়,
কবে মোর হবে মরণ ॥

ভবার ভাবনা যত কিছু,
যোগান মা মোর থাকি পিছু ।
কিছু কিছু বুঝি কিছু,
মা করবে মোর শমন দমন ॥

যা হবে তা হবে বলে,
কাটিয়ো না দিন অবহেলে ।
যাবে কিন্তু সকল ফেলে,
যত তোমার আপন জন ॥

(১১৯)

দুঃখ দেখে দ্বন্দ্ব লাগে কি করি উপায় ।
সন্তোষ কি উঠে গেল সুখের দুনিয়ায় ॥

Dhaka University Institutional Repository

বাঘ ভালুক রয় যেখানে,
মানুষ পালায় তেমন বনে ।
ভাইয়ে ভাইয়ে নাহি বনে[১] মানুষেই মানুষ খায় ।।

সকল মানুষ হিংসায় ভরা,
সবার হাতে লোহার ছোরা ।
সোনার দেশে এমন ধারা, কে ছড়ালি হায় ।।

কোরাণ শরীফ বেদ গীতা,
এগুলি যে পিতা-মাতা ।
হিংসা গন্ধ বিষের তিতা , লিখা নাই তাঁর একটি পাতায় ।।

যে যার মত বুঝে চলো,
ক'দিন আর বাঁচবে বলো ।
সকল ভাবে হাস খেল, ভবা কয় দিন যে ফুরায় ।।[২]

১। বনিবনা বা মিলন অর্থে ।
২। মূল পান্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত ।

Dhaka University Institutional Repository

(২০০)

ধন্য এ জীবন, ধন্য এ জনম, ধন্য মরণ হবে মোর ।
দুর্বল নহি আমি, ভীরু নহি আমি, ভীষণ ভীষণ মন জোর ॥

সুপথে গমন, সুকথা কহন, সদা চিন্তা করি তাঁর ।
কিছু নাই ভাবনা, শুধু মোর কল্পনা,
থাকিয়া অসার সংসার,
যেতে হবে জানি, শুনি দৈববাণী,
প্রতিধ্বনি ফিরে আসে ওর ॥

ভবার সঙ্গীত রাশি, কোথা হতে আসে ভাসি,
হাসিয়া ফেলি সদা আমি,
সদা সৎচিন্তা, করি না প্রভুর নিন্দা,
সর্ব জীবে বাঁধা প্রেমডোর ॥

(২০১)

(আমি) পাগল হবো, পাগল হবো, পাগল হবো রে ।
যে যা কইলে মাথা পেতে, সবার কথাই সইব রে ॥

আপন মনে হেসে হেসে,
নীল আকাশে যাব মিশে ।
দেশান্তরে পাগল বেশে, ভেসে ভেসে যাব রে ॥

দেখতে যদি পাই তাঁহারে,
যে জন পাগল সবার তরে ।
বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরে, লুকিয়ে তাঁরে রাখবো রে ॥

Dhaka University Institutional Repository

কত দিনের কত আশা,
ভেঙ্গে ফেলবো মায়ার বাসা।
মন হবে মোর যেমন পাখা, শীতল বায়ে উড়বো রে ॥

ভবা-পাগলা হ'লো পাগল,
সঙ্গে যত পাগলের দল।
নামে পাগল, কামে পাগল, আর কি ভাল হবো রে ॥[১]

(২০২)

(আমায়) বিদায় দেবে যবে পৃথিবী।
(আমি) মনের তুলিতে আঁকিয়া লইলাম
ওগো তোমারই সুন্দর ছবিটি ॥

কত পাখি ঐ, তোমারই নীল গগনে
ভ'রে দেয় সুরে, গানে গানে।
ভেসে আসে সুর, পবনে পবনে,
তাই লিখে ফেলি কবিতাটি ॥[২]

আমি যবে যাব আসিবে নূতন,
তুমি তারে দিও করিও যতন,
যতনেই চিনিবে অমূল্য রতন,
মিলিবে তাতেই ভাবটি[৩] ॥

১। মূল পাণ্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত
২। কবিতাটি অর্থে ৩। ভাবনাটি অর্থে।

Dhaka University Institutional Repository

যে তব নির্দেশ, দেখাবে, তাঁহারে
এ পার ছেড়ে, যেদিন যাবো ঐ পারে।
অভিনয় করেছি, কত অভিমানে,
সংসারের যত মিটিয়েছি দাবী॥

কেউ তো থাকে না, থাকিতে দাও না,
এ তোলা পড়ার কোন্ বা কল্পনা।
শুনিবে বাঁশীটি, তবা ছাড়িবে না,
কয় কহ শাহ্ মায়াবী ॥

(২০৩)

তবা কি জাত, সবাই জিজ্ঞেস করে, তবা পড়লো ফাঁপরে।
তবা নয় রে যেমন তেমন, বলি আমি ন্যাকা রে ॥

(এরা জানে না) ওঙ্কারে, আল্লায় যিনি, তিনিই ত্রিভুবনবী,
লোকে করে কানাকানি, 'জাত' - কুটুনির আমদানি।
মুণ্ড সুভাব, সেই যে জবাব, (মাকে যেয়ে জিজ্ঞাসা করগে)
জন্ম দিলে কে আমারে ॥

ছুঁলেই জাত যায়, (এ) ছোঁয়াচে রোগ মরলো না হায়,,
ভুক্তভোগী, এমন রোগী,, বহু বহু,, এ দুনিয়ায়।
সূর্য, চান্দ, আকাশ, বাতাস, সবার জন্য এদের প্রকাশ,
মিলায় কি রে জাতটি ধরে ?

Dhaka University Institutional Repository

যাঁহার উদয়ে এক নিনাম , সে-মা আমার পূর্ণধাম,,
এবে সুখে করছে বিশ্রাম, কেমন মায়ের পরিণাম ।
মুনিও নরে , প্রাণিও মরণে, যার যেমন কর্মভোগ ,,
নিয়তির কলকাঠি,, একটুটানি[1] খাটে না রে।।

এক সবার পৃথিবীতে, কি বাকী কা'র আছে জানতে,,
অজানিতে মৃত্যু সবার,, সব একবার আদি অন্তে ।
ভবা তাই বেড়ায় দুখী,, জাত কুটুম্বির ঘোর বিদ্বেষী একান্তে,,
হার মেনে যাই, হার মানিনা, তাই সবার সনে মিলে না রে।।

(২০৪)

ভবার এ কায়া নয়, মায়ার আবরণ,,
ভবানী অন্তরে রহে, গভীর মগন ।
ঘরে বসে সকলই পাই, নাহি করি তীর্থ পর্যটন ।।

ভাবের আবেশে ভবা কত কথা কয়,,
সংসারে থাকিয়া ভবা করে অভিনয় ।
পরিচয় চাও যদি, শোন মহাশয়,
মানিতে হইবে ভবার সত্য বচন ।।

ভবা 'পাগল' নয়, ভবাপাগলা,,
সংসারে জড়িয়ে থাকি, তবুও একেলা ।
আত্মভোলা, প্রাণখোলা, প্রেম মাতোয়ারা,,
নয়নে ইন্দুর ছবি,, আত্মীয়-সুজন ।।

১। 'কর্ষণ' অর্থাৎ ।

Dhaka University Institutional Repository

নিঃস্বার্থে ভালবাসি, নাহি কোই প্রশ্রয়,
অপ্রিয় সদা ভবারে, মরণ বিনয় ।
অধিকন্তু ন দোষায়, ভবাপাগলা কয়,
মাতৃপদে জবা ভবার ভজন পূজন ।।

(২০৬)

মানুষ চলে যায় রেখে যায় স্মৃতি, শুধু স্মৃতিকণা,
কত ভালবেসে অজানা দেশে
চলে যায় সে, ফিরে তো আসে না ।।

দুদিনের খেলা কেন এত মায়া,
কেন এত দাবী তুচ্ছ এ কায়া ।
তবু কেন চায়, পেয়ে তো হারায়[১]
কে সে মায়াবী কার এ কল্পনা ।।

কারে ভালবাসি ভালবাসে কে
কে সে চতুর, (এই) পৃথিবীর বুকে ।
আপনা হারায়ে তাঁহারই গান গেয়ে
শুধু পায় প্রাণে দাগা বিরহ যন্ত্রণা ।।

তবু কেন রে তাঁরই গাই গান
বড়ই সে কঠিন, বড়ই সে পাষাণ ।
ভবাপাগলা কয় তাই পেতে নাহি চাই,
আমায় পাগল করেছে তাঁহারই ছলনা ।।[২]

১। বুঝি হারায়ে রয়েছে । ২। মূল পাণ্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত ।

Dhaka University Institutional Repository

(২০৬)

মানুষ তোমার কোথায় অবস্থান ।
জেনে যাও, নাই স্থিরতা, অনুমান আর বর্তমান ।।

বুঝ না এই বারতা,
মান না তুমি বিধাতা ।
প্রকৃতি যে সেই তো, মাতা, কথাটা কি ভুলাবেন ।।

কেবল আছ স্বার্থ চিন্তায়,
পরমার্থ কি তায় পাওয়া যায়।
স্বার্থের বোঝা নিয়ে মাথায়, চিনা যায় না সেই ভগবান ।।

কথায় কথায় কথা বাড়ে,
পঞ্চভূত ঐ চাপলো ঘাড়ে ।
সহজ কি সে ভূত ছাড়ে, কুটিল করলো সরল প্রাণ ।।

মানুষ হলো সবার উপর,
ভগবানের সৃষ্টির ভিতর ।
চিন্তা করবার নাই অবসর, তবু হয় মন খুন শয়তান ।।[১]

১। মূল পাণ্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত ।

Dhaka University Institutional Repository

(৩৯)

রূপের বাহার দিন দুই চারি গুণের বাহার চিরকাল ॥

কোকিল কুৎসিত পাখি সুরে তাহার মজে আঁখি,
কি করিবে কালোরূপে সুরে করে মন পাগল ॥

সাক্ষী রেখো মাখন ফল, কি চমৎকার গাছে ঝুলে,
কাক কোকিলে খায় না তারে ভাঙ্গিলে শুধু ছাই অঙ্গার ॥[১]

(অসমাপ্ত)

১। গায়ক: পরশআলী ওস্তাগর, চান্দইর, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ,
নিজস্ব সংগ্রহ।

Dhaka University Institutional Repository

(২০৮)

সন্ন্যাস করবো কাহার তরে।
কাজ নাই আমার এ পুণ্যে ॥

সন্ন্যাস করি শুনবে কি ভাই,
যাঁর উপরে ব্রহ্মাণ্ডে আর নাই।
মুলে সদা কালী গুণ গাই, ঘুরি আমি তাই বিষয়ারণ্যে ॥

ছেলে মেয়ের কথা যদি কই,
আমিও একটি ছেলে বটে হই।
তিনি যদি আছেন ব্রহ্মময়ী, ব্রহ্মাণ্ড পালেন দিয়ে অন্নে ॥

দেখছি কত সন্ন্যাসকারী
যাওয়ার দিন যায় দিন ভিখারী।
পরেশ কেহ না কান্না করি, মায়া কান্দা কান্দে অন্যে ॥
৩৮

নিজে বাঁচলে বাপের নাম,
নইলে যে সব শ্মশানধাম।
তবে কয় তাই জপি কালী নাম, উঠতে চাইনা এত পুণ্যে ॥[১]

১। পাণ্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

নিজের সংযোজন

(২০১)

কণ্ঠে কণ্ঠে রয়ে গেল জবার গানের মালা ।
মধু মধু মধু ছন্দে, বিপুল আনন্দে,,
দেবে রে দেবে রে দোলা ।।

প্রেমিক প্রেমিকা যত, মধু ফুল মক্ষিকা,,
গুণাগুণ, গুন্ গুন্ - উড়াবে-পতাকা ।
কেউ রহিবে না, রবে রচনা,,
আত্মার পরম গতি-মিটিবে জ্বালা ।।

গানের বানিগুলি অতীব মধুর,
মায়ের নৃত্য ধ্বনি, বাজিবে নুপুর ।
জবাপাগলার ছন্দ মৃত্যু,
পরপারের ভেলা ।।

জবা বড় কি জবা বড়, নির্ণয় করা দায়,
জবা থাকে মায়ের পায়ে, জবা গান গায় ।
জবা হলো লাল টকটকে,
জবার প্রাণটি খোলা ।।

-------0------

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থতালিকা

১. অমরেন্দ্রনাথ রায় (সম্পাদিত) - শাক্ত পদাবলী, ক. বি, ১৯৪৭

২. আনোয়ারুল করীম - বাউল সাহিত্য ও বাউল গান, কুষ্টিয়া, ১৯৭১

৩. আব্দুল আজীজ আল-আমান - নজরুল গীতি-অখণ্ড, কলিকাতা-৭, ১৩৮৫

৪. আশুতোষ ভট্টাচার্য - বাংলামঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৮৯

৫. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য - বাংলার বাউল ও বাউল গান, কলিকাতা, ১৩৫৮

৬. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সংগৃহীত) - কমলাকান্তের পদাবলী, বসুমতী সাহিত্য মন্দির

৭. জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী - শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা, কলিকাতা-৬, ১৩৭০

৮. তমোনাশ বন্দ্যোপাধ্যায় - বাঘের ফেরিওয়ালা ভবাপাগলা, মুর্শিদাবাদ, ১৯৭৬
- পরমগুরু ভবাপাগলা (১ম খণ্ড) [illegible]পর্ব, ২৪ পরগণা, ১৩৯১
- পরমগুরু ভবাপাগলা (২য় খণ্ড): কালনাপর্ব, ২৪ পরগণা, ১৩৯৬
- বিদগ্ধ জনের মন্তব্য, দীঘা, মেদিনীপুর, বৈশাখ-১৩৯৫
- ভবাপাগলার সাধনা সঙ্গীত সংগ্রহ-১, দীঘা, ১৩৯৬ (সংগৃহীত)

Dhaka University Institutional Repository

৯. দেবরঞ্জন মুখোপাধ্যায় - শাক্ত দর্শন ও শাক্ত কবি,
কলিকাতা-৯, ১৩৭৪

১০. ভূদেব চৌধুরী - বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস,
কলিকাতা, ১৯৬২

১১. মুহম্মদ আবু তালিব - লালন শাহ্ ও লালন গীতিকা(১মখণ্ড),
জুন,১৯৬৮

১২. মুহম্মদ আব্দুল হাই (সম্পাদিত)
ও
ডঃ আহমদ শরীফ - মধ্যযুগের বাঙলা গীতিকবিতা,
কার্তিক,১৩৭০

১৩. মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন - হারামণি(সপ্তমখণ্ড),
বাঙলা একাডেমী, ১৩৭১

১৪. শশীভূষণ দাশগুপ্ত - ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য,
কলিকাতা, ১৩৬৭

১৫. শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য - ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ,
কলিকাতা,১৯৬৭

১৬. সত্যগিরি - ভবাপাগলা(সংক্ষিপ্ত জীবনী),
ভবার মহাতীর্থ(বাত্তুর),
মুর্শিদাবাদ, ১৩৯০

১৭. সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য - রামপ্রসাদঃ জীবনী ও রচনাসমগ্র.
কলিকাতা,১৯৭০
- রামপ্রসাদ রচনাসমগ্র(সম্পাদিত)
কলিকাতা

১৮. সদয়চাঁদ চৌধুরী - ভবার গীতিমালা(১মখণ্ড),
কালনা,মে-১৯৮২
- ভবার গীতিমালা(২য়খণ্ড),
কালনা, ডিসেম্বর-১৯৮২

Dhaka University Institutional Repository

১৯. সুকুমার মিস্ত্রী - ভবার আনন্দলহরী, মুর্শিদাবাদ, ১৩৮৯

২০. সৈকত আসগর - বাউল সাধক কালুশাহ, ১লা জানুঃ, ১৯৮২
- মানিকগঞ্জ জেলার লোকসাহিত্য, মানিকগঞ্জ, ১৩৯৩

২১. R.A. - Nicholson - The Idea of Personality in Sufism.

সহায়ক পত্র-পত্রিকাঃ

১. 'ভবাভবা' - শ্রীসদয়চাঁদ চৌধুরী(সম্পাদিত), ফাল্গুন-১৩৯৩

২. 'ভবাভবা' - শ্রীসদয়চাঁদ চৌধুরী(সম্পাদিত), মার্চ/এপ্রিল-১৯৮৬

৩. 'ভবামৃত' - শ্রীতেমোনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়(সম্পাদিত), শ্রাবণ/ভাদ্র-১৩৯০

৪. 'ভবামৃত' - ANNUAL MAHAPUJA MEMBER BHABAMRITA, PAUSH/MAGH-139

৫. 'ভবামৃত' - শ্রীগোপাল মৈত্রী(সম্পাদিত), ফাল্গুন/চৈত্র-১৩৯৪

৬. 'ভবামৃত' - শ্রীগোপাল মৈত্রী(সম্পাদিত), কার্তিক/অগ্রহায়ণ -১৩৯৫

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিগত আলাপ ও সাক্ষাৎকার:

১. শ্রীগোপাল মৈত্রী, ১/১ই/৭, রাণী হর্ষমুখী রোড, কলিকাতা-৭০০০০২
২. শ্রীচুনীলাল ঘোষ, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ,
৩. শ্রীতমোনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রহড়া, ২৪ পরগণা, ভারত
৪. শ্রীতরণী সাধু, ভাবতা, ধামরাই, ঢাকা
৫. শ্রীমতি বীণা চৌধুরী, কালনা মন্দির, বর্দ্ধমান
৬. শ্রীযতীন দাস, ৮৩, দমদম রোড; কলিকাতা
৭. শ্রীসনৎকুমার চৌধুরী, কালনা, বর্দ্ধমান
৮. শ্রীসুকুমার মিস্ত্রী, মাজদিয়া, নদীয়া

-----0-----